ভারত-পথিক রামমোহন

সুকুমার মিত্র

নিউ স্ক্রিপ্ট
এ-১৪ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা—৭

ভূমিকা

প্রধানত, সাম্প্রতিক কালে রামমোহন চর্চার নামে কিছু অপপ্রচারের সমালোচনা হিসাবেই গ্রন্থটি লিখিত। এতে রামমোহনের জীবনী বা কীর্তির কোন বিস্তৃত বা ধারাবাহিক বিবরণ দেওয়া হয়নি। প্রথমে যেটা লিখি সেটা একটা ছোটোখাটো প্রবন্ধ হয়েছিল। চেষ্টা করি সেটিকে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশ করতে—কিন্তু তাতে ব্যর্থ হই। একটু ভগ্নমনোরথ হয়ে বেশ কিছুদিন ব্যাপারটা চেপে যাই। পরে আবার নতুন করে লিখতে শুরু করি—এবং লিখতে লিখতে প্রবন্ধটি বেশ বৃহদাকার ধারণ করে। এতবড় রচনা কোন সাময়িক পত্রে প্রকাশ করার অনুপযোগী মনে করে, সেটিকে একটি গ্রন্থ আকারেই প্রকাশ করা হল। লিখিতে লিখতে এবং ছাপতে ছাপতে রামমোহন সম্বন্ধে সে সব বই পড়ার সুযোগ হয়, সেগুলি যথাসম্ভব ব্যবহার করার চেষ্টা করি। তবুও অনেক তথ্যই আমার অজানা,—সেগুলি স্বভাবতই এখানে ব্যবহার বা সংযোজিত করা সম্ভব হয়নি। তার জন্য আশা করি পাঠকরা আমাকে ক্ষমা করবেন। গ্রন্থের শেষে 'সূত্র এবং টীকা' অংশের প্রতি পাঠকদের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করি। যথাসম্ভব, আমার বক্তব্যের সূত্রগুলির উল্লেখ সেখানে করা হয়েছে। আর, তার সঙ্গে কিছু টীকা এবং তথ্যও জুড়ে দেওয়া হয়েছে। তবে সে কাজটা যে সুষ্ঠু ভাবে করতে পেরেছি, তা মনে হয় না। তাতে পাঠকদের কিছু অসুবিধা হবে বলেই আমার আশঙ্কা। তার জন্যও ক্ষমা চাইছি।

সুকুমার মিত্র

অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীর মানুষ রামমোহন রায় তাঁর জীবদ্দশায় একজন বহুবিতর্কিত ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর জন্মের দু'শো বছর পরে বঙ্গীয় বিদ্বৎসমাজে তিনি আবার নতুনভাবে এক বহু বিতর্কিত ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছেন। এটা স্বাভাবিক যে রামমোহনের দ্বিশততম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে তাঁর দেশবাসীরা নতুন চিন্তা ও গবেষণার দ্বারা তাঁকে নতুন করে আবিষ্কার করার চেষ্টা করবেন, তাঁর কীর্তির নতুন মূল্যায়ণে প্রবৃত্ত হবেন। দেশে রামমোহনের অনুরাগীর অভাব নেই। পণ্ডিত বা ঐতিহাসিক না হলেও, তাঁরা যে তাঁদের কথায় ও লেখায় রামমোহনের প্রতি তাঁদের অনুরাগ ব্যক্ত করবেন সেটা স্বাভাবিক। গত পঁচিশ বছরে রামমোহন সম্বন্ধে যাঁরা বিশদ আলোচনা করেন, তাঁদের মধ্যে প্রখ্যাত, প্রবীণ ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার অন্যতম। কয়েক বছর আগে কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটিতে প্রদত্ত একটি বক্তৃতায় রামমোহন সম্বন্ধে তিনি বলেন: 'he was one of the greatest representatives of that age and reflected in himself many distinguished features that heralded Renaissance in Bengal'।[১] রমেশচন্দ্র যে রামমোহনের একজন বিশিষ্ট গুণগ্রাহী তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

সম্প্রতি রমেশচন্দ্র 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায়'[২], 'রামমোহন রায়—প্রচলিত ধারণা বনাম ঐতিহাসিক সত্য' নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। প্রবন্ধটি, আমি মনে করি, পাঠকদের মনে বেশ কিছু বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে পারে। ঐতিহাসিক হিসাবে রমেশচন্দ্র বিপুল খ্যাতি ও মর্যাদার অধিকারী—সুতরাং তাঁর পাঠকেরা সাধারণভাবে তাঁর ঐতিহাসিক মতামত ও সিদ্ধান্তগুলিকে অভ্রান্ত বলে স্বীকার করে নেবেন। এটা স্বাভাবিক বটে। কিন্তু তা, আমার মতে, একটা গুরুতর সমস্যার সৃষ্টি করে। তাই, সে সমস্যাটির দিকে দৃষ্টি রেখে রমেশচন্দ্রের প্রবন্ধটিকে সমালোচনা করার জন্য আমি এই প্রবন্ধ রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছি। রামমোহন সম্বন্ধে কোন নতুন তথ্য পরিবেশন করা এ প্রবন্ধের

উদ্দেশ্য নয়—প্রকৃতপক্ষে তা করার সামর্থ্য আমার নেই। রামমোহনের চরিত্র ও কীর্তির কোন সাধারণ মূল্যায়ণ করাও আমার উদ্দেশ্য নয়—প্রসঙ্গক্রমে সে সম্বন্ধে দুচারটি কথা বলব।

দীর্ঘদিন ধরে রমেশচন্দ্র নানা পত্রিকায় এবং গ্রন্থে[৩] রামমোহন সম্বন্ধে বহু আলোচনা করেন। এর মধ্যে ১৯৭২ থেকে ১৯৭৬ সালের মধ্যকার বক্তৃতা ও রচনাগুলিতে তিনি মোটামুটি একই কথা বলেন। যদিও 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় প্রকাশিত প্রবন্ধটিই আমার আলোচনার মূল বিষয়বস্তু, আমি সে প্রসঙ্গে রমেশচন্দ্রের রামমোহন সম্বন্ধীয় অন্যান্য রচনাগুলিরও কিছু কিছু উল্লেখ করব—তার সম্প্রতি প্রকাশিত 'History of Modern Bengal'[৪] গ্রন্থটিরও।

মূল আলোচনায় প্রবেশ করার পূর্বে আরও একটি কথা বলে নেওয়া যেতে পারে। ঐতিহাসিকের লক্ষ্য ও আদর্শ সম্বন্ধে রমেশচন্দ্র বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন প্রসঙ্গে তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেন। এ প্রবন্ধে আমার নিজের বক্তব্য স্পষ্টতর করার আশায় আমি তাঁর সে অভিমতের একটা নমুনা উপস্থিত করছি। উনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গদেশীয় ইতিহাসের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে রমেশচন্দ্র তাঁর একটি গ্রন্থে বলেন: 'In studying all these it will be my endeavour to make an objective and critical study uninfluenced by long-standing prejudices and conventions. Our national motto is "truth shall prevail"—but we are loth to act according to it whenever truth is in conflict with cherished ideas. It remains for the historians to uphold the motto. History is no respecter of persons and the ideal of historian should be to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth, so far as it can be ascertained on reasonable grounds. Neither a false sense of prestige nor the more honourable motive of avoiding unpleasantness should deter him.'[৫]।

প্রথমত, রমেশচন্দ্রের এ বক্তব্যে একথা স্পষ্ট যে ঐতিহাসিক হিসাবে তিনি কোন 'long-standing prejudices and conventions' দ্বারা প্রভাবিত নন। দ্বিতীয়ত, তাঁর বক্তব্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক সমস্যার দিকে অঙ্গুলি সংকেত করে: সত্য কথন—অর্থাৎ অতীতে প্রকৃত যা ঘটেছে তাই-ই মাত্র

সুসম্বদ্ধভাবে ব্যক্ত করা ঐতিহাসিকের লক্ষ্য ও আদর্শ হওয়া উচিত। রমেশচন্দ্রের একথাগুলি সম্বন্ধে দ্বিমত হবার প্রশ্ন ওঠে না। কথাগুলি নতুনও নয়—প্রাচীনকাল থেকেই তা স্বীকৃত। গ্রীক ঐতিহাসিক Thucydides লেখেন: 'It may well be that my history will seem less easy to read because of the absence in it of a romantic element. It will be enough for me, however, if these words of mine are judged useful by those who want to understand clearly the events which happened in the past and which (human nature being what it is) will at some time or other and in much the same ways be repeated in the future.'।[৬] দ্বাদশ শতাব্দীর কাশ্মীরি কবি ও ঐতিহাসিক তাঁর বিখ্যাত ইতিহাসের উপোদ্‌ঘাতে বলেন: 'সেই ব্যক্তিই প্রশংসার পাত্র ও গুণবান, যাঁহার বাক্য অতীত বস্তুর বর্ণনাকালে মধ্যস্থব্যক্তির ন্যায় দ্বেষ ও অনুরাগশূন্য হইয়া থাকে।'[৭] ভারতীয় মধ্যযুগের অন্যতম, শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দীন বারাণীর মতে: 'ইতিহাস হল সত্যের ভিত্তিভূমি।' 'ঐতিহাসিককে সত্যবাদী হতে হবে কারণ মিথ্যা কথা বললে মানুষ ভুল পথে যাবে ও ঐতিহাসিককে অবশ্যই শেষ বিচারের দিনে ঈশ্বরের কাছে জবাবদিহি করতে হবে।' 'ঐতিহাসিককে অবশ্যই সত্যের লিপিকার হতে হবে'[৮] ইত্যাদি। আধুনিক কালে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ইতিহাস রচনার শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা Ranke-র কথা 'Er will bloss zeigen wie es eigentlich gewesen'—অর্থাৎ যা ছিল, মাত্র সেটুকু দেখানই ইহার (ইতিহাসের) লক্ষ্য, ওই একই অভিমতকে প্রকটিত করে। কিন্তু এটা সুবিদিত যে ওই সব মহান ঐতিহাসিকেরা তাঁদের নীতি সর্বদা অনুসরণ করেননি। তাঁদের নিজেদের সংস্কার, শিক্ষা, প্রত্যয়, আদর্শ, সামাজিক মর্যাদা প্রভৃতির প্রভাবে সত্য কখনও বা হয়েছে বিকৃত, কখনও বা রয়ে গেছে আবৃত। ইতিহাসের মালমসলায় গুণাগুণ নির্ণয় করার এবং 'বীতরাগভয়ক্রোধ' হয়ে ইতিহাস রচনা করার সমস্যা যে কত বৃহৎ তা ঐতিহাসিক মাত্রেই জানেন। মনে রাখা দরকার যে সত্য ভাষণের দাবী এবং সত্য ভাষণ, এ দুটি ব্যাপারের মধ্যে যে ফাঁকটি দেখা যায় সেটিরও সৃষ্টি হয় ঐতিহাসিক কারণে। সুতরাং, যদিও নির্ভীক ও নিরাসক্তভাবে সত্য বলার চেষ্টা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়, তবুও সত্য বলছি বললেই সর্বদা সত্য বলা হয় না।

আলোচ্য প্রবন্ধটি রচনার উদ্দেশ্য রমেশচন্দ্র ব্যক্ত করেন প্রবন্ধের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে। ১৩৪৯ সালে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বহু নতুন ও মূল্যবান তথ্য অবলম্বনে রামমোহন রায়ের জীবন ও কীর্তি সম্বন্ধে একটি অতি উৎকৃষ্ট, দীর্ঘ প্রবন্ধ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ থেকে প্রকাশ করেন।[৯] রমেশচন্দ্রের মতে ব্রজেন্দ্রনাথের প্রবন্ধটি 'আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে লিখিত রামমোহনের' (৩১)* প্রথম জীবন চরিত। ব্রজেন্দ্রনাথের ওই প্রবন্ধটিকেই নবাবিষ্কৃত তথ্যের আলোতে 'আধুনিক যুগের উপযোগী করিবার উদ্দেশ্যে পরিষদের সম্পাদকের অনুরোধে' (৩১) রমেশচন্দ্র তাঁর প্রবন্ধটি রচনা করেন। 'রামমোহন রায় সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য' (৩১) সম্বলিত প্রায় ৬০০০ শব্দের ওই প্রবন্ধটিও যে 'আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে লিখিত', তা অবশ্যই ধরে নিতে হবে।

রমেশচন্দ্রের আরও একটি উদ্দেশ্যও স্পষ্ট। এশিয়াটিক সোসাইটিতে প্রদত্ত রামমোহন সম্বন্ধীয় তাঁর দুটি বক্তৃতার[১০] বিবরণ সংবাদ-পত্রে প্রকাশিত হবার পর, রমেশচন্দ্র লেখেন 'আমার বিরুদ্ধে একাধিক গ্রন্থ এবং সাময়িক পত্রিকায় অন্তত ১৫।২০টি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে' (৩১)। যাঁরা সেগুলি লেখেন তাঁদের রমেশচন্দ্র, 'রামমোহনের ভক্ত' নামে অভিহিত করেন। ওই সব রামমোহন-ভক্তরা, রমেশচন্দ্রের মতে, রামমোহনের চরিত্র ও কৃতিত্ব সম্বন্ধে অনেক অতিশয়োক্তি এবং অসত্য-ভাষণ করেন। তাঁরা যা করেন তা নিছক ব্যক্তি-পূজা—রামমোহনের জীবন ও কর্মকে প্রশস্তির আবেগে, উচ্ছ্বাসে ফাঁপিয়ে ফুলিয়ে তাঁকে এক অতি মানবে পরিণত করার, প্রকৃতপক্ষে একটি 'Rammohon myth' সৃষ্টি করার অপচেষ্টা করেন। রমেশচন্দ্র আরও বলেন যে তাঁর 'ঐতিহাসিক আলোচনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদকারীদের মধ্যে একজনও ঐতিহাসিক নাই। সুতরাং প্রতিবাদগুলি সাধারণত ভক্তগণের ভাবোচ্ছ্বাস মাত্র। কারণ ঐতিহাসিক রচনার পদ্ধতি ও প্রণালী সম্বন্ধে তাঁদের বিশেষ কোন জ্ঞান নাই' (৩১)। তাঁর মতে রামমোহনকে বিচার করা প্রয়োজন 'from a strictly historical point of view untramelled (sic) by any sentiment or tradition or current public opinion'।[১১] সুতরাং ওই সব ঐতিহাসিক কাণ্ডজ্ঞানহীন ভক্তদের জবাব দেওয়া প্রবন্ধটির দ্বিতীয়

* সংখ্যাগুলি রমেশচন্দ্রের প্রবন্ধের পত্রাঙ্কের নির্দেশক।

উদ্দেশ্য। রমেশচন্দ্র উল্লেখ করেন নি যে, যে বিশিষ্ট ঐতিহাসিক পণ্ডিতের স্মরণে তিনি বক্তৃতা দুটি দেন, তিনিও রামমোহনের একজন বিশিষ্ট ভক্ত ছিলেন।

রমেশচন্দ্রের সঙ্গে আমি একমত যে রামমোহনের কিছু ভক্ত তাঁদের ভক্তির আতিশয্যে রামমোহনকে নিয়ে বিস্তর বাড়াবাড়ি করেন। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে Columbus-এর সমুদ্র পাড়ি দেওয়ার একটা স্পষ্ট ঐতিহাসিক ইঙ্গিত আছে। কিন্তু, তিনি আমেরিকা আবিষ্কারের জন্যই ১৪৫১ সালে পৃথিবীতে প্রেরিত বা আবির্ভূত হন, এবং ঠিক ১৪৯২ সালেই তাঁর সমুদ্র যাত্রার নির্গত হওয়ার অনুকূল একটা বাস্তব ঐতিহাসিক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, এই ধরণের সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে যে ব্যক্তিপূজা, অবতারবাদ ও ঐতিহাসিক যান্ত্রিক নিমিত্তবাদের ইঙ্গিত আছে সেগুলি আজও তত্ত্ব হিসাবে পরিচিত বটে, কিন্তু সত্য হিসাবে উপেক্ষিত। রামমোহনের—এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের, ঐতিহাসিক ভূমিকা সম্বন্ধে ওই ধরণের চিন্তা করার প্রবণতা প্রায়ই অনেক লেখকের মধ্যে লক্ষিত হয়। রামমোহন সম্বন্ধে দু একটা নমুনা দেওয়া যেতে পারে। রামমোহনকে আধুনিক ভারতের জনক বলা যুক্তিযুক্ত কিনা এই নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি নানা মত প্রকাশ করেন। রামমোহনের এই পিতৃত্ব সম্বন্ধে সন্দেহকারী একজন লেখকের মন্তব্যের প্রতিবাদে আর একজন লেখক সম্প্রতি লেখেন: 'I do firmly believe as a result of studying history as a social science that Rammohun Roy was singly the Father of Modern India,'[১৪] ইত্যাদি। আর একজন লেখক এক প্রসঙ্গে লেখেন: 'পলাশী যুদ্ধের পনেরো বছর বাদে ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে এমন একটি পুরুষ জন্মালেন বাংলাদেশে যিনি শুধু বাংলার জীবনে নয় ভারতবর্ষের জীবনে নবজাগরণের ও নব বসন্তের সব সম্ভাবনা বহন করে নিয়ে এলেন। তিনি হচ্ছেন রামমোহন রায়। এদেশের মানুষ তখন ভারতের অতীত সাধনার সঙ্গে যোগসূত্র হারিয়ে বসেছে; পাশ্চাত্ত্য জগতের মহতী চিন্তাধারার সঙ্গেও যোগ স্থাপন করতে পারে নি তারা। শুধু পৌরাণিক সংস্কারের অন্ধ তমসার মধ্যে তারা তখন ঘোরপাক খেয়ে মরছিল। রামমোহন এসে এই সর্বনাশা অন্ধকারের বন্ধন থেকে আমাদের মুক্তি দেন।'[১৩] কথাগুলো পড়লে মনে হতে পারে যে রামমোহন বাংলাদেশে, তথা ভারতবর্ষে একাদশ অবতাররূপে আবির্ভূত হন। রামমোহন ভক্তদের এই 'messianism,' আমি

মনে করি, রামমোহন-চর্চাকে মোটেই সমৃদ্ধ করেনি, বরং ঘোলাটে করে ফেলেছে। ব্যাপারটা সম্বন্ধে, কিছুটা অপ্রাসঙ্গিক হলেও, দু চারটে কথা বলতে চাই।

রমেশচন্দ্রের ঐতিহাসিক 'credo'-র উল্লেখ পূর্বেই করা হয়েছে। 'from a strictly historical point of view' বলতে রমেশচন্দ্র কি বোঝাতে চান, তা তাঁর রামমোহন সম্বন্ধীয় রচনাগুলি পড়ার পর আমার কাছে বেশ ঝাপসা লাগে। অবশ্য তিনি যদি মনে করেন যে নির্ভিন্ন ঐতিহাসিক পদ্ধতিতেই ইতিহাস রচনা করা উচিত তাহলে আমি তাঁর সঙ্গে একমত। তবে রমেশচন্দ্রের প্রবন্ধে ঐতিহাসিক পদ্ধতির একটা বৈগুণ্য লক্ষিত হয় বলেই এই দু চারটে কথার অবতারণা করা।

মানুষকে বাদ দিয়ে ইতিহাস রচনা করা যায় না। মানুষের চিন্তা ও কর্মই ইতিহাসের মূল উপাদান। রসায়ন বা কীটবিজ্ঞানেরও ইতিহাস রচনা করা যায়, কিন্তু কোনক্রমেই রসায়নজ্ঞ বা কীট বিজ্ঞানীকে বাদ দিয়ে নয়। প্রকৃতপক্ষে সে ইতিহাসও এক রকম মানুষেরই ইতিহাস।

ইতিহাস প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের অনুরাগী বা বিরাগী, ভক্ত বা অভক্ত থাকবেন এটা স্বাভাবিক, বিশেষত, সে ব্যক্তিরা যদি ধর্মপ্রবর্তক বা ধর্মসংস্কারক বা রাজনৈতিক নেতা হন। ঐতিহাসিকেরও নায়ক এবং দুর্বৃত্ত, দুই-ই থাকেন। তবে কে নায়ক এবং কে দুর্বৃত্ত, এ প্রশ্ন নিয়ে মতান্তরের অন্ত নেই। মানুষের চরিত্র ও আচরণ যেমন বিচিত্র, তেমনি বিস্ময়কর, আবার তেমনি রহস্যময়। ঐতিহাসিকও মানুষ, আবার তাঁর নায়ক বা দুর্বৃত্ত, তাঁরাও মানুষ। সুতরাং ইতিহাসে যে ঐতিহাসিকের প্রক্ষোভ প্রতিফলিত হবে তা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। ঐতিহাসিক মানুষের যে গুণকীর্তন বা দোষকীর্তন করেন তা কখনও হয় মোটা, কখন মিহি। সম্পূর্ণ বীতরাগ বা বীতক্রোধ হয়ে ইতিহাস রচনা হয়ত সম্ভব নয়। কিন্তু সাধারণভাবে দেখা যায় যে রাগ বা রোষ, কোনটাই ইতিহাস রচনায় সহায়ক নয়। অস্বস্তি আরও বৃদ্ধি পায় যখন ইতিহাস নামে বিঘোষিত রচনা প্রচার সাহিত্য বা কখনও কখনও কুৎসা হয়ে দেখা দেয়। সুতরাং ঐতিহাসিক যথাসম্ভব নিরাসক্তভাবে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের চিন্তা ও কর্ম আলোচনা এবং সমালোচনা করবেন এটাই বাঞ্ছনীয়। আলোচনা শুদ্ধ বন্দনাতে এবং সমালোচনা নিছক নিন্দাতে পরিণত হওয়া সমান অবাঞ্ছনীয়। নিরাসক্ত, বাস্তবদৃষ্টি সম্পন্ন, দায়িত্ব চেতন ঐতিহাসিকদের দ্বারা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ

কোন ব্যক্তি প্রশংসিত বা কঠিনভাবে সমালোচিত হতে পারেন, শুধু বন্দিত বা শুধু নিন্দিত নয়।

অমুক ব্যক্তির অমুক কাজ করা উচিত ছিল বা উচিত ছিল না, এ প্রশ্ন ঐতিহাসিকের কাছে অবাস্তব। ঐতিহাসিক দেখাবেন যে, কোনো ব্যক্তি যা করেননি, তা কেন করেননি; করার পথে অন্তরায় কি ছিল, এবং কোথায় ছিল; সে অন্তরায়ের স্বরূপ কি; তাঁর কর্মের সামগ্রিক ফলাফল বা প্রভাব কি ঘটে, ইত্যাদি। তেমনি, তিনি যা করেন তা কেন করেন; তাঁর কাল ও পরিবেশ তাঁর ওপর কতটুকু প্রভাব বিস্তার করে; তাঁর কর্ম কি ফল প্রসব করে, ইত্যাদি। অর্থাৎ, সে ব্যক্তিকে তাঁর সমসাময়িক সামাজিক পটে সংস্থাপিত করে ঐতিহাসিক বিচার করেন তাঁর চিন্তা ও কর্মের বাস্তব প্রকৃতি ও তাৎপর্য্য, গ্রহণ করেন, যথাসম্ভব তাঁর ঐতিহাসিক ভূমিকার সম্যগ পরিচয়।

ঐতিহাসিকের একটা সুবিধা এই যে তিনি যে সব ঘটনার অনুসন্ধান, বিচার ও বিশ্লেষণ করেন, সেগুলি সবই অতীতের ঘটনা; সেগুলি থেকে তিনি বহুদূরে অবস্থিত—পশ্চাৎ দৃষ্টির দ্বারা নিরাসক্ত হয়ে তিনি সেগুলিকে পরীক্ষা করার চেষ্টা করেন। অবশ্য, সব ঐতিহাসিকের পশ্চাৎদৃষ্টি সর্বদা নিরাসক্ত নাও হতে পারে। তবে তাঁদের আলোচ্য বিষয়গুলির সঙ্গে তাঁদের প্রত্যক্ষ যোগ না থাকার দরুন, সেগুলিকে তাঁদের পক্ষে অনেকটা বাস্তব দৃষ্টিতে বিচার করা সম্ভব। কিন্তু যাঁরা সে ঘটনাগুলির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত, যাঁরা সে ঘটনাগুলির জাতক বা যাঁদের কর্মের ফলেই সে ঘটনাগুলি ঘটে, তাঁদের পক্ষে সেগুলি সম্বন্ধে নিরাসক্ত থাকা অসম্ভব। অষ্টাদশ শতাব্দীতে বঙ্গদেশে মীরজাফর আর মহারাষ্ট্রে রঘুনাথ রাও যা করেন, আজ দু'শো বছর পরে, তার ঐতিহাসিক বিচার বিশ্লেষণ, সমালোচনা আমরা করে থাকি—পশ্চাৎদৃষ্টির সাহায্যে। কিন্তু তাঁরা তাঁদের সমসাময়িক অবস্থা ও ঘটনার আবর্তে ঘুরপাক খান। তাঁদের কাছে সেই মুহূর্তে যা কার্যকর, সুবিধাজনক ও যুক্তিসঙ্গত মনে হয় তাই তাঁরা করেন। তাঁদের কাজের কি ঐতিহাসিক পরিণতি ঘট্‌তে পারে বা তাঁদের উত্তর পুরুষেরা বা বিংশ শতাব্দীর ঐতিহাসিকেরা তাঁদের কাজের কি মূল্যায়ণ করবেন, এসব ব্যাপার তাঁরা একেবারেই চিন্তা করেননি। তাঁদের কাজ ন্যায় কি অন্যায়, প্রশংসার্হ কি নিন্দার্হ, তা বিচার করেন তাঁদের সমসাময়িকেরা, আর তাঁদের এ যুগের ভক্ত এবং অভক্তেরা। ঐতিহাসিকের কাছে সে প্রশ্নগুলি গৌণ। ধরা যাক, তাঁরা দেশদ্রোহী ছিলেন না দেশপ্রেমী ছিলেন, এ প্রশ্ন

উঠলেই, ঐতিহাসিক তাঁর পছন্দমত একটা ঢালাও রায় না দিয়ে, প্রশ্ন করবেন —সেটা কোন দেশ, ভারতবর্ষ, না বঙ্গদেশ, না মহারাষ্ট্র; মোগল বাদশাদের শক্তি ও ভারত সাম্রাজ্যের ওপর আধিপত্য করার ক্ষমতা, তখন কতটা ছিল; মোগল বাদশাদের সঙ্গে বাংলার নবাবদের এবং মহারাষ্ট্রের পেশোয়াদের সম্পর্ক কি ধরণের ছিল। আরও প্রশ্ন করবেন, তখনকার দিনে দেশের রাজন্যবর্গের আশা, আকাঙ্ক্ষা ও দৃষ্টিভঙ্গী কেমন ছিল, সাধারণভাবে, তাঁদের রাজনৈতিক লড়াইয়ের লক্ষ্য, কায়দা ও 'ethics' কি এবং কেমন ছিল, কোন স্বার্থের দ্বারা, কোন যুক্তির দ্বারা প্ররোচিত হয়ে তাঁরা তাঁদের পথ বেছে নেন; তাঁদের অন্য কোন পথ অবলম্বন করার প্রবণতা বা উপায় ছিল কিনা; তাদের কাজের ঐতিহাসিক পরিণতি কি ঘটে, ইত্যাদি।

অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ব্রিটিশদের বঙ্গ বিজয়ের পর ভারতে এক বিরাট ঐতিহাসিক পরিবর্তন ঘটে—ক্রমশঃ ভারতবর্ষ একটি বৃহৎ ব্রিটিশ উপনিবেশে পরিণত হয়। সেই ঐতিহাসিক পরিবেশে অবস্থান করেন, রাম-দুলাল সরকার, রামমোহন রায়, রামকমল সেন, রাধাকান্ত দেব, মতিলাল শীল, দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রভৃতি বিশিষ্ট বঙ্গসন্তানেরা। দেশের সেই নতুন পরিবেশে ঘটে তাঁদের শিক্ষা ও পরবরীশ, সেই পরিবেশেই তাঁরা বেছে নেন নিজ নিজ কর্মক্ষেত্র, তার মধ্যেই ঘটে তাঁদের বৃদ্ধি ও সমৃদ্ধি। তাঁরা সকলেই নানা ক্ষেত্রে অসাধারণ কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে যান। কিন্তু, যে ঔপনিবেশিক পরিবেশ তাঁদের সহজ প্রতিভাকে মুক্ত করে দেয়, সেই ঔপনিবেশিক পরিবেশই তাঁদের চিন্তা ও কর্মকে শৃঙ্খলিত করে রাখে। তাঁদের সকলেই অল্প বিস্তর দেশীয় অবস্থার পরিবর্তন চান, উন্নতি চান ও দেশের মানুষের দুর্দশা দূর করতে সচেষ্ট হন। তাঁদের কারোর মধ্যেই দেশপ্রেমের অভাব ছিল না। কিন্তু যে ঔপ-নিবেশিক পরিবেশে তাঁরা তাঁদের ঐহিক ফায়দা হাসিল করেন, স্বভাবতই সেটির তাঁরা সক্রিয় সমর্থক ছিলেন, এবং সেটিকে সাধারণভাবে বহাল রাখতে তাঁরা ব্যগ্র থাকেন। সে পরিবেশের দোষ ত্রুটি সম্বন্ধে তাঁরা অবহিত ছিলেন; কখন কখন সেগুলির সমালোচনাও তাঁরা করেন। কিন্তু নিজেদের ব্যক্তিগত বৃদ্ধির জন্য এবং দেশীয় সমাজের পরিবর্তন সাধন করার জন্য তাঁরা নিজেরা যা করেন ও দেশবাসীকে যা করতে বলেন তা সেই ঔপনিবেশিক পরিবেশের সঙ্গে যাতে সঙ্গতিপূর্ণ হয়, সে সম্বন্ধে তাঁরা সতর্ক ছিলেন। তাঁরা যে সকলেই একমতাবলম্বী ছিলেন তা নয়, তাঁরা যে সকলে একযোগে দেশের কাজে প্রবৃত্ত

হন তাও নয়। তাঁদের কর্মের উৎসাহ সমান ছিল না, তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গির বৃহৎ পার্থক্য ছিল, তাঁদের মধ্যে বিরোধিতাও ছিল প্রবল। ঔপনিবেশিক অবস্থা ও ব্যবস্থা কখন কখন তাঁদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, কিন্তু সে পরিবেশ যে সাধারণভাবে ভারতবাসীর পক্ষে সুবিধাজনক, তাদের কল্যাণের এবং দেশের উন্নতির সহায়ক, সে সম্বন্ধে তাঁদের কোন সন্দেহ ছিল না— তাঁরা সকলেই একমত ছিলেন। দেশবাসীকেও তাঁরা সে কথা নানাভাবে বোঝাতে চেষ্টা করেন।

ধরা যাক, রামমোহনের কথা। সংস্কারক হিসাবে তাঁর কর্মক্ষেত্র ছিল ব্যাপক, দৃষ্টি ছিল স্বচ্ছ ও উদার, চিন্তা ছিল দেশবাসীর কল্যাণ, এবং প্রভাব ছিল বিপুল। সতীদাহ প্রথা নিবারণের জন্য তিনি অক্লান্তভাবে সংগ্রাম করেন। চিরস্থায়ী রাজস্ব বন্দোবস্তের ফলে যাঁরা প্রধান ভাবে উপকৃত হন সেই জমিদার শ্রেণীর পীড়ন ও শোষণ থেকে রায়তদের রক্ষা করার জন্য তিনি সরকারকে প্ররোচিত করেন। 'He strongly points out the miserable state of the ryots or cultivators, supports the permanent settlement, urges some fixed assessment on the land so that the ryots may know what they are about!'[১৪] প্রসঙ্গত ওই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সম্বন্ধে Metcalfe লেখেন: 'No government perhaps ever made a greater reduction of taxation, or, in other words, a greater sacrifice of the right to acknowledged and usual public revenue, than did the Bengal government, prospectively, in 1793, in what was termed the permanent settlement of the land revenue. But what was the consequence of this sacrifice? It did not benefit the mass of the population interested in land. On the contrary it practically destroyed their rights. It only transferred the revenue of government to some individuals, who had no title to it, without any beneficial effect on the public interests as far as is perceptible to common observation!'[১৫] Metcalfe-এর এই বক্তব্যের ওপর Bentinck মন্তব্য করেন: 'Quite true'। ভারতে কোম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্যিক অধিকারের বিরুদ্ধে অবাধ বাণিজ্যনীতির যে প্রবল আন্দোলন ইংলণ্ডে, এবং এদেশে অনেক ইংরাজদের মধ্যে গড়ে ওঠে,

রামমোহন তার একজন উদ্যোগী সমর্থক ছিলেন। ভারতীয়দের পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞান ও ইংরাজী ভাষা শিক্ষা দেবার জন্ত তাঁর বিপুল উৎসাহ সর্বজনবিদিত। এ সব এবং আরও অনেক কিছু তিনি করেন তাঁর দেশবাসীর মঙ্গল ও উন্নতির জন্ত, তাদের ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি রেখে। সাধারণভাবে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে কোম্পানীর সরকার যদি ভারতবাসীর সুখ স্বাচ্ছন্দ্য এবং এবং উন্নতির দিকে দৃষ্টি দেন তাহলে 'the natives may become attached to the present system of government, so that it may become consolidated, and mantain itself by the influence of the intelligent and respectable classes of the inhabitants, and by the general goodwill of the people, and not any longer stand isolated in the midst of its subjects, supporting itself merely by the exertions of superior force!'[১৬] এই ধরণের অভিমত সে সময় ভারতে কর্মরত অনেক ইংরাজও পোষণ করতেন।

কিন্তু ব্যাপারটা কি দাঁড়ায়? সতীদাহ নিবারণের জন্ত তখনকার মত, তিনি যে শাস্ত্রীয় যুক্তির অবতারণা করেন, তা প্রায় ৪০ বছর পরে বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ প্রবর্তন আন্দোলনের পথে কিছু তাত্ত্বিক অসুবিধার সৃষ্টি করে। রায়তদের অবস্থার উন্নতি হওয়া দূরের কথা, অবনতি ঘটে, কেননা, আবার Metcalfe-এর ভাষায় 'The only branch of our taxation, that can be called excessive, is the land revenue, the chief resource that maintains the state. A reduction in this, justly apportioned, would contribute to the comfort of the mass of our subjects, the village population, but would not make them wealthy. If apportioned without great care, and strict regard to justice, it would not even promote their comfort, and might probably do them injury. That reduction, however, whatever would be its consequences, we are not in a condition to aff ord. Our government in India is not a national government!.'[১৭] অবাধ বাণিজ্যের প্রসারে দেশীয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ঝাঁঝরা হয়ে যায়, এবং ইংরাজ শিল্পপতিদের উৎসাহে ভারতে কিধরণের শিল্প বিপ্লব ঘটে তা আজও ভারতবাসী হাড়ে হাড়ে অনুভব করে। পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞান ও ইংরাজী ভাষা শিক্ষার প্রসারের ফলে যে উপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে ওঠে, তা রামমোহনের আমল থেকে আজ পর্যন্ত কজন ভারতবাসীকে অন্ধকার থেকে আলোর আনে তা আজ কারোর

অজানা নেই। রামমোহনের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল সরকারী কর্তৃপক্ষ ইচ্ছা করলেই দেশের শাসন ও প্রশাসন ব্যবস্থাকে ঘষে মেজে, তার দোষ ক্রটিগুলো দূর করে প্রজাদের স্বার্থানুকূল এক প্রকৃত সামাজিক হিতকারী ব্যবস্থায় পরিণত করতে পারেন। হয়ত তাঁর ধারণা ছিল যে ইংরাজরা ভারতবাসীদের সহযোগিতায় ভারতে একটি 'national government' প্রতিষ্ঠা করতে পারে। ভারতের সুশাসনের জন্য তিনি 'the higher and better educated classes of Europeans' এবং ইংলণ্ডের 'educated persons of character and capital,'[১৮]—এঁদের ভারতে স্থায়ীভাবে বসবাস করার অধিকার দেবার জন্য ইংরাজ কর্তৃপক্ষের কাছে সুপারিশ করেন। দেশের 'mass of the population'-এর দুর্দশার জন্য তাঁর মত, ইংরাজ শাসকদেরও তাদের প্রতি সহানুভূতির অভাব ছিল না। কিন্তু, জনপ্রিয়তা—রামমোহনের ভাষায় 'general good will of the people', অর্জন করা বলতে ইংরাজ শাসকরা, রামমোহনের মতই দেশের 'intelligent and respectable (এবং ধনী) classes of the inhabitants'দের প্রিয়তা অর্জন করাই বোঝাতেন। শাসনের 'benefits' বিতরণে ওই 'classes of the 'inhabitants'দের অগ্রাধিকারই স্বীকৃত হত। দেশবাসীর মঙ্গল তাঁর একমাত্র চিন্তা হলেও, রামমোহনের স্বচ্ছ দৃষ্টিতেও যেটা ধরা পড়েনি সেটা হচ্ছে, ইংলণ্ড এবং ইংলণ্ডের উপনিবেশ ভারতবর্ষ, এদুটি দেশের অবস্থার প্রকৃতিগত পার্থক্যটি, এ দুটির পারস্পরিক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সম্পর্কের বৈশিষ্ট্যটি, ইংরাজ শাসকদের পক্ষে ভারতবাসীর মঙ্গল সাধন করার সামর্থ্যের সীমিততাটি—সংক্ষেপে, ব্রিটিশ বাণিজ্যিক উপনিবেশিক ভারতীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্নিহিত স্ববিরোধটি।

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে জন্ম হয় রবীন্দ্রনাথের—রামমোহনের মৃত্যুর প্রায় ৩০ বছর পরে। ব্রিটিশ ভারতে গঙ্গার রাজনৈতিক অনেক জল ইতিমধ্যে সমুদ্রে গিয়ে মেশে। ব্রিটিশ উপনিবেশিক শাসননীতির বীভৎস রূপটি রবীন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষ করেন দীর্ঘদিন ধরে। তাই রামমোহনের ইংরাজ শাসন সম্বন্ধীয় মতামতগুলি জানা থাকা সত্ত্বেও এবং ইংরাজ জাতির প্রতি বিদ্বিষ্ট না হয়েও, রামমোহনের মৃত্যুর ১০০ বছর পরে রামমোহন-পূজা প্রসঙ্গেই লেখেন যে ইংরাজরা ভারতের স্বর্ণ ভাণ্ডারে প্রবেশ করে "দ্বার ভেঙে দস্যুরূপে।"[১৯] কিন্তু রামমোহন প্রত্যক্ষ করেন ইংরাজ শাসনের আর একটি ভূমিকা: পূর্ববর্তী শাসন ব্যবস্থার বিশৃঙ্খলা, দুঃশাসন, উৎপীড়ন, অবিচার,

দুর্নীতির আবর্জনা প্রভৃতির অবসান ঘটিয়ে ক্রমশ গড়ে উঠছে, বলিষ্ঠ, উদার, সাধারণভাবে পক্ষপাতদোষহীন, নিয়মতান্ত্রিক, বৃদ্ধিশীল ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থা —ব্রিটিশ আইনের শাসন। বঙ্গদেশের এক ক্ষুদ্র হিন্দুগোষ্ঠী একটা মুক্তির উপলব্ধিতে উদ্দীপ্ত হয়। ওই গোষ্ঠীর একজন, রামমোহন ব্রিটিশ শাসকদের দেখেন ভারতের ত্রাতারূপে।

ইংরাজ কোম্পানী বঙ্গদেশ থেকে ভারতবর্ষ জয় করে রামমোহনের পরামর্শ নিয়ে নয়। ভারতে ইংরাজদের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠায় রামমোহনের কোনো ভূমিকা ছিল না। কিন্তু ইংরাজদের প্রতিষ্ঠার ফলে ভারতে যে ঐতিহাসিক পরিবর্তন ঘটতে থাকে, ভারতবাসীর কল্যাণের অনুকূল মনে করেই তাকে রামমোহন স্বাগত জানান। ভারতে ব্রিটিশ উপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠায় তিনি যে উৎসাহ দেখান, আবার সেই সঙ্গে অষ্ট্রিয় সৈন্যদের দ্বারা নেপলস্ অধিকার বা স্পেনীয় উপনিবেশগুলির মুক্তি, বা পর্তুগালের গৃহযুদ্ধ বা ফরাসী দেশে উদার রাজনীতির জয় প্রভৃতি সম্বন্ধে তিনি যে মনোভাব ব্যক্ত করেন, এ দুটি ব্যাপার আপাতদৃষ্টিতে মোটেই সঙ্গতিপূর্ণ নয়। কিন্তু কেন নয়, তা বোঝাও বিশেষ কঠিন নয়। ব্রিটিশ উপনিবেশিকতার ভারতীয় মঞ্চে, এক বিচিত্র ভাঙাগড়ার নাটকে সেটাই ছিল রামমোহনের ঐতিহাসিক ভূমিকার, তাঁর ঐতিহাসিক 'involvement'এর বৈশিষ্ট্য। ইতিহাস রামমোহনের কাছে যায় নি, রামমোহন গিয়েছিলেন ইতিহাসের কাছে, ধরতে চেয়েছিলেন তার হাতলটিকে। সে কাজ ভাল কি মন্দ, সে বিচার আজ অবান্তর, সেটা যে একটা তাৎপর্য্যপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা সেটাই ঐতিহাসিকের বিবেচ্য। এখন তার জন্য আজ কোন দেশপ্রেমিক ঐতিহাসিক যদি রায় দেন যে রামমোহনের দেশপ্রেম ছিল ভুয়া, বা তিনি ছিলেন ইংরাজদের স্তাবক, দালাল, তাহলে বলতে হয় যে ঐতিহাসিক মহাশয় প্রচারে লিপ্ত, ইতিহাস রচনায় নয়। সাধারণ দৃষ্টিতে ইংরাজ শাসনের যে রূপটি লক্ষিত হয় উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে, শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ক্রমশ ঘটে তার বিপুল পরিবর্তন। সঙ্গে সঙ্গে ওই একই প্রক্রিয়ার ফলে পরিবর্তিত হয় ইংরাজী শিক্ষিত, শহরবাসী বাঙ্গালী বাবুদের চরিত্র, এবং ইংরাজ শাসনের প্রতি তাদের মনোভাব। ওই এক শতাব্দীর মধ্যেই ইংরাজ শাসকদের শত্রুরা পরিণত হয় মিত্রতে, এবং মিত্ররা শত্রুতে—Macaulay-র স্বপ্ন Curzon-এর দুঃস্বপ্ন হয়ে উঠে। এইটাই ইতিহাস। রামমোহন তাঁর সময়ের, তাঁর ব্যক্তিগত পরিস্থিতি ও অভিজ্ঞতার,

তাঁর নিজের বিচার-বুদ্ধির আলোতেই তাঁর দেশের সমস্যাগুলিকে সমীক্ষণ করেন, এবং সেগুলির সমাধান যোগাবার চেষ্টা করেন—ভারতীয় বাঙালী হিন্দু হিসাবে, কালাসাহেব হিসাবে নয়। সে চেষ্টার ঐতিহাসিক তাৎপর্য্য আজ আমাদের কাছে মোটেই অস্পষ্ট নয়। ইতিহাস, ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের চিন্তা ও কর্মের গুরুত্ব এবং উৎকর্ষ যেমন নিরূপিত করে দেয়, তেমনি, প্রকট করে দেয় সেগুলির সীমিততা এবং দুর্বলতা। রামমোহনকে, 'messiah' বানাবার চেষ্টা, বা তাঁর নিন্দা, এ দুটির কোনটাই স্থিরবুদ্ধি ঐতিহাসিক করেন না।

রামমোহনের যে সব ভক্তদের কথা রমেশচন্দ্র বলেন, তাঁরা কারা এবং কবে ও কোথায় তাঁদের লেখা প্রকাশিত হয় তার কোনো উল্লেখ অবশ্য তাঁর গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধে নেই। একটা বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে লেখা 'প্রকৃত তথ্য' সম্বলিত প্রবন্ধের পাঠকদের পক্ষে সে উল্লেখ আশা করা নিশ্চয় সঙ্গত। তবে একটা আবছা উল্লেখ পাওয়া যায়—'এক ভদ্রলোক,' এই নামে। মনে হয় ওই 'ভদ্রলোক' একজন বিশিষ্ট রামমোহন-ভক্ত। কিন্তু তাঁর লেখা রমেশচন্দ্র পড়েন নি—সে সম্বন্ধে শুনেছেন। রমেশচন্দ্রের ভাষায় 'সম্প্রতি (প্রায় বৎসর খানেক কি তাহার পূর্ব হইতে) এক ভদ্রলোক বহু গবেষণা করিয়া সিদ্ধান্ত করেন যে পূর্বোক্ত ঈষ্ট সাহেবের চিঠিখানা কেহ জাল করিয়াছিল—উহা প্রকৃত ঈষ্ট সাহেবের লেখা চিঠি নহে। শুনিয়াছি 'দেশ' পত্রিকার তিনটি সংখ্যায় এক সুদীর্ঘ আলোচনা করিয়া তিনি ঐ চিঠির কৃত্রিমতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন' (৩৬)। যে প্রসঙ্গে রমেশচন্দ্র ওই কথাগুলি বলেন তার আলোচনা করার প্রয়োজন এখানে নেই, তবে বিচিত্র ব্যাপার এই যে রমেশচন্দ্রের মত একজন প্রবীণ সত্যানুসন্ধানী ঐতিহাসিক একটা শোনা কথার ভিত্তিতে তাঁর মতামত ব্যক্ত করেন। ওই ভদ্রলোকের লেখাগুলি কি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে? প্রকৃতপক্ষে যাঁদের কাছ থেকে রমেশচন্দ্র ওই তথ্য সংগ্রহ করেন, তাঁরা তাকে একটা ভুল খবর শুনিয়েছিলেন। রচনাগুলি 'এক ভদ্রলোক' মাত্রের লেখা নয় —এক ভদ্রলোক এবং এক ভদ্রমহিলা যুগ্মভাবে সেগুলি রচনা করেন। এ ছাড়াও, রমেশচন্দ্রের মন্তব্যের মধ্যে যে ব্যঙ্গ ও ঔদ্ধত্যের সুর ফুটে উঠেছে, তা শুনলে মনে হয় যে ঐতিহাসিক সত্য উদ্‌ঘাটনের অধিকার একমাত্র তাঁরই আছে বলে তিনি মনে করেন।

১৯৭২ সাল থেকে যে সব রামমোহন-ভক্ত তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করেন, তাঁদের পরিচয় না দিলেও রমেশচন্দ্র দুজন বিশিষ্ট রামমোহন-ভক্তের নাম উল্লেখ করেন। তাঁদের নাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। তাঁদের একজনের মৃত্যু হয় ১৯৪১ সালে, অপরজনের ১৯৪৩ সালে। তাঁদের সমসাময়িক আরও দুজন বিশিষ্ট ভক্তের—স্বামী বিবেকানন্দ এবং ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, নাম রমেশচন্দ্র কেন করেননি তা ঠিক বোঝা গেল না। দুজনেই রবীন্দ্রনাথের বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলেন। বিশেষভাবে রবীন্দ্রনাথের কথা রমেশচন্দ্র বারবার উল্লেখ করেন তাঁর প্রবন্ধে; উদ্ধৃত করেন রবীন্দ্রনাথের রামমোহন সম্বন্ধীয় কিছু মন্তব্য। অন্যত্র[২০] রমেশচন্দ্র বলেন যে রামমোহন-ভক্তেরা যে 'Rammohan myth' সৃষ্টি করেন তার শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি ঘটে 'in the inimitable language of Rabindranath Tagore', এবং সে ভাষা 'has implanted the myth in the hearts of the Bengalees'। অবশ্য আলোচ্য প্রবন্ধটি পড়লে এও মনে হতে পারে যে কিছু রামমোহন-ভক্তই রবীন্দ্রনাথের হৃদয়ে 'implanted the myth'। যাই হক, রমেশচন্দ্র হয়ত বলতে চেয়েছেন যে প্রচলিত রামমোহন-পূজাকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর অনন্যকরণীয় ভাষায় সমৃদ্ধ করে বাঙালীদের পরিবেশন করেন—ফলে তারা বিভ্রান্ত হয়। অর্থাৎ, যত নষ্টের গোড়া ওই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

প্রকৃতপক্ষে মনে হতে পারে যে রবীন্দ্রনাথ যে কি ঘোর অন্যায় কাজ করেন সেটাই প্রমাণ করা রমেশচন্দ্রের প্রবন্ধের প্রধান লক্ষ্য। যাই হক, 'Rammohan myth'-কে বিদীর্ণ করা ছাড়াও, রমেশচন্দ্র বলেন যে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পূর্বোক্ত প্রামাণ্য রচনাটিকে 'আধুনিক যুগের উপযোগী করিবার উদ্দেশ্যে' তিনি 'রামমোহন সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য' সংগ্রহ করে তাঁর প্রবন্ধটি রচনা করেন। প্রথমেই খট্‌কা লাগে যে সে 'আধুনিক যুগের' শুরু হয় কবে। তারপর, রমেশচন্দ্রের প্রবন্ধে অবশ্যই কিছু 'তথ্য' আছে যা ব্রজেন্দ্রনাথের প্রবন্ধে নেই। কিন্তু রমেশচন্দ্র তাঁর প্রবন্ধে এমন অনেক 'তথ্য' সংযোজিত করেন, যা ব্রজেন্দ্রনাথের রচনাতেও পাওয়া যায়। তাঁর প্রবন্ধে সেই পুরোণ 'তথ্য'গুলি তিনি উল্লেখ না করলেও পারতেন—'brevity is the soul of wit'। হয়ত তিনি মনে করেন যে তা না করলে তাঁর প্রবন্ধ 'আধুনিক যুগের উপযোগী' হবে না। যাই হক, তাঁর পরিবেশিত সেই 'তথ্য'গুলির মধ্যে তিনটি বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ মনে হয়। তিনটিই রামমোহনের নৈতিক চরিত্র সম্বন্ধীয়।

প্রথমত, রামমোহনের ধনোপার্জনের একটি সূত্র ছিল উৎকোচগ্রহণ। যদিও রমেশচন্দ্র নিজেই লেখেন 'এ বিষয়ে নিশ্চিত কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব নহে, (৩৩), তবুও তাঁর কাছে 'রামমোহন যে এইভাবে ধনী হইয়াছিলেন ইহাই' স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়' (৩৩)। কার কাছে কখন, কি, কেন 'স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়' মনোবিদ্যায় সে গবেষণায় প্রবৃত্ত হবার প্রয়োজন এখানে নেই। তবে যে 'তথ্য' মিথ্যা হতে পারে বলে রমেশচন্দ্রের নিজের ধারণা, সেটিকে বিস্তারিত ভাবে সত্যের আকার দেবার চেষ্টা করার কারণ কি? সেটা কি সত্যানুরাগের লক্ষণ? ইতিহাসে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের চারিত্রিক দোষ-ক্রটির উল্লেখ করার অধিকার ও স্বাধীনতা প্রত্যেক ঐতিহাসিকেরই আছে। কিন্তু সে অধিকার ও স্বাধীনতার চর্চা সৎ ঐতিহাসিকেরা করে থাকেন অকাট্য প্রমাণের ভিত্তিতে। কোন কুৎসা প্রবণতা তাঁদের বক্তব্যকে যেন দূষিত না করে, সে বিষয়ে তাঁরা সজাগ থাকেন। সুতরাং, রমেশচন্দ্রের মত মহান ঐতিহাসিক রামমোহনের চরিত্র সম্বন্ধে একটা অনুমান অসত্য হতে পারে জেনেও, সেটিকে 'প্রকৃত তথ্য' বলে চালাবার চেষ্টা কেন করেন? সত্য মিথ্যার রহস্য বড়ই দুর্বোধ্য। তাই শাস্ত্রমতে 'সত্যানৃতে বিনিশ্চিত্য ততো ভবতি ধর্মবিৎ, (মহাভারত শান্তি পর্ব ১০৯/৬)—অর্থাৎ, 'যে লোক ক্ষেত্র অনুসারে সত্য ও মিথ্যা বলিতে পারে, সেই লোকই ধর্মজ্ঞ হইয়া থাকে'।

দ্বিতীয়ত, রামমোহন 'ধনীদের ন্যায় বাইজীর নৃত্যগীত, সাহেবদের নিমন্ত্রণ প্রভৃতি বিলাস-ব্যসনের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন' (৩৩)। এই প্রসঙ্গে রমেশচন্দ্র আর একজায়গায় লেখেন: 'He (রামমোহন) lived in his well furnished house in Calcutta amid great luxury and we have reports of the parties he gave at his house in which European guests including ladies were entertained by drinking and dancing girls'[২১]। রামমোহন যে ব্যাভিচার এবং বেলেল্লাপনাতেও অনুরক্ত ছিলেন, রমেশচন্দ্রের মন্তব্য দুটিতে সে ইঙ্গিত স্পষ্ট। এখানে দুএকটা কথা বলতে চাই: তখনকার দিনে কলকাতার ধনী সমাজে 'conspicuous living' এর একটা প্রবল প্রবণতা ছিল। তা ছিল তৎকালীন জীবন-যাত্রার নকশার একটা অঙ্গ। বড় মানুষী দেখাতে এবং আভিজাত্যের ঠাট বজায় রাখতে কলকাতার ধনীবাবুরা সাধারণত বেপরোয়া অর্থ ব্যয় করতেন। তাঁদের অনেকের নৈতিক অসংযমও খুবই চোখে পড়ে। কিন্তু প্রশ্ন হল, রামমোহনও

কি এই ধরণের অসংযত বিলাসিতায় লিপ্ত ছিলেন? কথায় বলে, 'যারে দেখতে নারি তার চলন বাঁকা'। রামমোহন অবশ্যই ধনী ব্যক্তি ছিলেন। যথেষ্ট দক্ষতার সঙ্গে তিনি ধন উপার্জন করেন, এবং তা করেন বলেই তৎকালীন বঙ্গ সমাজে তাঁর মর্য্যাদা ও প্রতিপত্তি ছিল; তাঁর পক্ষে ১৮১৫ সালের পর থেকে এক রকম সম্পূর্ণভাবে সমাজ সংস্কারে আত্মনিয়োগ করা সম্ভব হয়; এবং তিনি তাঁর গ্রন্থগুলি রচনা করতে সক্ষম হন—সংক্ষেপে ইতিহাসে তাঁর স্থান হয়। তারপর, তিনি আশ্রমী ধর্মসংস্কারক ছিলেন, পর্ণকুটিরবাসী বা গুহাবাসী বা ভবঘুরে সন্ন্যাসী নন। তিনি যদি কলকাতায় একাধিক গৃহের মালিক হন, এবং সেগুলিকে উৎকৃষ্ট আসবাব পত্রে সজ্জিত করেন, তাতে তাঁর অপরাধ কি হয়? সমাজের ধনী, প্রতিপত্তিশালী এক বৃহৎ অংশের অতীব বিরাগভাজন হওয়া সত্ত্বেও তিনি প্রভূত সামাজিক মর্যাদা এবং খ্যাতির অধিকারী ছিলেন। তাঁর বাড়ীতে দেশী বিদেশী বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিরা আসা যাওয়া করতেন, সুতরাং, তাঁর পক্ষে নিজের বাড়ীগুলিকে সুসজ্জিত রাখাটাইত স্বাভাবিক ব্যাপার। তাছাড়া তখনকার দিনে আমোদপ্রমোদের একটি প্রকৃষ্ট উপায় হিসাবে বাড়ীতে বাইজীদের নাচ গানের আয়োজন করা ছিল একটা রেওয়াজ। ধনীদের ঘরে ঘরে তা হত। একজন প্রত্যক্ষদর্শী ইংরাজের মতে 'almost the only amusement with the more wealthy Indian inhabitants'।[২২] বাইজীদের নাচ যে সে কালে ধনী সমাজের বিলাসিতা এবং ব্যাভিচারের একটা বৃহৎ উৎস ছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। সমসাময়িক পত্র পত্রিকাগুলিতে চোখ বোলালেই ধরা পড়ে যে এক অসংযত উৎসব-প্রিয়তা এবং বাইজীবাজির বীভৎস ব্যসন সমাজে ধনীদের এবং অপেক্ষাকৃত কমধনীদেরও পেয়ে বসেছিল। সে হল্লোড় এবং বেলেল্লাগিরিতে যোগ দেবার মত সাহেবও তখন শহরে কিছু ছিল। রমেশচন্দ্র তাঁর সম্প্রতি প্রকাশিত History of Modern Bengal গ্রন্থে বিশদভাবে দেখিয়েছেন যে ধনী বাঙালীদের উৎসব এবং আমোদপ্রমোদ কিভাবে নৈতিক উচ্ছৃঙ্খলতায় পরিণত হয় এবং সে উচ্ছৃঙ্খলতার ব্যাপক প্রসার সমাজ জীবনকে কিভাবে দূষিত করে ও সামাজিক অবক্ষয়ের কারণ হয়। কিন্তু তার থেকে এরকম ঢালাও সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়া যায় না যে বাড়ীতে পান ভোজনের এবং বাইজী নাচের আয়োজন করার উদ্দেশ্যই ছিল বেলেল্লাগিরির আসর জমানো। তখনকার দিনে বহু শিষ্ট এবং বিশিষ্ট ধনীর গৃহে আয়োজিত উৎসবে এবং আমোদপ্রমোদে শহরবাসী

ইংরাজরা যোগ দিতেন, তাঁদের 'ladies'দের সঙ্গে নিয়েই। এমন কি গভর্ণর-জেনারেলরাও সদলবলে উপস্থিত হতেন। তাঁরা পান ভোজন করতেন, বাইজীদের গান শুনতেন, নাচ দেখতেন; আরও কত তামাসা উপভোগ করতেন, এবং তারপর বাড়ী ফিরে যেতেন।[২৩] একজন বিশিষ্ট লেখক সম্প্রতি বলেন, 'শহরের বাঙ্গালী অভিজাতরা আমোদ-প্রমোদ ও বিলাসিতায় অজস্র অর্থব্যয় করতেন। দুর্গোৎসবে, বিবাহে ও শ্রাদ্ধে, পানভোজনের মজলিসে শহরের গণমান্ত ইংরাজরাও আমন্ত্রিত হতেন, তাদের জন্ত বিশেষ নাচ গান ও আতস বাজির ব্যবস্থা করা হত। নাচ গানের মধ্যে হিন্দুস্থানী সুর ও ভঙ্গির সঙ্গে কিছু কিছু ইংরাজী সুর ও ভঙ্গি মিশিয়ে একটি বিচিত্র বস্তু সাহেবদের মনোরঞ্জনের জন্ত পরিবেশন করা হত'।[২৪] পান ভোজন ও বাইজী নাচের আয়োজনের মধ্যে নিঃসন্দেহে বহু ঘোরতর দোষ দেখা দেয়, কিন্তু তা করাটাই একটা দূষণীয় ব্যাপার বলে মনে করা হত না। অনেক ভদ্র পরিবারে পরিচ্ছন্ন পরিবেশে তার অনুষ্ঠান হত। রামমোহন ধনী ছিলেন, তাঁর জীবনযাত্রা ব্যয়বহুল ছিল, কিন্তু সাধারণ ভাবে কলকাতার অলস, ধনীবাবুদের মত তিনি ঐশ্বর্য জাহির করার প্রতি-যোগিতায় কখন অবতীর্ণ হননি—অবাধ বিলাসিতার দুষ্ট নেশা বা কোন রকম অভব্যতা তাঁকে স্পর্শ করেনি। যে সূত্র থেকে রমেশচন্দ্র রামমোহনের ব্যসনা-সক্তি সম্বন্ধে 'প্রকৃত তথ্য' আহরণ করেন সেটি এখানে উপস্থিত করা হল: 'কলিকাতা আসিবার অল্পদিনের মধ্যেই রামমোহন সেখানকার একজন গণ্যমান্ত ব্যক্তি বলিয়া পরিগণিত হইলেন। তাঁহার তখন অর্থের অভাব ছিল না, সুতরাং কলিকাতায় তিনি ঐশ্বর্যশালী ব্যক্তির মতই থাকিতেন, দশ জনের কাছেও প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তির মতই মান্ত হইতেন। তাঁহার মানিকতলার বাড়ীতে শহরের বহু সম্ভ্রান্ত লোকের সমাগম হইত। উহাদের মধ্যে দেশী লোক ভিন্ন বহু বিদেশী ব্যক্তিও থাকিত। বিদেশ হইতে যাঁহারা ভারত-ভ্রমণে আসিতেন, তাঁহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই রামমোহনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন। এইরূপ পরিব্রাজকদের মধ্যে ফিট্সক্লারেন্স (আর্ল অব মানষ্টার), ফরাসী বৈজ্ঞানিক ভিক্তর জাকর্ম ও ইংরাজ মহিলা ফ্যানী পার্কসের নাম উল্লেখযোগ্য। এই ইংরেজ মহিলা তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্তে রামমোহনের বাড়ীতে একটি উৎসবের বর্ণনা করিয়াছেন; তিনি লিখিয়াছেন:—"১৮২৩ মে—সেদিন সন্ধ্যাবেলা আমরা রামমোহন রায় নামে একজন ধনী বাঙ্গালী বাবুর বাড়ীতে একটি পার্টিতে গিয়াছিলাম। বাড়ীর বড় হাতায় বেশ ভাল রোশনাই

হইয়াছিল এবং চমৎকার বাজী পোড়ান হইয়াছিল। বাড়ীর ঘরে ঘরে নাচওয়ালীরা নাচ গান করিতেছিল···উহাদের গান গাহিবার রীতি অদ্ভুত; সময়ে সময়ে স্বর নাকের ভিতর দিয়া আসিতেছিল; কতগুলি সুর বেশ মিষ্ট; এই নাচওয়ালীদের মধ্যে নিকীও ছিল—তাহাকে প্রাচ্য জগতের কাঠালানী বলা হইত।"[২৫] পাঠকরাই বিচার করবেন যে রামমোহন কি করেন, এবং রমেশচন্দ্র মনে করেন, তিনি কি করেন।

তৃতীয়ত, রমেশচন্দ্রের অভিযোগ যে জ্যেষ্ঠ্যভ্রাতা, জগমোহন রায়ের দুর্দিনে রামমোহন তাঁকে সাহায্য করতে এগিয়ে আ'সেন নি। তিনি বলেন, 'ব্রজেন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন—"গর্ভমেণ্টকে কিছু টাকা দিয়া জেল হইতে মুক্তি পাইবার জন্য জগমোহন অর্থশালী কনিষ্ঠের নিকট কিছু সাহায্য প্রার্থনা করেন। অনেক চিঠিপত্র লেখালেখির পর ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ ফেব্রুয়ারি তারিখে সুদ সমেত ফিরাইয়া দিবেন এই মর্মে তমসুক লিখিয়া দিবার পর রামমোহন জ্যেষ্ঠ্যকে এক হাজার টাকা কর্জ দেন।" (৩৩) রামমোহনের এই ব্যবহারে ক্ষুব্ধ রমেশচন্দ্র এক জায়গায় মন্তব্য করেন: "This is no doubt, fully in consonance with the spirit of a professional money lender, but is hard to believe even in the case of an ordinary man, not to speak of a man of the stature of Rammohan Ray'[২৬]। রামমোহনের ব্যবহারে অসন্তোষ প্রকাশ করার আগে রমেশচন্দ্র তাঁর পাঠকদের কয়েকটি তথ্য পরিবেশন করতে পারতেন—যেমন, জগমোহন রায় কি চরিত্রের মানুষ ছিলেন; তিনি কি ধরণের জীবন যাপন করতেন; তাঁর আয় ব্যয় কি ছিল; আর্থিক লেনদেনের ব্যাপারে তাঁর সুনাম ছিল কিনা; অনুজ রামমোহনকে তিনি কি চোখে দেখতেন, ইত্যাদি। তাঁকে রামমোহন এক হাজার টাকা কর্জ দেন বলেই তিনি কারামুক্ত হন, এবং সে টাকা তিনি কোনদিন শোধ দেন বলেও জানা যায় না। এটা স্পষ্ট যে রামকান্ত রায়ের মত বিশিষ্ট ব্যক্তির জ্যেষ্ঠ্য পুত্র তাঁর দুর্দিনে এক হাজার টাকাও সংগ্রহ করতে পারেন নি। রামমোহনের পিতা রামকান্ত এবং অগ্রজ জগমোহন যে ভাগ্যবিপর্যয় ও অবমাননার সম্মুখীন হন, তা কোন দৈবদুর্বিপাকের ফলে নয়। নিজেদের কৃত অপরাধের জন্যই তাঁদের কারাবাস ঘটে। রামকান্ত এবং জগমোহন, উভয়েই জাগতিক ভাগ্যান্বেষণের দুঃসাহসিক প্রচেষ্টায় লিপ্ত হন—এবং পরাভূতও হন। 'excitements of ambition, and all the allurements of

worldly grandeur'এর শিকার, তাঁর পিতৃপিতামহের ভাগ্যের চপলতা সম্বন্ধে রামমোহন মন্তব্য করেন 'the usual fate of courtiers, with various success, sometimes rising to honour and sometimes falling, sometimes rich and sometimes poor; sometimes excelling in success, sometimes miserable through disappointment'।[২৭] এই ধরণের জীবনযাত্রার প্রতি রামমোহন ছিলেন গভীরভাবে বিরূপ—এবং সেই কারণেই তাঁর চিন্তা ও কর্ম তাঁর পরিজনের কাছে এক বিষম পারিবারিক দুর্ঘটনা হয়ে দেখা দেয়। রামমোহনের জীবনের এটি এক বৃহৎ কৃতিত্ব যে তখনকার দিনে তিনি তাঁর স্বাতন্ত্র্য এবং ব্যক্তিগত প্রত্যয়ের মূল্য রক্ষায় অবিচল থেকে নিজেকে তাঁর পারিবারিক ও সামাজিক 'ethos'এর প্রভাব থেকে প্রায় সম্পূর্ণ মুক্ত করতে সক্ষম হন। এটিও একটি কম গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা নয়। রমেশচন্দ্র বলতে চান যে রামমোহন একজন ঝানু সুদখোর ছিলেন—আত্মীয়তার কোন আবেগ বা মূল্য তাঁর হৃদয়ে স্থান পাইনি। কথাটা অর্থহীন। জগমোহনকে টাকা দান না করে, ধার দেন রামমোহন সুদ খাবার লোভে, এইটাই রমেশচন্দ্রের ইঙ্গিত। কিন্তু একথা কি মনে করা অসঙ্গত যে জগমোহনের চরিত্রের প্রতি রামমোহনের কোন শ্রদ্ধা ছিল না, তাঁকে তিনি অসৎ লোক বলে মনে করতেন, এবং তাঁর অবিমৃষ্যকারিতাকে প্রশ্রয় দেওয়া অন্যায় কাজ বলে মনে করেন? রমেশচন্দ্র ঠিকই ইঙ্গিত করেন যে রামমোহন 'ordinary man' ছিলেন না—তার প্রমাণ কোন আত্মীয়তার আবেগ বা বন্ধন তাঁকে দুর্বল করতে পারে নি, অন্তত তাঁর অগ্রজের ক্ষেত্রে।

যাইহক, এগুলির কোনটিই নতুন 'তথ্য' নয়। তবুও তাঁর প্রবন্ধে সে গুলির অবতারণা করার প্রয়োজন রমেশচন্দ্র বোধ করেন। এবং তার জন্য তাঁর প্রবন্ধের পাঠকরা যদি মনে করেন যে তিনি রামমোহনের 'চরিত্র সম্বন্ধে কটাক্ষ' করছেন, সেই আশঙ্কায় তিনি আগেভাগেই বলে নেন 'এই সমুদায় ঘটনার উল্লেখের কারণ রামমোহনের চরিত্র সম্বন্ধে কটাক্ষ করা নহে। সে যুগে—এবং এ যুগেও—শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে এই শ্রেণীর লোকের সংখ্যাই বেশী—সুতরাং ইহা বিশেষ কোন নিন্দার কারণ নহে' (৩৪)। প্রাজ্ঞ রমেশচন্দ্রের এই মন্তব্য পড়ে, বর্তমানে কোন কোন মহল আতঙ্কিত হলেও, 'শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের' অধিকাংশ মানুষ নিশ্চয় আশ্বস্তবোধ করবেন, এবং গর্বিতও হবেন রামমোহন রায়ের মত ব্যক্তির চারিত্রিক উত্তরাধিকার,

এবং রমেশচন্দ্র মজুমদারের মত ব্যক্তির পোষকতালাভ করে। প্রশ্ন হল, রামমোহনের এই দুঃশীলতাকে 'আধুনিক যুগের উপযোগী করে পরিবেশন করার প্রয়োজন রমেশচন্দ্র বোধ করেন কেন?

আধুনিক যুগের বাঙালীদের রামমোহনের দুষ্কর্মগুলোকে অনুসরণ করতে অনুপ্রাণিত করার জন্য? না। প্রশ্নের উত্তর রমেশচন্দ্রের প্রবন্ধের মধ্যেই পাওয়া যায়। ভক্তির আতিশয্যে অন্ধ রবীন্দ্রনাথ রামমোহনের মত দুর্নীতি পরায়ণ, ভোগ-বিলাস প্রিয় এবং 'Shylock' সদৃশ হৃদয়হীন ব্যক্তিকে 'ঋষি' 'মহাপুরুষ' প্রভৃতি বলে বর্ণনা করে তাঁর দেশবাসীকে বিভ্রান্ত করেন। প্রকৃত পক্ষে, রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে রমেশচন্দ্রের অভিযোগ দুটি: প্রথমত, রামমোহনের 'private life' সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যা বলেন তা অসার এবং রমেশচন্দ্রের কানে তা পরিহাসের মত বেজেছে এবং দ্বিতীয়ত, রামমোহনের 'public life' সম্বন্ধে তাঁর কথাগুলি কল্পনার উচ্ছ্বাসমাত্র। লক্ষ্যনীয় যে, ব্রজেন্দ্রনাথ তাঁর 'আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত প্রণালীতে লিখিত রামমোহনের জীবন-চরিত' এ রবীন্দ্রনাথের রামমোহন সম্বন্ধীয় রচনাগুলির অসারত্ব বা অবাস্তবতা প্রতিপাদন করার চেষ্টা করেন নি। রমেশচন্দ্রও ১৯৫৫, ১৯৬০, ১৯৬২, এবং ১৯৬৫ সাল-গুলিতে রামমোহন সম্বন্ধে যে দীর্ঘ প্রামাণ্য রচনাগুলি[২৮] প্রকাশ করেন, সে-গুলিতেও রবীন্দ্রনাথের রামমোহন চর্চার অসারতা বা অবাস্তবতা প্রতিপাদন করার প্রয়াস পাননি। আরও লক্ষনীয়, যে আলোচ্য প্রবন্ধের পাঠকদের তিনি পরোক্ষভাবে তাঁর উপরোক্ত রচনাগুলিকে উপেক্ষা করতে ইঙ্গিত করেন। তিনি বলেন 'যাঁরা প্রমাণ সহযোগে বিস্তারিত সমালোচনা জানিতে ইচ্ছুক তাঁহারা আমার ইংরাজী গ্রন্থ ও প্রবন্ধগুলি পড়িতে পারেন' (৩১)। ওই 'ইংরাজী গ্রন্থ ও প্রবন্ধগুলি' (একটি বাদে) সবই ১৯৭২ থেকে ১৯৭৫ সালের মধ্যে লিখিত। কেন রমেশচন্দ্র ১৯৭২ সালের পূর্বেকার রামমোহন-সম্বন্ধীয় তাঁর রচনাগুলির প্রতি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে অনীহা বোধ করেন তা অবশ্য দুর্বোধ্য নয়। যাইহক ১৯৭২ সাল (ওই বছরই বোধ হয় রমেশচন্দ্রের আধুনিক যুগ শুরু হয়) থেকেই মনে হয় তাঁর রামমোহন সমীক্ষায় রবীন্দ্রনাথকে উপস্থিত করার প্রয়োজন তিনি উপলব্ধি করেন।

বিষয়টির আলোচনায় আরও অগ্রসর হবার আগে রবীন্দ্রনাথের রামমোহন চিন্তা সম্বন্ধে দুচারটি কথা বলে নিতে চাই। অবশ্যই রবীন্দ্রনাথ একজন বিশিষ্ট রামমোহন-ভক্ত ছিলেন। তাঁর প্রধান পরিচয় এ যুগের একজন মহান মান-

বতাবাদী কবি, সাহিত্যিক ও চিন্তানায়ক এবং প্রাচীন উপনিষদীয় আধ্যাত্মিক চিন্তার একজন বিশিষ্ট পরিবাহক ও প্রবক্তা হিসাবে। তাঁর গভীর, নিবিড়, সরল ধর্ম চেতনা কোন প্রকার সঙ্কীর্ণতার দ্বারা কখনও আচ্ছন্ন হয়নি। প্রকৃত পক্ষে রামমোহনের ধর্ম জিজ্ঞাসা পরম্পরাক্রমে বিংশ শতাব্দীতে এসে রবীন্দ্র সাহিত্য-কীর্তিতে আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্যের এক বিচিত্র আয়তন লাভ করে। রামমোহনের চিন্তা ও কর্মকে রবীন্দ্রনাথ ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে বিচার করেননি। তা করা প্রকৃত তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। উপনিষদের ব্রহ্মজিজ্ঞাসা, রামমোহন এবং রবীন্দ্রনাথ, উভয়েরই ধর্মান্বেষণের মূল রশ্মি হলেও উপনিষদীয় ধর্মের প্রবক্তা হিসাবে তাঁদের ধর্মীয় দৃষ্টি ভঙ্গীর মধ্যে একটা পার্থক্য ছিল। বিশ্বধর্মের মহাক্ষেত্রে রামমোহন অন্বেষণ করেন একটা বুদ্ধিসিদ্ধ ব্যবহারিক সর্বজনীনতা, আর রবীন্দ্রনাথ করেন একটা অতীন্দ্রিয়, আধ্যাত্মিক সর্বজনীনতা। সে অন্বেষণে কিন্তু উভয়েরই মৌল প্রেরণা ছিল ঐশ্বরিক এবং মানবিক। তাই রামমোহনের বৃহৎ কর্মকাণ্ডের অন্তর্নিহিত যে মূল বস্তুটি রবীন্দ্রনাথের মনকে আলোকিত এবং হৃদয়কে অভিভূত করে তা হচ্ছে তাঁর মানবিক প্রেরণায় প্রকম্পিত বিশ্ব-হিতৈষণা। তাই তিনি বলেন: 'ভারতবর্ষের শাশ্বত বাণীকে জয়যুক্ত করতে কালে কালে যে মহাপুরুষেরা এসেছেন, বর্তমান যুগে রামমোহন রায় তাঁদেরই অগ্রণী।'[২৯] বা 'Rammohun belongs to the lineage of India's great seers who age after age have appeared in the arena of our history with the message of Eternal Man[৩০]।' যে সব ভারতীয় মহাপুরুষদের কথা রবীন্দ্রনাথ বলেন, তাঁদের প্রতিভা যে চারিত্রিক পরমাণু থেকে তেজস্ক্রিয়তা লাভ করে, তা হচ্ছে মানবতা। রামমোহনকেও রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় ধর্ম ও মানবতার সাধকদের অন্যতম বলে মনে করেন। রামমোহনের এই ভূমিকাই কবি রবীন্দ্রনাথের কাছে সবচেয়ে তাৎপর্য্যপূর্ণ হয়ে দেখা দেয়। তাঁর মতে ধর্ম ও মানবতার ওই ভারতীয় ধারা এক সময়ে বঙ্গদেশে লোকাচারের মরুভূমিতে হারিয়ে যায়—রামমোহন সে ধারাকে স্রোতস্বিনী করার উদ্যোগে আত্মনিয়োগ করেন।

কোন স্থিতধী ঐতিহাসিক রবীন্দ্রনাথের কথাগুলি অসার অবাস্তব বলে উড়িয়ে দেবেন না। তিনি বলবেন রবীন্দ্রনাথের রচনায় রামমোহনের ঐতিহাসিক ভূমিকার পূর্ণ পরিচয় মেলে না। সে রচনায় অনেক ফাঁক আছে। রবীন্দ্রনাথের মূল্যায়ণ একটা ধর্মীয়, আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গীর দ্যোতক, ভাবাত্মক ও

একদেশদর্শী। রামমোহনের চিন্তা ও কর্মের সামগ্রিক বিচার প্রয়োজন ঐতিহাসিক সমালোচনার দৃষ্টিতে। হয়ত, তিনি তাঁর রামমোহন-সমীক্ষায় রবীন্দ্রনাথকে উপেক্ষা করতে পারেন। তিনি বলবেন যে উপনিষদের ঋষিদের থেকে রামমোহন পর্যন্ত ভারতীয় ধর্মসাধকদের সকলেরই এক একটা ঐতিহাসিক ভূমিকা ছিল। সে ভূমিকার সম্যক পরিচয় পেতে হলে শুধু তাঁদের চিন্তার আধ্যাত্মিক সূত্রটি আবিষ্কার ও পরীক্ষা করলে চলবে না—সাধ্যমত প্রত্যেককে তাঁদের সমসাময়িক সামাজিক পটে সংস্থাপিত করে বিচার করতে হবে তাঁদের চিন্তা ও কর্মের বাস্তব তাৎপর্য্যটিকে। 'কালে হ বিশ্বা ভূতানি কালে চক্ষুর্বি পশ্যতি' (অথর্ববেদ ১৯।৫৩।৬)। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র সে পথে যান নি। যা অসমগ্র ও অসমায়ত তাকে তিনি অসার বলে উড়িয়ে দেন। উড়িয়ে দেন এই সহজ সত্যটিকে যে, যে মানবতাবাদী চিন্তা ও ব্যবহার যুগে যুগে সর্বদেশে মানুষের সশ্রদ্ধ পোষকতা লাভ করেছে, মানুষকে মানুষের সঙ্গে যুক্ত হবার শুভবুদ্ধি যুগিয়েছে, সর্বপ্রকার অমানুষিকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে মানুষকে প্রেরণা দিয়েছে, তার ভারতীয় প্রবক্তাদের মধ্যে রামমোহন ছিলেন অন্যতম। প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে রামমোহন নিকৃষ্ট চরিত্রের মানুষ—পরিহসনীয়, কেননা অসাধু বিবেচনায় অগ্রজকে তাঁর দুর্দিনে অর্থ সাহায্য করতে অসম্মত হন।

তবে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে টানাটানি করার একটা বিশেষ কারণ যে আছে তা রমেশচন্দ্রের প্রবন্ধে স্পষ্ট না হলেও প্রচ্ছন্ন। রামমোহন-পরিচয় প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন ও মধ্য যুগের ভারতীয় ঋষি, ধর্ম প্রবর্তক, সাধু সন্তদের যে উল্লেখ করেন তার ঐতিহাসিক যথার্থতা রমেশচন্দ্র অনায়াসেই আলোচনা করতে পারতেন। কিন্তু তা না করে তিনি রবীন্দ্রনাথের কথার 'অসারত্ব প্রতিপাদন করিবার জন্য' লিখলেন: 'এ যুগের ঋষিতুল্য বাঙ্গালীদের—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস, স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীঅরবিন্দের—সহিত এ বিষয়ে রামমোহনের প্রভেদ দেখাইবার জন্যই এত কথা বলিতে বাধ্য হইয়াছি' (৩৪)। বিচিত্র যুক্তি! প্রথমত, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ ও অরবিন্দ ভারতীয় অধ্যাত্ম সাধনার ও মানবতার যে মহান ঐতিহ্যের পরিবাহক ও পরিবর্ধক, তা জাতীয় ঐতিহ্য, আকস্মিক নয়। তারপর রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ ও অরবিন্দ, এঁরা প্রত্যেকেই যে অসাধারণ এবং মহৎ ব্যক্তি ছিলেন তা কজন মানুষ অস্বীকার করেন'? রামমোহন ঋষি, সন্ন্যাসী বা যোগী, কিছুই ছিলেন না—তা হবার চেষ্টাও তিনি

কখনও করেন নি। রামমোহন, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ ও অরবিন্দ, এঁরা এক-একজন এক এক ধরণের মানুষ ছিলেন। এঁদের প্রত্যেকের জীবনের ইতিহাস নিজস্ব পথে ও রীতিতে গড়ে ওঠে। এক এক ক্ষেত্রে নিজ নিজ কর্ম ও সাধনার দ্বারা তাঁরা প্রত্যেকেই ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেন, নতুন বৈশিষ্ট্যে ও গৌরবে উজ্জ্বল করে তোলেন—তাঁরা অমর কীর্তির অধিকারী। চারিত্রিক স্বাতন্ত্র্য ও অনন্যতা হচ্ছে প্রতিভান্বিত ব্যক্তিত্বের পরম লক্ষণ। রামমোহন, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ ও অরবিন্দের জীবন ও সাধনায় সে লক্ষণ সমুদ্ভাসিত। সুতরাং রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ ও অরবিন্দের নাম উল্লেখ করে, তাঁদের সঙ্গে রামমোহনের 'প্রভেদ দেখাইবার জন্যই এত কথা বলিতে' রমেশ-চন্দ্রের কি প্রয়োজন ছিল, প্রাসঙ্গিকতাই বা তার কি ছিল? তাঁদের মধ্যে কে বড় এবং কে ছোট, তা প্রমাণ করার চেষ্টাওত অন্ধ ভক্তির লক্ষণ—ঐতি-হাসিকের পক্ষে সে বিচারের যুক্তি কি, অর্থই বা কি? ছেলেবেলায়, মনে পড়ে, একজন পণ্ডিত মশাই আমাদের বুঝিয়ে ছিলেন (সম্ভবত, ইংরাজী ব্যাকরণের একটি দৃষ্টান্তকে অসার প্রতিপাদন করার জন্য এবং আমাদের হৃদয়ে দেশপ্রেম জাগাবার জন্য) যে কালিদাস ও Shakespeare এর প্রতিভার মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। পরে যখন কালিদাস ও Shakespeare এর রচনা পড়ার সৌভাগ্য হয়, তখন বুঝতে পারি যে পণ্ডিতমশাই কত পণ্ডিত, কাব্য-রসিক ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ব্যক্তি ছিলেন। যাই হক, রমেশচন্দ্রের ভেদাভেদ বিচার যে নিতান্ত অবান্তর নয় তা বোঝা বিশেষ কঠিন নয়। তিনি অবশ্যই ঘুষখোর, সুদখোর, ভোগাসক্ত রামমোহনের ভক্ত নন; মনে হয় তিনি বাঙ্গালী রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ ও অরবিন্দের ভক্ত; তাই তাঁদের তুলনায় রামমোহন যে নিকৃষ্ট ব্যক্তি সেটাই প্রমাণ করার জন্য তিনি 'এত কথা বলিতে বাধ্য' হন।

রমেশচন্দ্রের বক্তব্যের মধ্যে আরও একটা সূক্ষ্মতর ইঙ্গিত আছে বলে মনে হয়: রবীন্দ্রনাথ শুধুমাত্র যে রামমোহনের মত নিকৃষ্ট চরিত্রের ব্যক্তিকে মহাপুরুষ বলেন তা নয়; তা বলতে গিয়ে তিনি রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ ও অরবিন্দের মত 'ঋষিতুল্য বাঙ্গালীদের' উপেক্ষা করেন। রামমোহন-ভক্তি রবীন্দ্রনাথের বিচারবুদ্ধিকে এমনই আচ্ছন্ন করে ফেলে যে আধুনিক ভারতবর্ষের ইতিহাসে প্রকৃত মহাপুরুষ কারা তা বিচার করতে তিনি অক্ষম হন। এটা অবশ্যই ঠিক যে, যে পরিমাণ অবাস্তব, অসার, মনগড়া কথা রবীন্দ্রনাথ রামমোহন সম্বন্ধে বলেন বা যে পরিমাণ উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন, তা তিনি

রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ বা অরবিন্দ সম্বন্ধে করেন নি। কিন্তু তার থেকে কি প্রমাণ হয় যে রবীন্দ্রনাথ তাঁদের মহত্ব এবং প্রতিভার সমঝদার ছিলেন না বা তার মর্যাদা দিতে নারাজ ছিলেন? রবীন্দ্রনাথ কি কোথাও, কখন বলেন যে তাঁরা ঋষিতুল্য ব্যক্তি বা মহাপুরুষ ছিলেন না? ওপরে ভারতীয় মহাপুরুষদের সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের যে উক্তিটুটি উদ্ধৃত করা হয়েছে তার মধ্যে রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ ও অরবিন্দের মহত্বের ইঙ্গিত কি অনুস্যূত নেই? এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'পরমহংস রামকৃষ্ণদেব' নামে একটি ক্ষুদ্র কবিতা উল্লেখযোগ্য :

'বহু সাধকের বহু সাধনার ধারা
যেয়ানে তোমার মিলিত হয়েছে তারা
তোমার জীবনে অসীমের লীলা পথে
নতুন তীর্থ রূপ নিল এ জগতে;
দেশ বিদেশের প্রণাম আনিল টানি
সেথায় আমার প্রণতি দিলাম আনি।'[৩১]

বিবেকানন্দ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ অনেক কথা বলেন। সেগুলোর দু একটি এখানে উপস্থিত করা যেতে পারে : 'অল্পদিন পূর্বে বাংলাদেশে যে মহাত্মার মৃত্যু হইয়াছে সেই বিবেকানন্দও পূর্ব ও পশ্চিমকে দক্ষিণে ও বামে রাখিয়া মাঝখানে দাঁড়াইতে পারিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের ইতিহাসের মধ্যে পাশ্চাত্যকে অস্বীকার করিয়া ভারতবর্ষকে সংকীর্ণ সংস্কারের মধ্যে চিরকালের জন্য সংকুচিত করা তাঁহার জীবনের উপদেশ নহে। গ্রহণ করিবার, মিলন করিবার, সৃজন করিবার প্রতিভাই তাঁহার ছিল। তিনি ভারতবর্ষের সাধনাকে পশ্চিমে ও পশ্চিমের সাধনাকে ভারতবর্ষে দিবার ও লইবার পথ রচনার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন।'[৩২] 'রামমোহন রায়, স্বামী দয়ানন্দ, কেশবচন্দ্র, রামকৃষ্ণ পরমহংস, বিবেকানন্দ, শিবনারায়ণ স্বামী ইহারাও অনৈক্যের মধ্যে এককে, ক্ষুদ্রতার মধ্যে ভূমাকে, প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য জীবনের সাধনাকে ভারতবর্ষের হস্তে সমর্পণ করিয়া দেন।'[৩৩] 'আধুনিক কালের ভারতবর্ষে বিবেকানন্দই একটি মহৎ বাণী প্রচার করেছিলেন, সেটি কোনো আচারগত নয়। তিনি দেশের সকলকে ডেকে বলেছিলেন, তোমাদের সকলের মধ্যে ব্রহ্মের শক্তি—দরিদ্রের মধ্যে দেবতা তোমাদের সেবা চান। এই কথাটা যুবকদের চিত্তকে সমগ্রভাবে জাগিয়েছে। তাই এই বাণীর ফল দেশের সেবায় আজ বিচিত্রভাবে, বিচিত্র ত্যাগে ফলছে। তাঁর বাণী মানুষকে যখনই সম্মান

দিয়েছে, তখনি শক্তি দিয়েছে। সেই শক্তির পথ কেবল একরোঁকা নয়, তা কোনো দৈহিক প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তির মধ্যে পর্যবসিত নয়, তা মানুষের প্রাণ মনকে বিচিত্রভাবে প্রাণবান করেছে। বাংলাদেশের যুবকদের মধ্যে যে সব দুঃসাহসিক অধ্যবসায়ের পরিচয় পাই তার মূলে আছে বিবেকানন্দের সেই বাণী যা মানুষের আত্মাকে ডেকেছে, আঙুলকে নয়।'[৩৪] অরবিন্দের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে রবীন্দ্রনাথ লেখেন :

> 'অরবিন্দ' রবীন্দ্রের লহ নমস্কার।
> হে বন্ধু, হে দেশবন্ধু, স্বদেশ আত্মার
> বাণী মূর্তি তুমি। তোমা লাগি নহে মান,
> নহে ধন, নহে সুখ ; কোনো ক্ষুদ্র দান
> চাহ নাই কোনো ক্ষুদ্র কৃপা ; ভিক্ষা লাগি
> বাড়াওনি আতুর অঞ্জলি'।[৩৫]

একবার অরবিন্দের সঙ্গে দেখা হলে রবীন্দ্রনাথ বলেন : 'At the very first sight I could realize he had been seeking for the soul and have gained it, and through this long process of realization had accumulated within him a silent power of inspiration. His face was radiant with an inner light and his serene presence made it evident to me that his soul was not crippled and cramped to the measure of some tyrannical doctrine which takes delight in inflicting wounds upon life. I felt that the utterance of the ancient Hindu Risi spoke from him of that equanimity which gives the human soul its freedom of entrance into the All'।[৩৬] ইতিহাসে ঋষি, মহাপুরুষ যাঁরা তাঁদের চিনতে রবীন্দ্রনাথের ভুল হয়নি ; তাঁদের মর্যাদা দান করতেও তিনি কুণ্ঠিত হননি।

মনে হয়, ব্রজেন্দ্রনাথকে রমেশচন্দ্র রামমোহন-ভক্ত বলে মনে করেন না, যদিও তিনি তার রামমোহন-চরিতে লেখেন : 'ইংরাজ শাসনকালে ভারতবর্ষে যে সকল মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন রামমোহন তাঁহাদেরই একজন।'[৩৭] আর একস্থানে, '...রামমোহন রায় ভারতবর্ষে বর্তমান যুগের প্রবর্তক,'... 'বহুবিষয়ে পথপ্রবর্তকের সম্মান তাঁহারই প্রাপ্য।' এবং তাঁর উক্তির সমর্থনে তিনি রামমোহনের 'সমসাময়িক বয়োজ্যেষ্ঠ মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের' কয়েকটি কথা উদ্ধৃত করেন।[৩৮] রামমোহন সম্বন্ধে রমেশচন্দ্রের নিজের একটি রায়

এখানে উল্লেখযোগ্য : 'The standard of revolt he thus raised against the medieval tyranny of dogma unleashed forces which created what may he called Modern India and makes him worthy to rank by the side of Bacon and Luther'।[৩৯] রমেশচন্দ্র যখন বলেছেন তখন কথাগুলো নিশ্চয় অসার, অবাস্তব, উচ্ছ্বাস নয়, অক্ষরে অক্ষরে সত্য—'truth, the whole truth and nothing but the truth'. Francis Bacon এবং Martin Luther, দুজনেই ইতিহাসের মহাপুরুষ হিসাবে স্বীকৃত হন বলেই, ধরে নিতে হবে, রমেশচন্দ্র রামমোহন প্রসঙ্গে তাঁদের কথা উল্লেখ করেন। দেখা যাচ্ছে তাহলে যে যোগী, সন্ন্যাসী, ঋষি ইত্যাদি কিছুই না হয়েও কেউ কেউ ইতিহাসে মহাপুরুষের মর্যাদা লাভ করেন। এখন, রামমোহন যদি তাঁদের সঙ্গে ইতিহাসের একই সারির মানুষ হন, তাহলে রবীন্দ্রনাথের গলদটা কোথায় ? আর রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ রামমোহন-ভক্তদের কথার 'অসারত্ব প্রতিপাদন করিবার জন্যই' রমেশচন্দ্র নতুন করে 'এই সমুদয় কথা' বলবার বাধ্যতা অনুভব করলেন কেন ? লক্ষ্যণীয় যে, রামমোহনের মহত্ত্ব ও ইতিহাসে তাঁর স্থান সম্বন্ধে রমেশচন্দ্রের উপরোক্ত উক্তিটি তাঁর ১৯৬২ এবং ১৯৬৫ সালে লিখিত দুটি গ্রন্থেও[৪০] একেবারে অপরিবর্তিত ভাবেই মেলে। ১৯৭২ সালে এশিয়াটিক সোসাইটিতে প্রদত্ত বক্তৃতা দুটিতেও ওই উক্তিটির পুনরাবৃত্তি করার যথেষ্ট অবকাশ ছিল, কিন্তু তিনি তা করেন নি। তার পরেও না। সুতরাং ধরে নেওয়া যেতে পারে যে ১৯৭২ সালে রমেশচন্দ্রের রামমোহন-চিন্তায় একটি নতুন দিগন্ত উদ্‌ভাসিত হয়—কারণ মনে হয়, ঐতিহাসিক রচনার পদ্ধতি ও প্রণালী সম্বন্ধে কাণ্ডজ্ঞানহীন রামমোহন-ভক্তদের ভাবোচ্ছ্বাস, ও রামমোহন-পূজার প্রবণতা। রবীন্দ্রনাথও ঐতিহাসিক ছিলেন না, সুতরাং তাঁরও সে কাণ্ডজ্ঞান না থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু কথা হল যে ১৯৭২ সাল থেকে যাঁরা রমেশচন্দ্রের বিরুদ্ধতা করেন তাঁদের কথার জবাব দেবার জন্য তিনি প্রায় চল্লিশ বছর পেছিয়ে গিয়ে যদি রবীন্দ্রনাথকে পাকড়াও করা যুক্তিযুক্ত মনে করেন, তাহলে আরও প্রায় চল্লিশ বছর পেছিয়ে গিয়ে আর একজন মহান রামমোহন-ভক্তের নামও উল্লেখ করতে পারতেন। ভক্তের নাম স্বামী বিবেকানন্দ। তিনি একবার বলেন : 'সেই মহান হিন্দু সংস্কারক রাজা রামমোহন রায় এইরূপ নিঃস্বার্থ কর্মের অদ্ভুত দৃষ্টান্ত। তিনি তাঁর সমুদায় জীবনটা ভারতের সাহায্যকল্পে অর্পণ করিয়াছিলেন। তিনিই সতীদাহ প্রথা বন্ধ করেন। সাধারণত লোকের বিশ্বাস,

এই সংস্কার কার্য সম্পূর্ণরূপে ইংরাজদের দ্বারা সাধিত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নয়। রাজা রামমোহন রায়ই এই প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ করেন এবং একে রহিত করিবার জন্য গর্ভমেণ্টের সহায়তা লাভে কৃতকার্য হন। যতদিন না তিনি আন্দোলন আরম্ভ করেছিলেন, ততদিন ইংরাজরা কিছুই করেন নি। তিনি "ব্রাহ্ম সমাজ" নামে বিখ্যাত ধর্মসমাজের প্রতিষ্ঠা করেন, আর একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য ৩ লক্ষ টাকা দেন। তিনি তারপর সরে এলেন এবং বললেন, "আমাকে ছেড়ে তোমরা নিজেরাই এগিয়ে যাও।" তিনি নাম যশ একদম চাইতেন না, নিজের জন্য কোনোরূপ ফলাকাঙ্খা করতেন না'।[৪১] আর একবার বলেন: 'আমাদের পতনের অন্যতম কারণ এই যে, আমরা বাহিরে যাইয়া অপর জাতির সহিত নিজেদের তুলনা করি নাই; আপনারা সকলেই জানেন, যে-দিন হইতে রাজা রামমোহন রায় এই সঙ্কীর্ণতার বেড়া ভাঙিলেন, সেইদিন হইতেই ভারতের সর্বত্র আজ যে একটু স্পন্দন, একটু জীবন অনুভূত হইতেছে, তাহার আরম্ভ হইয়াছে। সেইদিন হইতেই ভারতবর্ষের ইতিহাস অন্যপথ অবলম্বন করিয়াছে এবং ভারত এখন ক্রমবর্ধমান গতিতে উন্নতির পথে চলিয়াছে'।[৪২] আরও এক প্রসঙ্গে স্বামিজী বলেন: 'আমাদের শঙ্কর, রামানুজ, চৈতন্য প্রভৃতি অনেক সংস্কারক হয়েছেন। তাঁরা সকলেই খুব বড়দরের সংস্কারক ছিলেন—তাঁরা সর্বদা গঠন করেছিলেন, তাঁরা যে দেশ-কাল অনুসারে সমাজ গঠন করেছিলেন—সেই হল আমাদের কার্যপ্রণালীর বিশেষত্ব। আমাদের আধুনিক সংস্কারকেরা ইয়োরোপীয় ধ্বংসমূলক সংস্কার চালাতে চেষ্টা করেন, এতে কারও কোনো উপকার হয়নি, হবেও না। কেবল একজন মাত্র আধুনিক সংস্কারক গঠনকারী ছিলেন—রাজা রামমোহন রায়'।[৪৩] আরও এক প্রসঙ্গে 'এই নৈনিতালেই স্বামিজী রামমোহন সম্বন্ধে অনেক কথা বলেন। এই আচার্যের শিক্ষার মূল সূত্ররূপে স্বামিজী তিনিটি বিষয়ের নির্দেশ করেন—তাঁহার বেদান্ত গ্রহণ, স্বদেশ প্রেম প্রচার এবং হিন্দু মুসলমানকে সমান ভাবে ভালবাসা। এই সকল বিষয়ে রাজা রামমোহন রায়ের উদারতা ও ভবিষ্যৎ দৃষ্টি যে কার্যপ্রণালীর সৃষ্টি করিয়াছিল, তিনি নিজে তাহা অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হইয়াছেন বলিয়া দাবী করেন'।[৪৪]

বিবেকানন্দের কথাগুলি রমেশচন্দ্রের না জানার কথা নয়—তিনি একজন বিবেকানন্দ-ভক্ত ও বিবেকানন্দ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ, এবং তাঁর মতে 'The work

began by Raja Rammohan Ray, of rejuvenating the Indian life was considerably advanced by Swamiji.'[৪৫] তিনিই বলবেন যে সন্ন্যাসী সংস্কারক বিবেকানন্দের ঐতিহাসিক কাণ্ডজ্ঞান কত গভীর ছিল। এটা বোঝা কঠিন নয় কেন তিনি তাঁর প্রবন্ধে রামমোহন-ভক্ত বিবেকানন্দের নাম উল্লেখ করেন নি। একথা মনে করা, মনে হয়, অযৌক্তিক হবে না যে অবিবেচক রবীন্দ্রনাথ রামমোহনের যে সব 'ভক্তগণের স্তুতিবাদের প্রতিধ্বনি' করেন, বিবেকানন্দ তাঁদের মধ্যে একজন। যাই হক, কোনো সংযতমনা ও সুবিবেচক ঐতিহাসিক তাঁর রামমোহন-চর্চায় বিবেকানন্দের উক্তিগুলিকে যেমন প্রামাণ্য হিসাবে গ্রহণ করবেন না, তেমনি সেগুলিকে অসার, অবাস্তব, কল্পনার উচ্ছ্বাস প্রভৃতি বলে তাঁকে উপহাসাস্পদ করে বাহাদুরী নেবেন না— তিনি বলবেন সেগুলি এক মহাত্মার আর এক মহাত্মার প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য।

রমেশচন্দ্র তাঁর প্রবন্ধের শেষ অনুচ্ছেদে লেখেন: 'রামমোহনের নিন্দা অথবা লোকের চক্ষে তাঁহাকে খাটো করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। রামমোহনের শ্রেষ্ঠ অবদান—অন্ধ সংস্কারের উপর যুক্তির প্রাধান্য স্থাপন করা। তাঁহারই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া আমি তাঁহার ভক্তদের অন্ধ সংস্কারের বিরুদ্ধে যুক্তির দ্বারা তাঁহার স্বরূপ নির্ণয় করিবার চেষ্টা করিয়াছি মাত্র'(৪৫)। 'অন্ধ সংস্কারের উপর যুক্তির প্রাধান্য স্থাপন করা'-ই যদি 'রামমোহনের শ্রেষ্ঠ অবদান' হয়, তাহলে সে 'অবদান' সম্বন্ধে রমেশচন্দ্র তাঁর প্রবন্ধে একটু বিশদ আলোচনা করবেন— অর্থাৎ, কিছু নতুন তথ্য সহযোগে তা প্রমাণ করবেন, এ প্রত্যাশা তাঁর পাঠকদের থাকা সঙ্গত। কিন্তু মাত্র দশটি শব্দে রমেশচন্দ্র রামমোহনের শ্রেষ্ঠ অবদান-এর পরিচয় দেন। আসলে রমেশচন্দ্র বিস্তারিত ভাবে প্রমাণ করতে চেষ্টা করেন যে রামমোহন যুক্তির চেয়ে অন্ধ সংস্কারের প্রতিই অধিক অনুরক্ত ছিলেন। 'প্রকৃত তথ্য' সহযোগে রমেশচন্দ্র দেখান যে 'রামমোহন সমাজে যাহা প্রচলিত আছে তাহা পরিবর্তনের বিরোধী ছিলেন, এবং তাঁহার আচরণও তাহাই সমর্থন করে'(৪১); এবং আরও যে 'রামমোহনের মতে প্রচলিত প্রথা মানিয়া চলাই উচিত তাহার পরিবর্তন শুধু অনাবশ্যক নহে, নিন্দনীয়'(৪২)। অন্যত্র রমেশচন্দ্র বলেন: 'The plain truth is that he was constitutionally averse to any change in the prevalent social practices

of the Hindus, though he did not like and sometime even deplored them[৪৬]।' ওই একই জায়গায় আরও বলেন: 'As regards social reforms, apart from his efforts towards the abolition of the cruel rite of the Sati, there is hardly anything to his credit which changed the foundation of the Bangasamaj'।[৪৭] এর কিছুদিন পরে লেখা একটি গ্রন্থে রমেশচন্দ্র লেখেন: 'He was definitely opposed to any change in the current social customs.'।[৪৮] ওই গ্রন্থে তিনি আরও যোগ করেন: 'his social reform, excepting the agitation against the Sati system, was practically nil, if not worse, from the point of view of regeneration of Hindu society which marks the new Age in Bengal'।[৪৯] রামমোহনের সংস্কার-বিরোধিতা সম্বন্ধে যে 'plain truth' রমেশচন্দ্র আবিষ্কার করেন, সে সম্বন্ধে কোনো মতামত ব্যক্ত করার আগে রমেশচন্দ্রের প্রবন্ধের অন্তর্গত শব্দার্থ বিস্তার একটি বিচিত্র কারিগরীর প্রতি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন মনে করি।

'সংস্কার', 'সমাজ সংস্কার', 'সামাজিক সংস্কার,' 'সমাজ সংস্কারক', 'সমাজের সংস্কারক' প্রভৃতি শব্দগুলিকে রমেশচন্দ্র তাঁর প্রবন্ধে যে ভাবে ব্যবহার করেন, তাতে তাঁর পাঠকরা কিছুটা বিভ্রান্ত বোধ করতে পারেন। এক জায়গায় তিনি লেখেন: 'সহমরণ প্রথা রহিত করিবার চেষ্টা ছাড়া তিনি (রামমোহন) আর কোন সামাজিক সংস্কারের দাবি করিতে পারেন না।' আর এক জায়গায় লেখেন: 'রামমোহন সমাজ সংস্কারক ছিলেন......ইহার কোন ভিত্তি নাই......তিনি যে সমাজের সংস্কারক ছিলেন এরূপ সাধারণ উক্তির ন্যায়সঙ্গত কারণ নাই।' আবার আর একজায়গায় লেখেন: 'নারী জাতির সম্বন্ধে তাঁহার উচ্চ ধারণা ছিল সত্য কিন্তু ধারণা ও সংস্কার সাধন এক কথা নহে। মনে মনে সমাজের কোন গ্লানি সম্বন্ধে অসন্তোষ অনুভব করা বা ভাষায় প্রকাশ করা—ইহাই সমাজ সংস্কার নহে—কিন্তু সেই সমুদয় গ্লানি দূর করিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করাই সমাজ সংস্কারের লক্ষণ—রামমোহন সহমরণ প্রথার (?) জন্য এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বিধবা বিবাহ প্রচলনের জন্য যে আয়াস বা প্রয়াস করিয়াছেন তাহার জন্য তাঁহারা সমাজ সংস্কারক পদবাচ্য হইতে পারেন' ইত্যাদি। রমেশচন্দ্র তাঁর নিজস্ব ভঙ্গীতে যা বলেন তার অর্থ

মনে হয়, প্রথমত, এই যে রামমোহনের সহমরণ প্রথা রহিত করার প্রচেষ্টা সমাজ সংস্কারের উদযোগ হলেও, তার দ্বারা সমাজের প্রকৃত সংস্কার ঘটেনি, বা তার জন্য রামমোহনকে 'সমাজ সংস্কারক' বা 'সমাজের সংস্কারক' বলার কোন যুক্তি নেই, এবং দ্বিতীয়ত, এই যে, রামমোহন ও বিদ্যাসাগর 'সমাজ সংস্কারক পদবাচ্য হইতে পারেন' কিন্তু তবুও তাঁরা যা করেন তা প্রকৃত 'সমাজ সংস্কার' নয়, কেননা, প্রথম কথা, তাঁরা সমাজের কোন কোন গ্লানি সম্বন্ধে 'অসন্তোষ অনুভব' এবং সে অসন্তোষ 'ভাষায় প্রকাশ' করেন মাত্র ও দ্বিতীয় কথা, তাঁরা নারী জাতির দুর্গতি দূর করিবার জন্য 'আয়াস বা প্রয়াস' করেন মাত্র, 'আপ্রাণ চেষ্টা' করেন না।

রমেশচন্দ্রের পাঠকদের প্রভূত উপকার হত যদি তিনি তাঁর প্রবন্ধে কয়েকটি ব্যাপার একটু পরিষ্কার করে লিখতেন। যেমন, 'সমাজ সংস্কারক', 'সমাজের সংস্কারক' এবং 'সমাজ সংস্কারক পদবাচ্য' ব্যক্তি এঁদের মধ্যে প্রভেদ কি; বা কোথায় 'আয়াস বা প্রয়াস'-এর শেষ এবং 'আপ্রাণ চেষ্টা'র শুরু হয়; বা 'আপ্রাণ চেষ্টা' বলতে কি ধরণের চেষ্টা বোঝায়, অর্থাৎ, কি করলে রামমোহন বা বিদ্যাসাগরের আমলে 'আপ্রাণ চেষ্টা' করা হত বলে মনে করা যেতে পারে ইত্যাদি। রামমোহনকে সংস্কারক বলা চলে না, এই কথাটি প্রমাণ করার জন্য রমেশচন্দ্র যে যুক্তিজাল বিস্তার করেন তা প্রকৃতই বিচিত্র। সংস্কার সম্বন্ধে এখানে কোনো সমাজতাত্ত্বিক আলোচনায় প্রবেশ করার প্রয়োজন বোধ করি না। তবে সংস্কার কি বা সংস্কারক কে, এসব ব্যাপার সম্বন্ধে রমেশচন্দ্র যে সব মতামত ব্যক্ত করেন, প্রসঙ্গ ক্রমে সেগুলির ওপর দু চার কথা বলতে চাই।

রমেশচন্দ্রের বিচারে রামমোহন ছিলেন সর্বপ্রকার পরিবর্তনের বিরোধী, সুতরাং তাঁকে সংস্কারক বলা চলে না। সংস্কার ও পরিবর্তন এ দুটি ব্যাপার যে নিত্য সম্বন্ধযুক্ত তা বোঝা বিশেষ কঠিন নয়। কিন্তু, প্রথমত, যিনি সংস্কারক তিনি যে সব প্রচলিত প্রথা বা আচার আচরণের পরিবর্তন চাইবেন, এমন কোন কথা নেই। তার দৃষ্টিভঙ্গী এবং কর্মসূচী খুবই রক্ষণশীল হতে পারে; দ্বিতীয়ত, তাঁর চোখে সমাজের যে ব্যাপারগুলি দুষ্ট, অসংস্কৃত, অমানবিক, *মানুষের কল্যাণের প্রতিকূল*, সেগুলির তিনি পরিবর্তন চান। প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থাকে সমূলে উৎপাটিত করে, এক নতুন সমাজ গড়তে তিনি মোটেই চান না—অর্থাৎ, তিনি আমূল-পরিবর্তন-বাদী নন; তৃতীয়ত, তাঁর লক্ষ্য মানুষের কল্যাণ সাধন, সুতরাং তাঁর বিচারে যা মানুষের উন্নতি, সমৃদ্ধি ও শান্তির

অনুকূল তার দিকে দৃষ্টি রেখেই তিনি সংস্কারে উদ্যোগী হন ; এবং চতুর্থত, তিনি যে সব ক্ষেত্রেই একটা নতুন কিছু করতে চাইবেন তা নাও হতে পারে। একটা লুপ্ত, প্রাচীন ব্যবস্থাকে মানুষের কল্যাণের অনুকূল মনে করে সেঠিকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করতে তিনি উদ্যোগী হতে পারেন। যাঁরা মানুষের কল্যাণের জন্য সামাজিক আচার আচরণ, প্রথা পরম্পরা প্রভৃতির পরিবর্তন চান তাঁদের চিন্তা কর্মের মধ্যে নিরন্তর একটা অব্যত্যয়ী সঙ্গতি নাও থাকতে পারে। তাঁদের এই সীমিততা এবং স্ববিরোধিতার ক্ষেত্রেই ঘটে ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞানের সঙ্গম, এবং সমাজবিজ্ঞানী প্রয়োজন মত ইতিহাস থেকে তাঁর তথ্য সংগ্রহ করেন।

যাঁরা মানুষের কল্যাণ কামনা করেন সাধারণভাবে তাঁদের, 'philanthropist', 'reformer'; এবং 'radical'—বিভাজনটি নিখুঁত না হলেও—এই তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে। দেখা যায় অবশ্য, যে এই তিন শ্রেণীর মানুষ প্রায়ই তাঁদের কক্ষ পরিবর্তন করে থাকেন, ফলে তাঁরা কে প্রকৃত কি চান সে সম্বন্ধে বেশ বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়। তবে মোটামুটিভাবে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গীর প্রকৃতি উপলব্ধি করা কঠিন নয়। একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। ধরা যাক, হিন্দু ধর্ম ও সংস্কারের কথা। যিনি 'philanthropist', তিনি সাধারণভাবে মনে করেন যে হিন্দুদের প্রচলিত সামাজিক আচার বিচার প্রথা প্রয়োগ, রীতিনীতি প্রভৃতি দৈব ইচ্ছায় পূত এবং পরম্পরা অনুমোদিত। সেগুলিকে উচ্ছেদ করা অনুচিত। তবে সেগুলির প্রকোপে যারা দুঃখ কষ্ট ভোগ করে, তাদের প্রতি সদয় এবং সহানুভূতিশীল হওয়া এবং সাধ্যমত তাদের সাহায্য করা উচিত—সেটা ঈশ্বরকে তুষ্ট করা এবং পুণ্য অর্জন করার একটা বিশিষ্ট উপায়। যিনি 'reformer' তিনি ওই আচার বিচার ইত্যাদির প্রতি নীতিগতভাবে বিশেষ শ্রদ্ধালু নন। তবে তাঁর অশান্তি ওইগুলির জন্য যত না, তার চেয়ে বেশী সেগুলি বহু সামাজিক হানি, অনাচার, দুঃখ প্রভৃতির উৎস বলে। তিনি সে জন্য চান সেগুলিকে যথাসাধ্য দূর ও নিয়ন্ত্রণ করতে যাতে সমাজ জীবন সুস্থ এবং উন্নত হয়। আর যিনি 'radical', তিনি মনে করেন ওই আচার বিচার প্রভৃতি নিছক মিথ্যা, বুজরুকি। সেগুলিকে জিয়িয়ে রাখার পেছনে একটা দুষ্ট মতলব আছে। সুতরাং সেগুলির আমূল উচ্ছেদ প্রয়োজন। সাধারণভাবে দেখা যায় যাঁরা 'reformer'—সংস্কারক, তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গী বেশ কিছুটা, যাকে বলা যায় 'pragmatic,' তাই। রামমোহন হিন্দু সমাজের প্রচলিত আচার আচরণ গুলির কি পরিবর্তন ও কতটুকু পরিবর্তন চান তা তাঁর কথা ও কাজের মধ্যে

স্পষ্ট। তাঁকে সংস্কার বিরোধী প্রমাণ করার জন্য রমেশচন্দ্র যা বলেন, তা তাঁর পাঠকদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা ছাড়া আর কিছু নয়।

রামমোহনের সংস্কার-বিরোধিতা সম্বন্ধে রমেশচন্দ্রের সিদ্ধান্তের ভিত্তি কত দৃঢ় তার প্রমাণ তাঁর প্রবন্ধেই মেলে। 'একজন অতিশয় বিচক্ষণ ব্রাহ্মণ' সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি Hyde East সাহেবকে একবার বলেন যে 'They (হিন্দুরা) would rather he reformed by any body else than by him' (রামমোহন) (৩৮)। হিন্দুরা যে 'reformation' চান নি তা নয়; তাঁদের বক্তব্য হচ্ছে যে তা হওয়া উচিত তাঁদের পছন্দসই, সরকারী উদ্যোগে এবং 'gradually and quietly' (রমেশচন্দ্রের বাংলা অনুবাদ অনুযায়ী 'শান্তিপূর্ণ ভাবে')। রামমোহনের নেতৃত্বে যে জোরালো সংস্কার আন্দোলন সৃষ্টি হয়, তা তাঁদের খুবই অপছন্দ। এই পছন্দ-অপছন্দের বিরোধ যে ব্যাপারটাকে স্পষ্ট করে তোলে তা হচ্ছে—রমেশচন্দ্রের ইঙ্গিত অনুযায়ী, যে হিন্দু সমাজের সংস্কারের জন্য রামমোহনের উদ্যোগ সমাজে খুবই চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে, যার জন্য অনেক হিন্দুরা মনে করেন যে হিন্দু সমাজ বিপন্ন। হিন্দু ভদ্রলোকদের অভিযোগ যদি সত্য হয়, তবে রমেশচন্দ্র কি বলে লেখেন যে রামমোহনের মতে হিন্দু সমাজের কোন সংস্কার 'শুধু অনাবশ্যক নহে, নিন্দনীয়'? আর, রমেশচন্দ্রের সিদ্ধান্ত যদি সঠিক হয়, তবে ত হিন্দু ভদ্রলোকেরা রামমোহনের বিরোধিতা না করে তাঁকে তাঁদের দলপতি নির্বাচিত করতে পারতেন।

এখানে আর একবার রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গ উত্থাপন করব। রামমোহন-ভক্ত রবীন্দ্রনাথের নিম্নলিখিত কথাকটি রমেশচন্দ্র তাঁর প্রবন্ধে উদ্ধৃত করেন: 'তিনি (রামমোহন) কি না করিয়াছিলেন? শিক্ষা বল, রাজনীতি বল, বঙ্গ ভাষা বল, বঙ্গ সাহিত্য বল, সমাজ বল, ধর্ম বল, কেবলমাত্র হতভাগ্য স্বদেশের মুখ চাহিয়া তিনি কোন কাজে না রীতিমত হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন'? (৩৪) সহজ বাংলায় বলা রবীন্দ্রনাথের এই কথাগুলো রমেশচন্দ্রের কাছে 'কল্পনার উচ্ছ্বাস' বলে মনে হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঐতিহাসিক কাণ্ডজ্ঞানবর্জিত ছিলেন, সুতরাং ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্রের কাছে তাঁর কথাগুলো কল্পনার উচ্ছ্বাস মনে হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু ঐতিহাসিক নিজে তাঁর প্রবন্ধে কি করেছেন? প্রবন্ধটি পড়লে কি মনে হয় না যে দেশের যে কাজগুলোর কথা রবীন্দ্রনাথ বলেন, প্রকৃতই তার সবগুলোতেই রামমোহন 'রীতিমত হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন'? বরং রবীন্দ্রনাথের তালিকায় রমেশচন্দ্র আরও দুচারটি কাজ জুড়ে দেন।

নীরেট সত্যের কারবারী ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্রের রামমোহন সম্বন্ধীয় আরও দু চারটি মন্তব্য এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে। রামমোহন যে 'Modern India'-র স্রষ্টা এবং ইতিহাসে তিনি যে 'Bacon' ও 'Luther'-এর সারির মানুষ সে কথা রমেশচন্দ্রের মুখে আগেই শুনেছি। সে ছাড়াও বেশ জোরালো ইংরাজিতে রমেশচন্দ্র একবার বলেন: 'Rammohan assailed the stron gest part of the citadel of Hindu religion and society. He opposed the worship of images of gods and goddeses, denounced sati, polygamy, and abuses of the caste system, favoured remarriage of Hindu widows, and set at naught the prohibition of crossing the sea by his voyage to England. By these successive shocks he galvanized the dormant Hindu society and set in motion that liberalism in thought and action which has enabled it to shake off the fetters of ages'।[৫০] আর একজায়গায় বলেন: 'The first attempt to evolve a prose style was made at the beginning of the nineteenth century A.D. by the teachers of the Fort William College and Raja Rammohan Roy'।[৫১] আরও এক জায়গায়: 'The most lucid exposition of the liberal ideas which lay at the root of the demand for English education is to be found in a letter which Raja Rammohan Roy wrote in December, 1823, and forwarded to Lord Amherst, the Governor-General'।[৫২] রমেশচন্দ্র আরও লেখেন: 'It is not a mere accident that Raja Rammohan Roy who introduced rationalistic principles in social and religious ideas, was also the pioneer of political reforms in modern India'।[৫৩] রমেশচন্দ্রের মতে 'Those who blamed him (বাল গঙ্গাধর তিলক) hardly realized that he merely continued the traditions of Rammohan Roy, thy pioneer of social reform'।[৫৪] আরও, 'In this matter, (সহমরণ-প্রথা-বিরোধী আন্দোলন) as in so many others, Raja Rammohan Roy was in the forefront of the cry for reforms'।[৫৫] অন্য একটি গ্রন্থে রমেশচন্দ্র লেখেন: 'Raja Rammohan Roy was the greatest personality in Bengal at the beginning of the 19th century—and one whom we may regard as the representative of the most advanced political thinking of the time'।[৫৬] ওই গ্রন্থেই রমেশচন্দ্র আরও বলেন: 'The influence of these two factors ("English education and

the western ideas" এবং "a long succession of striking personalities") may be illustrated by taking the best type of each from the early period,—the Hindu College, the premier institution for English education, and Raja Rammohon Roy'।[৫৭] ওই দুটি 'factors' উনবিংশ শতাব্দীতে বঙ্গদেশে পরিবর্তনের যে 'miracle' সৃষ্টি করে সেটা প্রমাণ করার জন্য রমেশচন্দ্র উপরোক্ত গ্রন্থে মুদ্রিত বক্তৃতাগুলি করেন, এবং বলেন যে 'Rammohan inaugurated an era of social reform'।[৫৮] সব শেষে : 'The great credit of Raja Rammohon Roy lies in the fact that he embodied in his own person, to a pre-eminent degree, all those qualities of head and heart, which are usually associated with western ideas imparted by English education in Bengal. A rational approach to religious and social ideas unfettered by superstions, prejudices and conventions, love of liberty, wide and universal outlook, appreciation of the value and cultural potentialites of English education, without ignoring the importance of Bengali prose as a means of propagation of knowledge and ideas, a genuine anxiety to relieve the miseries of his fellow-beings, particularly the women and common men, a desire to uplift the moral, material and intellectual condition of his countrymen, raise their political status, and safeguard their civil liberty and economic interest by judicious reforms in administration,—these and many others, which were the most distinctive traits of our progress in the 19th century, all found a champion in him, and many of them flowed from him like a tiny brook, which gathered force and affluents in its onward course and, swelling into a mighty river, fertilised the whole country. His gigantic figure, like a colossus, strides across the pages of 19th century history'।[৫৯]

এখন পাঠকরাই বিচার করবেন যে রমেশচন্দ্রের উপরোক্ত মন্তব্যগুলি 'কল্পনার উচ্ছ্বাস' না 'ঐতিহাসিক সত্য'। রমেশচন্দ্র অস্বীকার না করলে তাঁর ওই কথাগুলি রবীন্দ্রনাথের রামমোহন-স্তুতির প্রতিধ্বনি বলে মনে করা একটুও ভুল হবে না। ভাষা শৈলী সম্বন্ধে যাঁরা বিশেষজ্ঞ, তাঁরা হয়ত বলতে পারেন যে রমেশচন্দ্রের ইংরাজীর পাশে রবীন্দ্রনাথের বাংলা একেবারে ম্লান হয়ে গেছে।

তবে আরও একটা কথা : উক্তিটিকে রামমোহন-প্রশস্তি বা নির্ভেজাল সত্যকথন, যাই-ই বলা যাক না কেন, সেটিকে ব্যক্ত করার মৌল প্রচোদনা হচ্ছে আসলে —পাঠকরা হয়ত অনেকেই জানেন—বক্তার উৎকট বাঙ্গালীয়ানা—রামমোহন নিমিত্ত মাত্র। প্রশ্ন হল, কেন তিনি ১৯৭২, ১৯৭৫ এবং ১৯৭৬ সালে বলেন নি যে, ১৯৬০, ১৯৬২ এবং ১৯৬৫ সালে রামমোহন সম্বন্ধে তিনি যা বলেন তা সব সত্য নয়? ১৯৭৮ ** সালেও তিনি তা বলতে পারতেন, কিন্তু বলেন নি। কি নতুন 'ঐতিহাসিক সত্য' এবং 'প্রকৃত তথ্য' তিনি আবিষ্কার করেন যার ভিত্তিতে তিনি সংস্কারক শিরোমণি রামমোহনকে সংস্কার বিরোধী রামমোহনে পরিণত করেন দশবছরের মধ্যে? তবে একটা কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে 'অন্ধ সংস্কারের উপর যুক্তির প্রাধান্য' যদি রামমোহন স্থাপন না করতেন, তাহলে তাঁর 'পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া' রমেশচন্দ্র হয়ত তাঁর প্রবন্ধটি রচনা করতে পারতেন না, এবং সে প্রবন্ধ পড়ার সৌভাগ্যও বাঙ্গালী পাঠকদের হত না।

হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে রামমোহনের যে কোন সম্পর্ক ছিল না, তা প্রমাণ করার জন্য রমেশচন্দ্র তাঁর প্রবন্ধে এক বিচিত্র যুক্তির অবতারণা করেন, এবং সে যুক্তির অভিনবত্ব এবং মৌলিকত্ব উপলব্ধি করে তিনি মন্তব্য করেন যে ওই যুক্তির কথাটা রামমোহন-ভক্তেরা 'ভাবিয়াছেন কি না বলিতে পারি না, কিন্তু ইহা কোনরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন বলিয়া আমার জানা নাই' (৩৭)। রমেশচন্দ্র লেখেন : 'তীব্র হিন্দু বিদ্বেষের জন্য······গোঁড়া হিন্দুগণ তাঁহাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (হিন্দু কলেজ) হইতে রামমোহনকে দূরে রাখিতে দৃঢ় সংকল্প করিয়াছিলেন' (৩৭)। এই সঙ্গে রমেশচন্দ্র এমনও অনুমান করেন যে একটি বিশেষ কারণে রামমোহন নিজেই 'এই প্রতিষ্ঠানের সহিত সর্বপ্রকার সংস্রব পরিহার' করতে চান। এখন কথা হল যে, সর্বপ্রকারে হিন্দু কলেজের সঙ্গে সংস্রব পরিহার করার সংকল্পই যদি রামমোহন গ্রহণ করে থাকেন, তাহলে তাঁকে সেখানে আহ্বান করলেও তিনি নিশ্চয় সাড়া দিতেন না। রামমোহন যেখানে যেতেই চান নি, সেখান থেকে তাঁকে দূরে সরিয়ে রাখার দৃঢ় সংকল্প অনেকটা 'ছায়ার সঙ্গে লড়াই' করার মত ব্যাপার নয় কি?

আর কেনই বা রামমোহন হিন্দু কলেজের সঙ্গে সংস্রব পরিহার করতে চান? রমেশচন্দ্র বলেন যে হিন্দু কলেজ গড়া হয়েছিল একটি সাম্প্রদায়িক

প্রতিষ্ঠানরূপে, সুতরাং 'সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তি…হইতে…মুক্ত' (৩৭) রামমোহন সে প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে 'সর্বপ্রকার সংশ্রব পরিহার' করাই সঙ্গত মনে করেন। রামমোহনের এই বিবেচনা, রমেশচন্দ্র মনে করেন, তাঁর 'মহত্ত্ব সূচিত করে' (৩৭), এবং 'তাঁহার অনন্যসাধারণ উদারতার পরিচায়ক' (৩৮)। এরপর রামমোহনের মস্তিষ্কহীন অন্ধভক্তগণ নিশ্চয় আর 'তাঁহাকে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার প্রবর্তকরূপে প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য ব্যগ্র' (৩৭) হবেন না। আর যদি হন তাহলে তাঁরা এই মাত্রই প্রমাণ করবেন যে, রামমোহন ছিলেন এক ক্ষুদ্রচেতা ও সাম্প্রদায়িকতাবোধে আচ্ছন্ন ব্যক্তি। রামমোহনের অন্ধভক্তগণ একেবারে পাথুরে অন্ধ, তাই রমেশচন্দ্র তাঁদের কানাচোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন যে তাঁরা নিজেদের খোঁড়া ফাঁদেই নিজেরা পতিত হয়েছেন।

তাঁর নিজের যুক্তির অসঙ্গতিটা রমেশচন্দ্রের চোখে পড়েনি। রামমোহনের বিরুদ্ধে গোঁড়া হিন্দুদের অভিযোগ যে গুরুতর তাতে সন্দেহ নেই: তিনি প্রকাশ্যে হিন্দুদের নিন্দা করেন ও হিন্দুধর্মের বিরোধিতা (!) করেন; 'তিনি হিন্দুদের (!) সঙ্গ এড়াইয়া চলেন এবং তাঁহাদের প্রতি ঘৃণার ভাব পোষণ করেন' (৩৮), আর সর্বোপরি, তিনি হিন্দুধর্মের ও সমাজের সংস্কার চান। এগুলোও কি রামমোহনের 'মহত্ত্ব সূচিত করে' না? কিন্তু এই সব নানা কারণে রমেশচন্দ্র বলেন যে 'হিন্দুদের প্রাণে খুবই আঘাত লাগে' (৩৮), এবং তাঁদের 'মনোক্ষোভের যথেষ্ট কারণ ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই' (৩৬)। যে গোঁড়া সংকীর্ণমনা হিন্দুরা দেশের উন্নতির এক বিশেষ উদ্যোগ থেকে রামমোহনের মত মহৎ ব্যক্তিকে দূরে সরিয়ে রাখার চেষ্টা করে অন্যায় কাজ করেন এবং নিজেদের হীনতার পরিচয় দেন, তাঁদের 'মনোক্ষোভের' জন্য রমেশচন্দ্রের মাথাব্যাথা কেন? মনে হয়, তার জন্য রমেশচন্দ্রের প্রাণেও খুব আঘাত লাগে; যদিও, তিনি মনে করেন যে রামমোহনের মত মহান ও উদারচেতা ব্যক্তির পক্ষে গোঁড়া হিন্দুদের কুসংস্কার ও সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতার সঙ্গে কোনরকম আপোষ করা সম্ভব ছিল না। নিশ্চয় রমেশচন্দ্র স্বীকার করবেন যে সেটা রামমোহনের বলিষ্ঠ অনন্যপরতা, আত্মমর্যাদাজ্ঞান, নৈতিক সাহস এবং জাতীয়তাবোধের পরিচায়ক।

প্রকৃতপক্ষে, হিন্দু কলেজের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত না করার জন্য রামমোহনকে রমেশচন্দ্র যে প্রশংসাপত্র দেন, তা যে নিছক তর্কের খাতিরে, বাম হস্তে প্রদত্ত প্রশংসাপত্র তা বোঝা কষ্টকর নয়। স্পষ্টই বোঝা যায় রমেশচন্দ্র কোন পক্ষাবলম্বী।

হিন্দু কলেজ থেকে রামমোহনকে দূরে সরিয়ে রাখার জন্য গোঁড়া হিন্দুদের প্রচেষ্টাকে রমেশচন্দ্র সমর্থন না করলেও তাঁর মতে 'তাঁহাদের মনোবৃত্তি অস্বাভাবিক বা নিন্দনীয় বলা চলে না' (৩৭)। রামমোহন কি ম্লেচ্ছ ছিলেন? রমেশচন্দ্রও মনে করেন তিনি ছিলেন ঘোর রক্ষণশীল হিন্দু। সমর্থন বা নিন্দার প্রশ্ন বাদ দিয়ে, সহজ বাস্তবদৃষ্টিতে ব্যাপারটাকে বিচার করলে যে কোন নিরাসক্ত ঐতিহাসিকের চোখে গোঁড়া হিন্দুদের ব্যবহারের অসঙ্গতিটা ধরা পড়ে। কারোকে নিন্দা বা প্রশংসা না করে শুধুমাত্র সেই অসঙ্গতিটির প্রতি রমেশচন্দ্র তাঁর পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারতেন। হিন্দুদের এবং হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে ম্লেচ্ছ সাহেবরা যে কত হীন ধারণা পোষণ করতেন তার ইঙ্গিত রমেশচন্দ্রের প্রবন্ধে স্পষ্ট। যে গভর্ণর-জেনারেলের শাসনকালে হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা হয়, হিন্দুদের সম্বন্ধে তাঁর ব্যক্তিগত ধারণা কি ছিল, সে কথাও রমেশচন্দ্র উল্লেখ করেন। Hyde East সাহেব যে হিন্দুদের একজন বিশেষ গুণগ্রাহী ব্যক্তি ছিলেন, তা মনে করার কোনো কারণ নেই। তিনি ত স্পষ্টই দেখিয়ে দেন গোঁড়া হিন্দুদের আচরণের অসঙ্গতিটা। রামমোহনের ব্যবহারে গোঁড়া হিন্দুরা যে ব্যথিত ও ক্ষুব্ধ হন, সে কথা রমেশচন্দ্র উল্লেখ করেন, কিন্তু সে ব্যাথা বা ক্ষোভের ঐতিহাসিক যুক্তি কি ছিল তা আলোচনা করেন নি। তবে তিনি কোন পক্ষাবলম্বী তাঁর ইঙ্গিত মেলে যখন, প্রাসঙ্গিক না হলেও, তিনি রামমোহনের হিন্দুবিদ্বেষের নিম্নলিখিত নমুনাটি রামমোহনের একটি বিবৃতি থেকে খামচে তুলে নিয়ে তাঁর পাঠকদের পরিবেশন করেন: 'the worship of idols very often under the most shameful forms, accompanied with the foulest language and most indecent hymns and gestures' (৩৬-৩৭)। বিবৃতিটি রামমোহন রচনা করেন একজন 'learned Brahman' বিবাদীর (বন্ধুর নয়) পরামর্শের জবাবে। রামমোহন প্রকৃত কি বলতে চান, এবং রমেশচন্দ্রের উদ্ধৃতি কৌশল, দুটি ব্যাপারই হয়ত এ প্রবন্ধের পাঠকদের কাছে স্পষ্ট হবে যদি সে বিবৃতিটি একটু বিস্তারিতভাবে এখানে উপস্থিত করা হয়। হিন্দুদের প্রচলিত প্রতিমা পূজার যুক্তিখণ্ডন প্রসঙ্গে রামমোহন লেখেন:

'**1st. A feeling for the misery and distress of his fellow creatures is, to everyone not overpowered by selfish motives, I presume, rather natural than optional. 2ndly. I, as one of their country-men, and ranked in the most religious sect, of course partici-pate in the disgrace and ridicule to which they have subjected**

themselves, in defiance of their scriptural authority, by the worship of idols, very often under the most shameful forms, accompanied with the foulest language, and most indecent hymns and gestures. 3dly. A sense of the duty which one man owes to another, compels me to exert my utmost endeavours to rescue them from imposition and servitude, and promote their comfort and happiness'।[৬১] আজ থেকে দেড়শ বছরেরও আগে দেশীয় গোঁড়া হিন্দুদের সঙ্গে রামমোহনের যে বিবাদ সৃষ্টি হয়, তাতে এই বিংশ শতাব্দীর সত্তরের দশকে ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্রের যে একটি ভূমিকা আছে তা আরও স্পষ্ট হয়, অন্যত্র ব্যক্ত তাঁর কিছু মন্তব্য থেকে '......there is little justification for the claim put forward by eminent persons like Rabindranath Tagore, Ramananda Chatterjee and many others of less renown that Rammohan inaugurated the Modern Age in India. Indeed there was one element in Rammohan's character which made him unfit for playing such a role This was his profound contempt for the idolatrous Hindus who formed more than eighty per cent of India's population, and it was expressed in language which a Christian missionary oi those days could hardly excel'।[৬২] আরও, 'The idolatrous Hindus, who survived the fanatic iconoclastic fury of the Muslim rulers for five hundred years and scurrilous abuses of their gods and goddesses by the Muslim Mullahs and the Christian missionaries were not likely to be affected by similar abuses of Rammohan, even though he called himself a Hindu and quoted Hindu scriptures in his support. In any case the fact remains that in spite of the best efforts of Rammohan Roy to the contrary, the New Age or Modern Age in India is based on the acceptance and toleration of idolatry, and not on its vile condemnation, not to speak of abolition, of which Rammohan was the High Priest'।[৬৩] এরপর রামমোহনের প্রসঙ্গ বাদ দিলেও, বোঝা কঠিন নয় যে বর্তমানে রমেশচন্দ্রের, এবং যেসব হিন্দুদের তিনি প্রবক্তা, তাঁদের এত ক্ষোভের কারণ কি। এছাড়াও, রমেশ চন্দ্রের এই উক্তিগুলি পাঠ করে তাঁর পাঠকদের মাথা কিছু গুলিয়ে যাবার আশঙ্কা আছে। সমাজে যাহা প্রচলিত রামমোহন যদি 'তাহার পরিবর্তনের

বিরোধী' হন, যদি তাঁর 'মতে প্রচলিত প্রথা মানিয়া চলাই উচিত তাহার পরিবর্তন শুধু অনাবশ্যক নহে, নিন্দনীয়', তবে তিনি ঘোর হিন্দু হয়েও হিন্দুদের তেত্রিশকোটি দেবদেবীর মূর্তি পূজার প্রচলিত প্রথাকে পরিবর্তন করতে উদ্যোগী হন কেন? কেন তিনি হিন্দু পৌত্তলিকতার প্রতি অত 'abuses' এবং 'vile condemnation' নিক্ষেপ করেন?

রামমোহনের ব্যবহারে ক্ষুব্ধ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা যে তখন খুব বিচক্ষণ ছিলেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। যে হিন্দু ব্রাহ্মণ রামমোহনের কাছ থেকে হিন্দু কলেজের জন্ম চাঁদা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন, কিন্তু খ্রীষ্টান Hyde East সাহেবকে 'ঈষৎ হাস্য সহকারে' বলেন—'আপনার চাঁদা নিশ্চয় লইব', এবং সাহেবের প্রতি তাঁর অনুরাগ, শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার অভিজ্ঞান স্বরূপ তাঁর হাতে কিছু সুগন্ধি ফুল তুলে দেন, তাঁর বিচক্ষণতা খুবই প্রশংসনীয়। তখনকার দিনে দেশে যে সৎ, শুদ্ধাচারী, নিষ্ঠাবান ও বিদগ্ধ ব্রাহ্মণ ছিলেন না তা নয়। তবে রমেশচন্দ্র খুব ভালোভাবেই জানেন যে সাধারণভাবে ব্রাহ্মণরা তখন শূদ্রপাদোপজীবি শ্রেণীতে পরিণত হন—বেতসবৃত্তি এবং ধনীদের মোসাহেবি করেই তাঁরা তাঁদের মর্যাদা রক্ষা করতেন। রমেশচন্দ্র সম্প্রতি উল্লেখ করেন করেন যে নদীয়ার রাজা শ্রীশচন্দ্র তাঁদের আজীবন ভাত কাপড়ের পাকা বন্দোবস্ত করতে যদি রাজি হন, তাহলে কিছু বিচক্ষণ স্মার্ত পণ্ডিতদের তিনি যে দলিলেই সই করতে বলুন না কেন তাঁরা তা করতে রাজি ছিলেন।[৩৪] সাধারণভাবে ব্রাহ্মণসমাজ তখন এই দশাতেই পতিত হন। এ বিষয়ে আরও দুচার কথা পরে বলা হবে। যাই হক, এই সব ব্রাহ্মণেরা যে বিংশ শতাব্দীতেও লুপ্ত হননি, তার একটা দৃষ্টান্ত, কিছুটা অপ্রাসঙ্গিক হলেও এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। শতাব্দীর চতুর্থ দশকে, একজন অব্রাহ্মণ বিশিষ্ট সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ও দার্শনিক যখন কলকাতার সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন, তখন কিছু প্রভাবশালী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও তাঁদের সহযোগীরা এই নিয়োগের নিন্দা করেন। ঘটনাটির বেশ কয়েক বছর পরে অধ্যক্ষ মহাশয় কথা প্রসঙ্গে বলেন যে, কোন ম্লেচ্ছ, গোখাদক সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হলে পণ্ডিত মহাশয়রা আহ্লাদে আঠখানা হন, কিন্তু তাঁর নিয়োগে তাঁদের হৃদয়ব্যাথা ও মনোক্ষোভের আর অন্ত থাকে না।

প্রতিমা পূজা সম্পর্কে রামমোহন যে ভাষা—'shameful', 'foulest', 'indecent' প্রভৃতি ব্যবহার করেন তাতে রমেশচন্দ্র ক্ষুব্ধ। তাঁর মতে

রামমোহন আধুনিক ভারতের উদ্বোধক হিসাবে বিবেচিত হবার অযোগ্য, কেননা, যে হিন্দুধর্ম আশী ভাগেরও অধিক মানুষের ধর্ম তার প্রতি রামমোহন 'profound contempt' প্রকাশ করেন। রামমোহন আধুনিক ভারতের উদ্বোধক কি না, এসব তুচ্ছ ব্যাপার—রামমোহনের ভক্ত এবং অভক্তদের বিবাদের বিষয়। আমার প্রশ্ন হ'ল প্রথমত, তাঁর সময়ে ধর্ম ও ধর্মচর্চার নামে হিন্দুসমাজে ব্যাপকভাবে যা সংঘটিত হত, সেম্বন্ধে রামমোহনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল। রমেশচন্দ্রের তা অজানা নেই। রামমোহনের বর্ণনা কি অসত্য? যা প্রকৃত 'shameful', 'foul' এবং 'indecent' তাকে তা বলা অপরাধ? রমেশচন্দ্রও তথ্য ও প্রমাণ সহযোগে রামমোহনের বক্তব্য খণ্ডন করতে পারতেন। দ্বিতীয়ত, রমেশচন্দ্র কি প্রকৃতই মনে করেন যে দেশের আশীভাগ মানুষের ধর্ম বলেই হিন্দুধর্মকে সর্বতোভাবে বিশুদ্ধ, পবিত্র, মহান ধর্ম বলে মেনে নেওয়া যুক্তিযুক্ত? ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, ভারতের ঐতিহাসিক হিন্দুধর্মের ক্রমবিকাশের বিভিন্ন পর্যায়ের সঙ্গে ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে—ইতিহাস কি বলে? হিন্দুধর্মের বহু সংস্কারক রামমোহনের পূর্বেও ছিলেন, এবং পরেও জন্মান—তাঁরা কি বলেন? তৃতীয়ত, যে হিন্দুধর্মকে প্রাচীন, প্রকৃত, বিশুদ্ধ হিন্দুধর্ম বিবেচনা করে রামমোহন তাঁর দেশে পুনরুজ্জীবিত করতে চান, তা কি, রমেশচন্দ্র মনে করেন, হিন্দুধর্ম নয়? চতুর্থত, 'shameful' 'foul' 'indecent' প্রভৃতি অতি-প্রচলিত ইংরাজী শব্দগুলি কি কুৎসিত, অশ্লীল, অমার্জিত? যদি তাই হয়, তাহলে রমেশচন্দ্রই বা কোন আক্কেলে 'foul', 'vile' প্রভৃতি শব্দগুলি ব্যবহার করেন? আর সবশেষে, রামমোহনের সময়ে, এবং তার পূর্বে বঙ্গদেশে হিন্দুধর্মের অবস্থা কত শোচনীয় ছিল, তা রমেশচন্দ্র নিজেই তাঁর একাধিক গ্রন্থে[৩৫] সবিস্তারে বর্ণনা করেন। একটিতে তিনি মন্তব্য করেন: 'The highly gross immoralities, obscene practices, and cruelties perpetrated in the name of religion even less than hundred and fifty years ago throw a lurid light on our culture and civilisation of the 19th century'[৩৬] গ্রন্থটির আর এক পৃষ্ঠায় বলেন 'The immoralities and cruelties perpetrated in the name of religion were bad enough, but still more deplorable was the apathy with which these were looked upon even by the educated people and the open attempt to resist their abolition as we find in the case of

Sati, Charak swinging, polygamy etc. There seems to be a callousness to immorality and sufferings generated by blind faith impervious to reason'।[৬৭] ওই একই গ্রন্থে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের চরিত্র সম্বন্ধে লেখেন '......the Brahmans as a class were reduced to penury and forced to become sycophants of rich ignorant patrons of lower classes and, generally speaking, were like their patrons, bereft of education and character, and addicted to wine, women and other vices, though maintaining an outward purity to deceive their employers'।[৬৮] সাম্প্রতিক কালে প্রকাশিত রমেশচন্দ্রের আরও একটি গ্রন্থ পাঠ করলে হিন্দুধর্ম ও সমাজের এক নিদারুণ কুৎসিত ও বীভৎস ঐতিহাসিক চিত্রের পরিচয় মেলে। সেখানে একজন বিশিষ্ট লেখকের কৃষ্ণচরিত্র বর্ণনা উদ্ধৃত করে রমেশচন্দ্র প্রমাণ করেন যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে 'voluptuous, deceitful, hypocritical, arrogant and revengeful'[৬৯] ইত্যাদি হিসাবে কল্পনা ও পূজা করে আনন্দ এবং আত্মপ্রসাদ লাভ করার এক দীর্ঘ ঐতিহ্য বঙ্গদেশীয় হিন্দুদের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছিল। ওই গ্রন্থেরই আর এক জায়গায় হিন্দুধর্মের বিভিন্ন আচার আচরণ সম্বন্ধে রমেশচন্দ্র মন্তব্য করেন: Decency forbids any detailed discussion of all these'।[৭০]

দুএকটা ব্যাপার এখানে লক্ষ্যণীয়। প্রথমত উনবিংশ শতাব্দীর হিন্দুসমাজের 'highly gross immoralities, obscene practices and cruelties' প্রভৃতি তথ্যগুলি তিনি আহরণ করেন প্রধানত একজন সমসাময়িক খৃষ্টান পাদ্রীর লেখা থেকে। সে লেখা সম্বন্ধে তিনি এক জায়গায় বলেন '......sober historians are bound to accept Ward's account as generally accurate'।[৭১] সম্প্রতি আবার বলেন: 'The writer was a foreigner and of another religion and there is no doubt that his natural ignorance and mistakes and the ingrained hatred of the Missionaries for the Hindus, considerably influenced his impressions and expressions. Nevertheless, the historical value of the book as containing an accurate and comprehensive picture of the contemporary Hindu society in the eyes of a foreigner is undeniable. There is ample evidence in the book that the accounts recorded by the writer did not transgress truth'।[৭২] পাদ্রী সাহেবের লেখা যে নিছক 'scurrilous abuses' নয় সেটা রমেশচন্দ্র উপলব্ধি করেন। পাদ্রী সাহেব যে সত্যবাদী সে বিষয়ে আমরা রমেশচন্দ্রের সঙ্গে একমত,

যদিও মনে করি যে তাঁর সত্যবাদিতার একটা গভীরতর উদ্দেশ্য ছিল। দ্বিতীয়ত, হিন্দুদের যে অনাচার, অভিচার, ব্যাভিচার প্রভৃতির কথা রমেশচন্দ্র বর্ণনা করেন, তার অংশীদার ছিলেন সমাজের কত ভাগ হিন্দু? তৃতীয়ত, একই গ্রন্থের একটি অধ্যায়ে তিনি নিজে প্রচলিত হিন্দু ধর্মাচরণ কত দূষিত তা বর্ণনা করেন, এবং আর একটি অধ্যায়ে তাকে দূষিত বলার জন্ত রামমোহনকে আক্রমণ করেন। প্রচলিত হিন্দু আচার আচরণগুলির অকথ্য অশ্লীলতা ও বর্বরতাকে নিন্দা করার অধিকার হিন্দু রমেশচন্দ্রের আছে। কিন্তু হিন্দু রামমোহন সেগুলিকে 'shameful' 'foul', 'indecent' বললে আর রক্ষে নেই। রামমোহন প্রকৃত কি চান সেটা আবার তাঁরই ভাষায় ব্যক্ত করি: 'May god speedily purify the minds of my countrymen from the corruptness which such tales are too apt to produce, and lead their hearts to that pure morality which is inseparable from the true worship of Him'![৭৩] রমেশচন্দ্রের বক্তব্যের বৈচিত্রটি লক্ষ্যণীয়: রামমোহনকে সংস্কার-বিরোধী প্রমাণ করার জন্ত তাঁকে বর্ণনা করেন একজন গোঁড়া হিন্দু হিসাবে, আবার তাঁকে আধুনিক ভারতের উদ্বোধক অপ্রমাণ করার জন্ত একজন হিন্দু-বিদ্বেষী, অহিন্দু বলে তাঁর নিন্দা করেন। উনবিংশ শতাব্দীর প্রত্যুষে দেশের হিন্দু ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের সঙ্গে রামমোহন যে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন, বিংশ শতাব্দীর রাত্রি কালে এই সব ব্রাহ্মণ পণ্ডিত প্রভৃতিদের প্রতিনিধি হিসাবে রমেশচন্দ্র সে লড়াই চালিয়ে যাবার পবিত্র দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেন।

রমেশচন্দ্রের দৃষ্টিতে রামমোহন এবং খৃষ্টান পাদ্রীরা সমগোত্রীয় মানুষ। তিনি লেখেন যে রামমোহনের হিন্দুবিদ্বেষ 'was expressed in a language which a Christian missionary of those days could hardly excel'। রমেশচন্দ্রের এই কথাগুলো শুনলে মনে হতে পারে যে তিনি রামমোহন, বা খৃষ্টান পাদ্রী, যাজক বা অন্তান্ত লেখকদের হিন্দু ধর্ম সম্বন্ধীয় রচনাগুলোর সঙ্গে সবিশেষ পরিচিত নন। যাই হক, তাঁর উদ্দেশ্য প্রমাণ করা যে, যদিও রামমোহন নিজেকে হিন্দু বলে জাহির করতেন, এবং দরকার হলে হিন্দু শাস্ত্রের বুলিও আওড়াতেন, তিনি প্রকৃত হিন্দু (!) ছিলেন না। কারণ, হিন্দুদের তেত্রিশ কোটি দেবদেবীকে তিনি নিজে বর্জন করেন এবং দেশবাসীকে বর্জন করতে প্ররোচিত করেন। শুধু তাই নয়, ওই সব দেবদেবীর নিন্দায় তিনি

খৃষ্টান পাদ্রীদের ছাড়িয়ে যান। রমেশচন্দ্র কি মনে করেন যে রামমোহন এবং পাদ্রীসম্প্রদায় একই প্রেরণা বশে এবং একই উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হয়ে হিন্দু ধর্মের নিন্দায় লিপ্ত হন? রমেশচন্দ্র অবশ্য তাঁর প্রয়োজন মত পাদ্রীদের রচনাও প্রামাণ্য হিসাবে গ্রহণ করতে ইতস্তত করেন না। যাই হক, পাদ্রীদের কথা ছেড়ে দেওয়া যাক – তাঁরা ছিলেন শাসক জাতি, ভারতে ইংরাজ শাসন স্থায়ীভাবে কায়েম করার চেষ্টা ছিল তাঁদের ব্রত। সুতরাং খৃষ্টধর্মই একমাত্র সত্য ধর্ম, এবং খৃষ্টান ঈশ্বরই একমাত্র সত্য ঈশ্বর, এবং হিন্দুরা ঘোর বর্বর ও হিন্দুধর্ম ব্যাপারটাই একটা বিরাট ধাপ্পা, এ সব প্রচার করা ছাড়া তাঁদের আর পথ ছিল না। কিন্তু প্রশ্ন হল, অহিন্দু রামমোহন হিন্দুধর্মের যথার্থতা প্রমাণ করার জন্য ওই পাদ্রীগোষ্ঠীর এবং খৃষ্টধর্মের অন্যান্য প্রবক্তাদের সঙ্গে প্রবল বিতর্কে অবতীর্ণ হল কেন? ক'জন ভারতবাসী রামমোহনের কালে খৃষ্টান পাদ্রী ও অন্যান্যদের হিন্দুধর্ম বিরোধী অপপ্রচারের বিরুদ্ধে তাঁর মত বলিষ্ঠ প্রতিবাদ জানান? কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। এক জায়গায় রামমোহন বলেন: 'It is......not uncommon if the English missionaries, who are of the conquerors of this country, revile and mock at the religion of its natives'।[৭৪] ওই একই জায়গায় কয়েক পংক্তি পরে: 'to introduce a religion by means of abuse and insult, or by affording the hope of worldly gain, is inconsistent with reason and justice. If by the force of argument they can prove the truth of their own religion and the falsity of that of Hindoos, many would of course embrace their doctrines, and in case they fail to prove this, they should not undergo such useless trouble, nor tease Hindoos any longer by their attempts at conversion. In consideration of the small huts in which Brahmans of learning generally reside, and the simple food, such as vegetables, &c., which they are accustomed to eat, and the poverty which obliges them to live upon charity, the missionary gentlemen may not, I hope, abstain from controversy from contempt of them, for truth and true religion do not always belong to wealth and power, high names, or lofty palaces।' হিন্দু, হিন্দুধর্ম ও খ্রীষ্টান পাদ্রীদের সম্বন্ধে রামমোহনের মনোভাবের আর একটি দৃষ্টান্ত: 'It is well-known to the whole world, that no

people on earth are more tolerant than the Hindoos, who believe all men to be equally within the reach of Divine beneficence, which embraces the good of every religious sect and denomination; therefore it cannot be imagined that my object in publishing this Magazine was to oppose Christianity; but I was influenced by the conviction that persons who travel to a distant country for the purpose of overturning the opinion of its inhabitants and introducing their own, ought to be prepared to demonstrate that the latter are more reasonable than the former'।[৭৫] এই একই কথা তিনি অনৈক বিদেশী ভদ্রলোককে লেখেন: 'If a body of men attempt to upset a system of doctrines generally established in a country, and to introduce another system, they are, in my humble opinion in duty bound to prove the truth, or, at least, the superiority of their own'।[৭৬] রামমোহন খ্রীষ্টধর্মের খুবই অনুরাগী ছিলেন, কিন্তু খৃষ্টান পাদ্রীদের জাতীয় ও ধর্মীয় ঔদ্ধত্যের সূত্রটি তাঁর অজানা ছিল না। তিনি একবার এক প্রসঙ্গে লেখেন '... ...I feel already weary of the doctrine of "Man-God" or "God-Man" frequently inculcated by the Brahmans, in pursuance of their corrupt traditions: the same doctrine of 'Man-God', though preached by another body of priests better dressed, better provided for and eminently elevated by virtue of conquest cannot effectually tend to excite my anxiety or curiosity to listen to it'।[৭৭]

প্রকৃতপক্ষে, ভারতে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের পক্ষে রামমোহন যে একটি মস্ত বড় বাধা তা পাদ্রী এবং যাজকেরা ভালভাবেই উপলব্ধি করেন। বিখ্যাত Bishop Heber রামমোহনের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। ১৮২৩ সালে লিখিত একটি চিঠিতে তিনি বলেন: 'our chief hindrances are some deistical brahmins who have left their old religion, and desire to found a sect of their own'।[৭৮] আর একজন বিশিষ্ট প্রচারক Daniel Corrie, ১৮২২ সালে লিখিত একটি চিঠিতে যা বলেন তাও উল্লেখযোগ্য: 'Our missionary engagements are becoming more and more important; and opportunities for extending our plans more and more frequent and easy: But with all these (prospects) a

spirit unfriendly to the gospel is gone forth amongst the natives, and they are commencing Deistical politicians. Four native newspapers have started in Calcutta ; two in Bengalee, one in Hindustanee, and one in Persian, They cannot all stand long, but they mark the spirit of the times. They all are under an influence unfriendly to our Church establishment' :[৭৯] ইত্যাদি। এই 'deistical brahmins' বা 'Deistical politicians' কারা তা বোঝা কঠিন নয়।

অবশ্যই রামমোহন একশ্রেণীর হিন্দুদের, এবং প্রচলিত হিন্দুধর্মের নিন্দা করেন, প্রকাশ্যে এবং কঠোরভাবে, কেননা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল সৎ, প্রত্যয় ছিল দৃঢ়, নৈতিক সাহস ছিল প্রবল এবং দেশপ্রেম ছিল গভীর—তাঁর দৃষ্টি ছিল ভবিষ্যতের দিকে। দেশবাসীর দুর্দশা দেখে তিনি উপলব্ধি করেন: 'the moral debasment of a race who, I cannot help thinking, are capable of better things ; whose susceptibility, patience, and mildness of character, render them worthy of a better destiny'।[৮০] তাই রামমোহন নিন্দা করেন তাঁদের যাঁরা ছিলেন এই প্রচলিত হিন্দুধর্মের ধ্বজাধারী। স্পষ্ট ভাষায় তিনি বলেন: 'The public will...be assured that nothing but the natural inclination of the ignorant towards the worship of objects resembling their own nature, and to the external forms of rites palpable to their grosser senses, joined to the self-interested motives of their pretended guides, has rendered the generality of the Hindoo community (in defiance of their sacred books) devoted to idol-worship,—the source of prejudice and superstition and of the total destruction of moral principles, as countenancing criminal intercourse, suicide, female murder, and human sacrifice'।[৮১] প্রচলিত হিন্দু-ধর্মের প্রভাবশালী প্রবক্তাদের, অজ্ঞ, মূঢ় জনসাধারণের 'interested spiritual guides'-দের—যাঁরা নিজেদের ঐহিক স্বার্থ বজায় রাখার জন্য সর্বপ্রকার ধর্মীয় ও সামাজিক অনাচার ও কুসংস্কারগুলোকে জিয়িয়ে রাখতে উৎসাহী ছিলেন, রামমোহন চিনতেন ঘনিষ্ঠভাবে। তিনি বলেন: 'Many learned Brahmans are perfectly aware of the absurdity of idolatry, and are well-informed of the nature of the

purer mode of divine worship. But as in the rites, ceremonies, and festivals of idolatry, they find the source of their comforts and fortune, they not only never fail to protect idol-worship from all attacks, but even advance and encourage it to the utmost of their power, by keeping the knowledge of their scriptures concealed from the rest of the people' ।[৮২]

দেশের প্রভাবশালী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এবং অন্যান্য ব্যক্তিরা ছাড়াও রামমোহনের অভিযোগ ছিল উদারচেতা, প্রাচ্যবিদ্যায় শিক্ষিত একশ্রেণীর ইয়োরোপীয়দের সম্বন্ধে। তাঁরা যখন হিন্দুদের পৌত্তলিকতার অপব্যাখ্যা করতেন নানাভাবে, শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে, তখন শিক্ষিত হিন্দুরা তা পাঠ করে বেশ বিভ্রান্ত হতেন, এবং তাঁদের মধ্যে পৌত্তলিকতার সংস্কারগুলোকে আরও জোর করে আঁকড়ে থাকার প্রবণতা দেখা দিত: 'Some Europeans, indued with high principles of liberality, but unacquainted with the ritual part of Hindu idolatry, are disposed to palliate it by an interpretation which, though plausible, is by no means well-founded......I have frequently had occasion to remark, that many Hindoos also who are conversant with the English language, finding this interpretation a more plausible apology for idolatry than any with which they are furnished by their own guides, do not fail to avail themselves of it, though in repugnance both to their faith and to their practice' ।[৮৩]

রামমোহনের ধর্মমত এতই নগণ্য ব্যাপার যে মাত্র আটটি শব্দে রমেশচন্দ্র তার বর্ণনা দেন তাঁর প্রবন্ধে। মনে হওয়া স্বাভাবিক যে তিনি রামমোহনের ধর্মের প্রকৃতিটিকে বুঝতে পারেন নি। রমেশচন্দ্রের জানা থাকার কথা যে হিন্দু ধর্মগুরু এবং সংস্কারকদের মধ্যে রামমোহনই একমাত্র ব্যক্তি নন যিনি তাঁর দেশবাসীকে প্রচলিত হিন্দুধর্মের অনাচারগুলিকে বর্জন করতে পরামর্শ দেন। রামমোহনের ধর্মবিশ্বাসের যেমন কোন মৌলিকতা ছিল না, তেমনি তা মোটেই দুরূহ বা জটিল ছিল না। তাঁর মতে ধর্ম এবং মনুষ্যত্ব আবশ্যকীয় সম্পর্কে যুক্ত। ধর্মবোধ ব্যতীত মানুষ মহৎ জীবন যাপনে অক্ষম। রামমোহনের ধর্মান্বেষণের, তাঁর ঈশ্বরৈষণার মূল লক্ষ্যটি ছিল ব্যবহারিক এবং প্রায়োগিক—যে সহজ ধর্মবোধ মানুষের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক জীবনকে উন্নত ও সমৃদ্ধ করে, তাই হল প্রকৃত ধর্ম, মানুষের জাগতিক কল্যাণের সহায়ক।

যিনি ধার্মিক তিনি শুধুমাত্র ঈশ্বরে বিশ্বাসী নন, তিনি সক্রিয়ভাবে পৃথিবীতে প্রাত্যহিক কর্মে মানুষের মঙ্গল সাধনে নিযুক্ত। রামমোহনের মতে ভারতের প্রাচীন উপনিষদীয় একেশ্বরবাদের আধ্যাত্মিক প্রভাব মানুষের চিত্তকে সর্বপ্রকার দুষ্প্রবৃত্তি ও নৈতিক কলুষতার ঘোর থেকে মুক্ত করে, তার মন প্রাণকে নির্মল ঐশ্বরিক রসে পরিপূর্ণ করে, তার সামাজিক জীবনকে সমৃদ্ধ করে এবং সর্বত্র মানুষকে মানুষের সঙ্গে অবাধ প্রীতির বন্ধনে যুক্ত করে। তিনি মনে করেন যীশুখৃষ্টও এই বাণী প্রচার করেন। ধর্ম সাধনার পরিপূর্ণতা লাভ করাকে যদি সাধারণ ভাবে বলি 'salvation'-প্রাপ্তি তাহলে রামমোহনের ধর্মান্বেষণ তাঁকে যে 'salvation'-এর সন্ধান দেয়, তার প্রকৃতি 'spiritual' এবং 'secular' এই দুটি উপাদানের যৌগিক প্রক্রিয়ায় সংগঠিত।

রামমোহনের ধর্মান্বেষণের 'utopian' চরিত্রটি প্রত্যেক নিরপেক্ষ সমীক্ষকের চোখে ধরা পড়ে। ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে রমেশচন্দ্র তার আলোচনা ও সমালোচনা করতে পারতেন। তাতে তাঁর পাঠকরা উপকৃত হতেন, এবং রামমোহন চর্চাও সমৃদ্ধ হত। কিন্তু, তা না করে তিনি দেখাতে চান যে খৃষ্টান পাদ্রী ও মুসলমান মৌলবীর মত রামমোহনও ছিলেন হিন্দুধর্মের একজন কুৎসাকারী মাত্র। খৃষ্টান প্রচারকেরা ছিলেন বিধর্মী, বিদেশী, সুতরাং তাঁদের মত সত্য বা মিথ্যা হক, তা শুনে বিচলিত হবার তেমন কারণ নেই। কিন্তু যে ভারতবাসী নিজেকে হিন্দু বলে দাবী করেন, সেই রামমোহনের তেত্রিশ কোটি দেবদেবীতে অবিশ্বাস, ও তাঁর মুখে হিন্দুদের প্রচলিত আচার আচরণ সম্বন্ধে 'abuses', অসহ্য। তাই নবভারতের উদ্বোধকের ভূমিকার জন্ত তিনি 'unfit'। রামমোহন উদ্বোধক ছিলেন, না অধবোধক ছিলেন, তা আমাদের কাছে গৌণ প্রশ্ন, তবে রমেশচন্দ্রের ইঙ্গিত বড়ই বিচিত্র: নবভারতের উদ্বোধকের ভূমিকার যোগ্য হবার জন্ত রামমোহনের উচিত ছিল প্রচলিত পৌত্তলিকতার অনাচারগুলি সম্বন্ধে নীরব থাকা, অথবা সেগুলির যথার্থতা-প্রমাণ করা। অর্থাৎ, যে ব্যক্তিই তাঁর সে যোগ্যতা প্রমাণ করতে চান, তাঁকে ওই দুটির একটি করতে হবে।

রামমোহনের হিন্দুবিদ্বেষ, হিন্দুপৌত্তলিকতার বিরোধিতা প্রভৃতি রমেশচন্দ্র রামমোহনের 'পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া' যুক্তি ও তথ্যের সাহায্যে খণ্ডন না করে, সেগুলির জবাব দেন আর এক বিচিত্র উপায়ে। ঝাঁ করে তিনি প্রখ্যাত পণ্ডিত রাজেন্দ্রলাল মিত্র মশায়ের 'তান্ত্রিক ধর্ম সম্বন্ধে' নিম্নলিখিত উক্তিটি উদ্ধৃত

করেন : 'theories are indulged in and practices enjoined which are at once the most revolting and horrible that human depravity could think of' (৩৭)। তারপর, তিনি নিজে মন্তব্য করেন যে রামমোহন 'সেই তান্ত্রিক ধর্মকে নিন্দা করা তো দূরের কথা বেদের সমপর্যায়ে গণ্য করিয়াছেন'(৩৭)। রমেশচন্দ্র রাজেন্দ্রলালকে হাতিয়ার করেন রামমোহনকে (পরোক্ষে, রবীন্দ্রনাথকেও) আঘাত করার জন্য—অর্থাৎ তিনি দেখাতে চান যে, যে রামমোহনকে রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ ভক্তেরা ঋষি, মহাপুরুষ ইত্যাদি প্রমাণ করার জন্য কল্পনা, উচ্ছ্বাস, অসত্য প্রভৃতির আশ্রয় নেন, সেই রামমোহন প্রকৃতপক্ষে ধর্মীয় নানাপ্রকার বীভৎস, অশ্লীল অনাচারের একজন সমর্থক। যে পদ্ধতিতে রমেশচন্দ্র তা করেন সেটা লক্ষ্যণীয়। রাজেন্দ্রলালের একটি গ্রন্থের অন্তর্গত একটি উক্তির কিয়দংশ থাবলে উদ্ধৃত করে তিনি ভারতীয় তান্ত্রিক ধর্ম ও সাধনার স্বরূপ সম্বন্ধে এক ঢালাও রায় দেন। রমেশচন্দ্র কি মনে করেন যে তান্ত্রিক ধর্ম বৃহৎ হিন্দুধর্মের একটি বিশিষ্ট অঙ্গ নয়? তান্ত্রিক আচার কি পৌত্তলিকতার বিরোধী? তান্ত্রিক ধর্মের জঘন্যতার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে কি পৌত্তলিকতার যথার্থতা ও মহত্ব প্রমাণ করা যায়? আর রাজেন্দ্রলালের উক্তির মধ্যেই কি তন্ত্রশাস্ত্রের একমাত্র পরিচয় মেলে? প্রাচীন হিন্দু তন্ত্র সাধনার নানা পদ্ধতির মধ্যে একটা পদ্ধতি প্রচলিত ছিল এবং হয়ত আজও আছে, যা জঘন্য, অশ্লীল, বীভৎস হিসাবে প্রাচীনকাল থেকেই নিন্দিত হয়ে আসছে। সে সাধনা কালক্রমে কিছু বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব সাধকদের মাধ্যমে বৌদ্ধ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মে প্রবেশ করে তাদেরও দূষিত করে তোলে। কিছু শাক্ত, বৌদ্ধ বা বৈষ্ণব সাধক বা সাধক সম্প্রদায় যদি তন্ত্র সাধনার একটা দুষ্ট পথ অবলম্বন করেন, তার জন্য সাধারণভাবে তান্ত্রিক ধর্মকে জঘন্য বলার কি যুক্তি আছে?

তাছাড়া, তান্ত্রিক সাধনা সম্বন্ধে রাজেন্দ্রলালের উক্তিটিকে তান্ত্রিক ধর্ম সম্বন্ধে রাজেন্দ্রলালের সাধারণ রায় হিসাবে ধরে নিলেন রমেশচন্দ্র কি বিচারে? রাজেন্দ্রলালের গ্রন্থটি তন্ত্র বিষয়ক নয়। নেপালে প্রাপ্ত বৌদ্ধধর্ম সংক্রান্ত অনেকগুলি পুঁথির পরিচয় দেন তিনি এই গ্রন্থটিতে। পুঁথিগুলির মধ্যে একটির পরিচয় প্রসঙ্গে তিনি বলেন : 'A ritualistic work belonging to the class of Tantra and treating of various esoteric rites and mantras' ইত্যাদি। তারপর বলেন : 'As a Tantric composition of the

esoteric kind, it has all the characteristic of the worst specimens of Sakta works of that type. The professed object, in either case is devotion of the highest kind—absolute and unconditional—at the sacrifice of all wordly attachments, wishes and aspirations, but in working it out theories are indulged in and practices enjoined which are at once the most revolting and and horrible that human depravity could think of' ।[৮৪] একটি পুঁথির বিশেষ বিষয়বস্তু সম্বন্ধে রাজেন্দ্রলালের এই মন্তব্য যে তান্ত্রিক ধর্ম ও সাধনা সম্বন্ধে তাঁর সাধারণ রায় নয়, তা স্পষ্ট। কিন্তু রমেশচন্দ্র সেটিকে ব্যবহার করলেন, তাঁর প্রয়োজন মত, পাঠকদের চমকে দেবার জন্ত। রামমোহনকে অনাচারদুষ্ট তান্ত্রিক ধর্মের একজন পাণ্ডা প্রমাণ করার জন্ত রাজেন্দ্রলালের মত বিশিষ্ট পণ্ডিতের কয়েকটি কথা এই ভাবে ব্যবহার করার চেষ্টা শুধু বিভ্রান্তিকর নয়, বৌদ্ধিক সততার পরিচায়কও নয়।

তন্ত্র ব্যাপারটা যে কত জঘন্ত তা প্রমাণ করার জন্ত রমেশচন্দ্র তাঁর আর একটি গ্রন্থে লেখেন: 'A British missionary wrote a book on the Hindus during the lifetime of Rammohan Roy, but while quoting an eye-witness's account of the normal rituals of the Tantriks, omitted certain passages as being too indecent'[৮৫]। এই উক্তিটির কয়েকটি পংক্তি পরেই রমেশচন্দ্র স্পষ্টই বেশ আত্মপ্রসাদ লাভ করেন এই বলে যে 'Christian missionaries' দের 'scurrilous abuses of their (হিন্দুদের) 'gods and goddesses' সত্ত্বেও 'idolatrous Hindus'-দের অস্তিত্ব বজায় থাকে। দেখা যাচ্ছে যে 'idolatrous Hindus'দের দেব দেবী প্রভৃতিদের আক্রমণ করার জন্ত মুসলমান মোল্লা ও খৃষ্টান পাদ্রীদের ওপর রমেশচন্দ্র ক্ষুব্ধ হলেও রামমোহনকে ধরাশায়ী করার জন্ত সেই পাদ্রীদের অস্ত্র সুবিধামত ব্যবহার করতে তিনি ইতস্তত বোধ করেন নি। রমেশচন্দ্র ১৮১৮ সালে পেছিয়ে গেলেন কেন? তন্ত্র সম্বন্ধে রামমোহনের বক্তব্য-সম্বলিত কোন রচনা, বা তন্ত্র সম্বন্ধে অন্ত কোন লেখকের কোন সাম্প্রতিক প্রমাণ্য গ্রন্থের কি সন্ধান তিনি পান নি? ভারতীয় তান্ত্রিক বা বৌদ্ধ বা বৈষ্ণব সাধনা সম্বন্ধে একখানি অগাধ পাণ্ডিত্য-পূর্ণ গ্রন্থ রচনা করা বিশেষ কঠিন কাজ নয়, যেটি পড়লে মনে হতে পারে যে ওই সাধনা, ব্যাভিচার ও লাম্পট্যের সাধনা ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু তা করলে প্রমাণ হয় যে পণ্ডিত মহাশয়ের উদ্দেশ্য হীন।

রামমোহন যে গভীরভাবে তন্ত্র শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন তা মনে করা সঙ্গত। কিন্তু তিনি সাধক ছিলেন না। কেন তিনি তন্ত্রের প্রতি আকৃষ্ট হন, তন্ত্র তাঁর ধর্মমতকে কি কারণে এবং কতটুকু প্রভাবিত করে, তন্ত্রের মূল আধ্যাত্মিক ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে যে তার সামাজিক ধ্যানধারণাগুলি কিছুটা সঙ্গতিপূর্ণ ছিল, এসব কথা বর্তমানে যাঁরা সুস্থ চিত্তে রামমোহন-চর্চায় লিপ্ত তাঁদের অজানা নেই। সে সব বিষয়ে এখানে কোন আলোচনায় প্রবৃত্ত হবার প্রয়োজন বোধ করি না। শুধু রমেশচন্দ্রের বক্তব্যের ওপরই দুচারটে কথা বলতে চাই।

রমেশচন্দ্র লেখেন যে তান্ত্রিক ধর্মের জঘন্যতার বিরুদ্ধে রামমোহন 'never uttered a word of reproach'[৮৬]। কথাটা কতদূর সত্য দেখা যাক। রামমোহন লেখেন: 'The stories respecting him (মহাদেব) which are read by his devotees in the Tantras, are of a nature, that, if told by any man, would be offensive to the ear of the most abandoned of either sex. In the worship of Kali, human sacrifices, the use of wine, criminal intercourse, and licentious songs are included: the first of these practices has become generally extinct; but it is believed that there are parts of the country where human victims are still offered.

'Debauchery, however, universally forms the principal part of the worship of her followers. Nigam and other Tantras may satisfy every reader of the horrible tenets of the two latter deities (মহাদেব এবং কালী)।'[৮৭] তন্ত্র সম্বন্ধে রামমোহন আনাড়ী ছিলেন না। তন্ত্র মানেই একটা কুৎসিত ব্যাপার তা শুধু রামমোহন কেন, বর্তমানে যাঁরা তন্ত্রশাস্ত্র মন দিয়ে পড়েন তাঁরাও মানেন না। অসদাগম ও সদাগমের পার্থক্যটি তাঁরা জানেন।

রমেশচন্দ্র আরও লেখেন যে রামমোহন 'তান্ত্রিক ধর্মকে নিন্দা করাত দূরের কথা বেদের সমপর্যায়ে গণ্য করিয়াছেন'। রামমোহন মোটেই তা করেন নি। তাঁর দৃষ্টিতে তন্ত্রের উপযোগিতা যাই থাক না কেন, তিনি স্পষ্টই লেখেন: 'হিন্দুদের পুরাণ তন্ত্রাদি বেদের অঙ্গ কিন্তু সাক্ষাৎ বেদ নহেন বেদের সহিত পুরাণাদির অনৈক্য হইলে ঐ পুরাণাদির বচন অগ্রাহ্য হয়।'[৮৮] ওই একই মত তিনি ইংরাজীতে ব্যক্ত করেন: 'The Hindu Puranas and Tantras...

…are subordinate to the Veda, but are not the very Veda itself: when they disagree with the Veda their authority is not regarded'।৮৯

তন্ত্রের উৎপত্তি ও বিবর্তন, তন্ত্র প্রাগৈতিহাসিক না ঐতিহাসিক, বৈদিক না অবৈদিক, জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের সঙ্গে তার কোন যোগসূত্র প্রথম থেকেই ছিল কিনা ইত্যাদি ব্যাপারের বিশদ আলোচনা দীর্ঘদিন ধরে বিশিষ্ট পণ্ডিতেরা করে আসছেন। এখানে যে সব আলোচনার অবকাশ নেই—প্রকৃত পক্ষে তা করার যোগ্যতাও আমার নেই। তবে এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই যে তন্ত্র অতি প্রাচীন, এবং ভারতীয় ধর্মসাধনা এবং দার্শনিক চিন্তার ঐতিহ্যে তা এক বিশিষ্ট মর্যাদার অধিকারী। যদিও প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রকার এবং আচার্যেরা অনেকেই তন্ত্রের অভিচারগুলির নিন্দা করেন, তবুও বিভিন্ন কালে নানা ধারায় তান্ত্রিক ধর্ম ও সাধনার বিকাশ ও প্রসার ঘটে, তা লোকপ্রিয় হয়ে উঠে, এবং প্রচলিত হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মাচরণকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। হিন্দুধর্মের মধ্যে যাঁরা তন্ত্রের প্রবক্তা তাঁরা তন্ত্রকে পঞ্চম বেদ বলে গণ্য করেন। মানব-ধর্মশাস্ত্রের বিখ্যাত ব্যাখ্যাকার কুল্লুক ভট্ট (সম্ভবত পঞ্চদশ শতাব্দী) বলেন যে শ্রুতি দ্বিবিধ—বৈদিক ও তান্ত্রিক। তবুও তন্ত্র সাধারণভাবে বেদেতর হিসাবেই গণ্য হয়ে এসেছে। তন্ত্রের প্রভাব সম্বন্ধে বিবেকানন্দের কয়েকটি কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে: 'আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, তন্ত্রগুলি বৈদিক কর্মকাণ্ডেরই একটু পরিবর্তিত আকার মাত্র, আর কেহ উহাদের সম্বন্ধে হঠাৎ একটা অসম্বদ্ধ সিদ্ধান্ত করিবার পূর্বেই, তাঁহাকে আমি ব্রাহ্মণ ভাগ, বিশেষতঃ অধ্বর্যু-ব্রাহ্মণ ভাগের সহিত মিলাইয়া তন্ত্র পাঠ করিতে পরামর্শ দিই; তাহা হইলে তিনি দেখিবেন, তন্ত্রে ব্যবহৃত অধিকাংশ মন্ত্রই অবিকল ব্রাহ্মণ হইতে গৃহীত। ভারতবর্ষে তন্ত্রের প্রভাব কিরূপ, জিজ্ঞাসা করিলে বলা যাইতে পারে, শ্রৌত বা স্মার্ত কর্ম ব্যতীত হিমালয় হইতে কন্যাকুমারী পর্যন্ত সমুদয় প্রচলিত কর্মকাণ্ডই তন্ত্র হইতে গৃহীত, আর উহা শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়েরই উপাসনাপ্রণালীকে নিয়মিত করিয়া থাকে'।৯০

তন্ত্রের প্রকারভেদ সম্বন্ধে রমেশচন্দ্র নিজে অবহিত নন, একথা মনে করা অবশ্য ঠিক হবে না। তাঁর দ্বারা সম্পাদিত এবং আংশিকভাবে লিখিত একটি গ্রন্থে একজন বিশিষ্ট পণ্ডিত মন্তব্য করেন: 'In their attempt to provide a comprehensive scheme of social life, individual perfection,

and religious devotion, the Tantras failed occasionally to keep the baser elements in proper check among a motley population of different grades of culture. But the innate moral sense operated here as elsewhere to redeem men from the tharldom of desire and selfishness. Perhaps we shall never recapture the atmosphere in which the Puranas and the Tantras were written, but we cannot afford to undervalue the devotion and thought that went into their composition, or their ennobling influence in the long run on the very composite population of an entire subcontinent. They certainly brought the gods nearer the hearts and homes of men and inspired their devotion, prompted their collective action for charity, and gave a filip to the building of religious edifices all over the country'।[৯১] ওই একই গ্রন্থের অপর একটি খণ্ডে রমেশচন্দ্র নিজে লেখেন: 'It is impossible to describe in a modern book some of the worst features of Tantrik theories and practices which have been described by an eminent Indian scholar to be "at once the most revolting and horrible that human depravity could think of". Fortunately the esoteric character of Tantrik religion limited its field of operation, and it may be conceded that such debased forms of religious practices were exceptional and not normal'।[৯২] এত জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও রমেশচন্দ্র তাঁর প্রবন্ধে তান্ত্রিক ধর্ম সম্বন্ধে যখন ঢালাও নিন্দাবাণী উদ্গীরণ করেন, তখন মনে হওয়া স্বাভাবিক যে সেখানে তিনি ঐতিহাসিকের ভূমিকা পরিহার করে প্রচারকের ভূমিকা গ্রহণ করেন।

রমেশচন্দ্র 'এ যুগের ঋষিতুল্য বাঙ্গালী' রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ এবং অরবিন্দের সঙ্গে রামমোহনের প্রভেদটা দেখিয়েছেন। প্রভেদ যে ছিল তা আগেই বলা হয়েছে। রামমোহন অবশ্য তন্ত্র সাধক ছিলেন না। কিন্তু রামকৃষ্ণ দীর্ঘদিন তন্ত্র সাধনা করে সিদ্ধিলাভ করেন। রামকৃষ্ণ যে পদ্ধতিতে সে সাধনা করেন তা যে রমেশচন্দ্রের জানা আছে তা ধরে নেওয়া যেতে পারে। বিবেকানন্দ অবশ্যই তান্ত্রিক ধর্মের দুষ্টাচারগুলির নিন্দা করেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সে চর্চার উপ-যোগিতাও স্বীকার করেন। একটি প্রসঙ্গে তিনি বলেন: 'তন্ত্রের বামাচার-মতটা পরিবর্তিত হয়ে এখন যা দাঁড়িয়েছে, আমি তারই নিন্দা করেছিলুম।

তন্ত্রোক্ত মাতৃভাবের অথবা ঠিক ঠিক বামাচারেরও নিন্দা করিনি। ভগবতী জ্ঞানে মেয়েদের পূজা করাই তন্ত্রের অভিপ্রায়। বৌদ্ধধর্মের অধঃপতনের সময় বামাচারটা ঘোর দূষিত হয়ে উঠেছিল, সেই দূষিত ভাবটা এখনকার বামাচারে এখনও রয়েছে ; এখনও ভারতের তন্ত্রশাস্ত্র ঐ ভাবের দ্বারা influenced...হয়ে রয়েছে। ঐ সকল বীভৎস প্রথারই আমি নিন্দা করেছিলুম—এখনও তো তা করি। যে মহামায়ার রূপরসাত্মক বাহ্যবিকাশ মানুষকে উন্মাদ ক'রে রেখেছে, তাঁরই জ্ঞান-ভক্তি-বিবেক-বৈরাগ্যাদি আন্তরবিকাশে আবার মানুষকে সর্বজ্ঞ সিদ্ধসংকল্প ব্রহ্মজ্ঞ ক'রে দিচ্ছে—সেই মাতৃরূপিণীর স্ফূরদ্বিগ্রহ-স্বরূপিণী মেয়েদের পূজা করতে আমি কখনই নিষেধ করিনি। "সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে"—এই মহামায়াকে পূজা প্রণতি দ্বারা প্রসন্না না করতে পারলে সাধ্য কি ব্রহ্মা বিষ্ণু পর্যন্ত তাঁর হাত ছাড়িয়ে মুক্ত হন'।[৮০] অরবিন্দের সাধনায় তন্ত্রের প্রভাব যে গভীর তা সে সাধনার সঙ্গে যাঁদের সামান্য পরিচয় আছে তাঁরাও জানেন। রমেশচন্দ্রের রচনা রাজেন্দ্রলালের মর্যাদা হানি ঘটিয়েছেন বলে মনে করি।

রামমোহনের ধর্ম প্রসঙ্গে রমেশচন্দ্র লেখেন: 'মূর্তি পূজার অবসান ঘটাইয়া তিনি বর্তমান বঙ্গ সমাজের ভিত্তি কত দৃঢ় ভাবে স্থাপন করিয়াছেন প্রতি বৎসর আলোকমালায় সজ্জিত দ্বিসহস্রাধিক দুর্গামূর্তির পূজামণ্ডপে জলন্ত অক্ষরে তাহা লিখিত এবং শতশত ঢক্কানিনাদে প্রতিধ্বনিত হয়। ১৯৭১ খ্রীঃ পশ্চিমবঙ্গে ব্রাহ্মধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা ছিল ২৫১' (৪৪)। নিজের কথাগুলো তাঁর খুবই ভালো লাগে তা বোঝা যায়—অন্যত্র তিনি কথাগুলোর পুনরাবৃত্তি করেন। তবে তাঁর দুর্গাপূজা-সম্বন্ধীয় মন্তব্যের মধ্যে যে ব্যঙ্গের সুর ফুটে উঠেছে তা লক্ষ্য করে তাঁর পাঠকরা যদি মনে করেন যে তিনি বর্তমানের বারোয়ারি দুর্গাপূজা অনুষ্ঠানের প্রতি বিরূপ তাহলে তাঁরা ভুল করবেন। 'বঙ্গ সমাজের ভিত্তি স্থাপন' ইত্যাদি কথাগুলো রবীন্দ্রনাথের। রবীন্দ্রনাথ কি বলতে চান সে কথা ছেড়ে দেওয়া যাক। তবে রমেশচন্দ্র স্বীকার না করলেও রামমোহন যে বঙ্গসমাজের ভিত্তি আংশিক ভাবে স্থাপন করেন তাতে তাঁর পাঠকদের সন্দেহ থাকতে পারে না ; তা না করলে—আগেই বলেছি, রমেশচন্দ্র 'তাঁহারই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া.... তাঁহার ভক্তদের অন্ধসংস্কারের বিরুদ্ধে যুক্তির দ্বারা তাঁহার স্বরূপ নির্ণয়' করতে পারতেন না।

রমেশচন্দ্র একজায়গায় লেখেন যে রামমোহনের হিন্দুধর্ম সংস্কারের চেষ্টা এক

'utter failure'।[৯৪] তাঁর মন্তব্যের যুক্তি হিসাবে রমেশচন্দ্র বলেন যে রামমোহনের ধর্মসংস্কার 'has not produced the slightest effect upon 99.9 per cent of the vast Hindu Samaj which contains more than 80 per cent of the people of India'।[৯৫] কথাটা খুবই খাঁটি, এবং তার জলন্ত প্রমাণ দেশে ব্রাহ্মধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা এবং বঙ্গদেশের বাৎসরিক দুর্গোৎসব। তবে বাৎসরিক দুর্গাপূজা তাঁর মোটেই অপছন্দ নয়, বরং তাঁর সন্দেহ, 'how far Rammohan was right in his contention that true Hinduism is not consistent with belief in a multiplicity of gods and the worship of their images'।[৯৬] রমেশচন্দ্রের 'true Hinduism' কত গভীরভাবে 'true' সে প্রসঙ্গে প্রবেশ করার প্রয়োজন নেই। তবে তাঁর উপরোক্ত কথাগুলি পড়লে মনে করা সঙ্গত যে তিনি প্রচলিত হিন্দুধর্মের কোনরূপ অবমাননা পছন্দ করেন না, এবং হিন্দু পৌত্তলিকতার একজন উৎসাহী সমর্থক। সুতরাং বর্তমানে বঙ্গদেশের বারোয়ারি দুর্গাপূজার অনুষ্ঠান সম্বন্ধে যে বিরূপতার আভাস তিনি দেন, সেটা তাঁর মনের কথা যে নয় তা স্পষ্ট। অবশ্য রামমোহনের ধর্মসংস্কারের 'utter failure' প্রমাণ করার পক্ষে ওগুলো বেশ ভালো 'ponits'। আর তাছাড়া, ওগুলো সবইত প্রকৃত পক্ষে বঙ্গদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অঙ্গ। বাঙ্গালীর দুর্গোৎসব চিরকালই এক বৃহৎ ব্যাপার। ঢকানিনাদত পবিত্র নিনাদ—পূজার অপরিহার্য অঙ্গ। বরং রমেশচন্দ্র আপত্তি জানাতে পারতেন 'ব্যাণ্ড' বা 'মাইক'-ধ্বনিত ছায়াছবির বা অন্যান্য সঙ্গীতের অবিরাম নিনাদে। আর এই বিদ্যুতের যুগে, বিদ্যুতের প্রচণ্ড অনটন সত্বেও দেবদেবীর পূজার জন্য বিদ্যুৎ যখন সহজলভ্য, তখন সে পূজাকে সার্থক করার জন্য আলোক সজ্জার আয়োজন করতেই হয়।

উনবিংশ শতাব্দীতে দুর্গাপূজার মণ্ডপে যে কুৎসিত ও অশ্লীল নাচ গান, অঙ্গভঙ্গী, ফুর্তিবাজি প্রভৃতি ঘটত তা বহু প্রমাণের সঙ্গে রমেশচন্দ্র উল্লেখ করেন বারবার।[৯৭] 'Hindu idolatry'-র ওই ঐতিহ্যের প্রতি (শতকরা ৯০ ভাগ।) বঙ্গবাসীর গভীর নিষ্ঠা আজ আরও ব্যাপকভাবে উপভোগ করেন বিশ্বশুদ্ধ লোক দুর্গাপূজা, কালীপূজা, সরস্বতীপূজা প্রভৃতির আসরে আসরে, আর প্রতিমা বিসর্জনের মিছিলে মিছিলে শহরের রাজপথে। ওই 'idolatry'কে 'tolerate' কথার পরামর্শ দেন রমেশচন্দ্র তাঁর দেশবাসীদের, আর বলেন যে ওই 'toleration'-ই হল নতুন ভারতের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য। বর্তমানে শত

শত ঢক্কানিনাদে এবং অসংখ্য আলোক-মালাসজ্জিত আসরে পূজিত হন দুর্গা, কালী, সরস্বতী, বিশ্বকর্মা প্রভৃতি। অদূর ভবিষ্যতে যে সমান আড়ম্বরে শনি, মনসা, ওলাইচণ্ডী, ঘণ্টাকর্ণ প্রভৃতিরাও পূজিত হবেন, 'true Hinduism'-এর প্রসারের জন্ত, সে আভাসও রমেশচন্দ্রের কথায় স্পষ্ট। সত্যিইত স্বাধীন ভারতের সংবিধানে যাই-ই লেখা থাকুক না কেন, যে দেশের জনসাধারণের ৮০ ভাগ হিন্দু, সে দেশের কেউ যদি 'Hindu idolatry' অপছন্দও করেন, তবুও তা 'tolerate' করতে তিনি বাধ্য।

হিন্দুধর্মের সংস্কারে রামমোহন যে ব্যর্থ হন তাতে কোন সন্দেহ নেই,—অবশ্য রমেশচন্দ্র সম্প্রতি[৯৮] দেখান যে রামমোহন প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্ম-সমাজ উনবিংশ শতাব্দীতে কিছু সাফল্যও অর্জন করে। রামমোহনের ব্যর্থতায় রমেশচন্দ্র অসুখী নন, কেননা তিনি নিজেই রামমোহনের ধর্ম-সংস্কারের একজন বিরোধী। কিন্তু প্রশ্ন হল, সে ব্যর্থতার জন্ত কি রামমোহন দায়ী? উপনিষদের ঋষিরা যে ধর্ম প্রচার করেন তা কজন হিন্দু গ্রহণ করেন? বলতে হয় যাজ্ঞবল্ক 'utter failure'। বৌদ্ধধর্মের যে বীভৎস অধঃপতন ঘটে তার জন্ত কি বুদ্ধ দোষী? এ বিষয়ে রাজেন্দ্রলালের একটি মন্তব্যের[৯৯] সঙ্গে রমেশচন্দ্রের পরিচিত থাকার কথা। রমেশচন্দ্র একজায়গায় লেখেন: 'Chaitanya's efforts met with hopeless failure'।[১০০] যে ধর্মের ভিত্তি ছিল 'pure love and devotion,'[১০১] যা বঙ্গদেশের জনসাধারণকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে, কিন্তু কালক্রমে তার মধ্যে যে 'vulgarity. and immorality'[১০২] প্রবেশ করে, তার জন্ত কি চৈতন্ত দায়ী? ১৯৪৫ সালে একটা ধনী, শক্তিশালী ও সভ্য দেশের যে প্রেসিডেন্টের নির্দেশে তাঁর বৈমানিক সৈনিকেরা দুটি বোমার আঘাতে একটি দেশের প্রায় দেড় লক্ষ মানুষকে হত্যা করে, এক লক্ষ গৃহ ধূলিসাৎ করে দেয়, এবং অগুনতি মানুষকে চিরকালের জন্ত পঙ্গু করে ফেলে,[১০৩] তিনিওত ধর্মভীরু খৃষ্টান ছিলেন। তাঁর ব্যবহারের জন্ত কি যীশু দায়ী, বা বলতে হবে খৃষ্টধর্ম 'utter failure'? ইস্‌লামের মূল কথাও ত ঈশ্বরের সঙ্গে ও মানুষের সঙ্গে মানুষের শান্তির বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া। ইস্‌লামের ইতিহাস কি সেই শান্তিবাণীর সাক্ষ্য দেয়? যুগে যুগে ধর্মকে যাঁরা জীবনের পরম অবলম্বন হিসাবে গ্রহণ করেন, এবং মানুষের মঙ্গল কামনা করেন তাঁদের ব্যর্থতার কাহিনী ইতিহাসাচার্য রমেশচন্দ্রের অজানা থাকার কথা নয়, সুতরাং রামমোহনের 'utter failure'-এর কথা অত জোরে ঘোষণা করে তিনি কি প্রমাণ

করতে চান? তিনি কি মানেন যে, যুগে যুগে মানুষের মঙ্গলাকাঙ্খীরা কি পেয়েছেন, তার চেয়ে বড় কথা, তাঁরা কি পাবার চেষ্টা করেছেন? রমেশচন্দ্র যদি বিশুদ্ধ 'Hindu idolatry' সম্বন্ধে তাঁর লেখাগুলিতে কিছু আলোকপাত করতেন তাহলে তাঁর পাঠকরা প্রকৃতই উপকৃত হতেন।

রামমোহনের ব্যর্থতা প্রসঙ্গে রমেশচন্দ্র আরও একটি গুরুত্ব পূর্ণ মন্তব্য করেন: 'So far as the Hindu religion is concenred the Modern Age in India was inaugurated not by Rammohan but by Ramkrishna and Vivekananda।'[১০৪] রামকৃষ্ণ এবং বিবেকানন্দ আধুনিক ভারতের অবসাদগ্রস্ত জনসাধারণের ধর্মজীবনে যে আবেগের, আলোর ও উদ্দীপনার সঞ্চার করেন, এবং বিশেষভাবে বিবেকানন্দ যে ভাবে ঝাঁকুনি দিয়ে তাঁর দেশবাসীদের আত্মসচেতন করে তোলেন তা বিশ্ববিদিত, সুতরাং সে সম্বন্ধে কিছু বলা বাহুল্য মাত্র। তবে মনে হয় রামমোহনের চরম ব্যর্থতা প্রমাণ করার জন্যই রমেশচন্দ্র রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের মহান সাফল্যের কথা উল্লেখ করেন। রামকৃষ্ণ এবং বিবেকানন্দ সম্বন্ধে রমেশচন্দ্রের মন্তব্য যদি সত্য হয়, তাহলে মানতেই হবে যে, যে দ্বিসহস্রাধিক দুর্গাপূজা, শত শত ঢক্কানিনাদ এবং আলোকমালার সজ্জা রমেশচন্দ্রের বিরক্তি উৎপাদন করে, তা রামকৃষ্ণ এবং বিবেকানন্দ কর্তৃক উদ্বোধিত আধুনিক ভারতে হিন্দুধর্মের নবযুগের মহান বিকাশ ও সফল পরিণতিকে প্রতীত করে। আর যদি সে গুলিকে হিন্দুধর্মের পক্ষে মন্দ ও ক্ষতিকর বলে মনে করা হয়, তাহলে বলতে হবে রামকৃষ্ণ এবং বিবেকানন্দের সাধনা ও উদ্যোগ এক 'utter failure'। রমেশচন্দ্রের পাঠকদের মনে হতে পারে যে তিনি কি বলতে চান তা নিজেই ঠিক বুঝতে পারেন নি। বর্তমানে হিন্দুধর্মাচরণের যে চেহারা ব্যাপক ভাবে লক্ষিত হয়—ঠিক কত ভাগ হিন্দুর মধ্যে তা বলা কঠিন,—তার সঙ্গে রামকৃষ্ণ এবং বিবেকানন্দের নাম না জড়ানোই বাঞ্ছনীয়। ধর্মাচার্য এবং ধর্মসংস্কারক রামমোহনকে হেয় করার উৎসাহে রমেশচন্দ্র রামকৃষ্ণ এবং বিবেকানন্দ সম্বন্ধে ঋণ করে যে মন্তব্য করেন তাতে তাঁদের গৌরব একটুও বৃদ্ধি পায়নি।

১৯৭১ সালের আদমসুমারীর ভিত্তিতে পশ্চিমবঙ্গের ব্রাহ্মদের সংখ্যার কথা রমেশচন্দ্র যা বলেন, তা আমার খবর অনুযায়ী সত্য নয়। তবুও যদি ধরে নেওয়া যায় যে বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে ব্রাহ্মদের সংখ্যা ২৫১ জন, বা 0·0005 per cent of the total population,'[১০৫] তাহলেও ব্রাহ্মধর্মাবলম্বীদের

বিচলিত বা অসুখী হবার কারণ নেই, কেননা 'Hindu idolatry'র উন্মত্ত পরিবেশে যদি ২৫১ জন মানুষও মানসিক ও আধ্যাত্মিক স্বাস্থ্য ও সুস্থতার পরিচয় দেন, তাহলে রামমোহন যে 'utter failure' নন তা প্রমাণিত হয়।

রমেশচন্দ্র তাঁর প্রবন্ধে লেখেন যে সহমরণ প্রথা উচ্ছেদের চেষ্টা করার মত 'রামমোহন হিন্দুসমাজের এরূপ আর কোনো সংস্কারের জন্য প্রয়াস করিয়াছেন তাহা আমার জানা নাই' (৪১)। প্রকৃতই জানা আছে কিনা তার কিছু প্রমাণ রমেশচন্দ্রের লেখা থেকেই দেওয়া হয়েছে। যাই হক, সমাজের অন্তত একটা সংস্কারের জন্য চেষ্টা করার কৃতিত্ব রমেশচন্দ্র রামমোহনকে দিয়েছেন—যদিও মনে হয় বেশ কিছুটা অনিচ্ছার সঙ্গে। সহমরণ প্রথা উচ্ছেদের চেষ্টা করার জন্য রামমোহনকে সংক্ষেপে একটা প্রশংসাপত্র দিয়েই রমেশচন্দ্র যদি ক্ষান্ত হতেন, তাহলে বিষয়টা সম্বন্ধে আর আলোচনা না করলেও চলত। কিন্তু তিনি তা করননি। তিনি তথ্য সহযোগে প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে সহমরণ প্রথার উচ্ছেদে রামমোহনের ভূমিকার তেমন গুরুত্ব ছিল না। ওই প্রকৃত তথ্যটি তাঁর পাঠকদের জানাবার জন্য তিনি রামমোহন-ভক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের একটি মন্তব্য নিজের ভাষায় রূপান্তরিত করে বলেন: 'সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলনে তাঁহার ভূমিকা খুব বড না হইলেও ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে তাঁহার চেষ্টা ব্যতীত আইন দ্বারা এই নিষ্ঠুর প্রথা এত শীঘ্র নিষিদ্ধ হইত না' (৪১)। এরপর নিজে মন্তব্য করেন যে 'প্রকৃত সত্য ঠিক ইহার বিপরীত' (৪১)। বিপরীত হবার দুটি কারণও রমেশচন্দ্র উল্লেখ করেন: একটি হল যে 'বেন্টিঙ্ক নিজেই লিখিয়াছেন যে এবিষয়ে আইন করার আগে তিনি রামমোহনের মত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—রামমোহন আইন দ্বারা সহমরণ প্রথা বন্ধ করিবার বিরুদ্ধে মত দিয়াছিলেন' (৪১)। অপরটি হল যে 'লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্কের একখানি চিঠি হইতে আমরা জানিতে পারি যে বড়লাট হইয়া আসার পূর্বেই তিনি সহমরণ প্রথা লোপ করিবার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন' (৪১)। সুতরাং রমেশচন্দ্রের মতে 'সহমরণ প্রথা রহিত করিবার কৃতিত্ব প্রধানতঃ বেন্টিঙ্কের—রামমোহনের নহে' (৪১)।

সহমরণ প্রথা উচ্ছেদের ব্যাপারে রামমোহনের ভূমিকা সম্বন্ধে আজ থেকে ৭০ বছর আগে রামানন্দ কি মত পোষণ করতেন, তা আমি মনে করি উপেক্ষনীয়। তবে রমেশচন্দ্র তাঁর প্রবন্ধে কথাটা যখন তুলেছেন, তখন সে সম্বন্ধে

আমি দুচারটি কথা বলতে চাই। দেখা যাক রামানন্দ কি লেখেন। রামানন্দের মন্তব্যের সূত্রটি রমেশচন্দ্র উল্লেখ করেন। পড়লে মনে হয় সেটি রামানন্দের একটি ইংরাজী মন্তব্যের সারানুবাদ। রামানন্দ লেখেন: 'Rammohan Roy's chief claim to the gratitude of Hindu womanhood is the courageous and devoted part that he played in the movement for the abolition of suttee. He may or may not have been the central figure in that movement but it must be admitted by all that but for his exertions that inhuman custom would not have been put down by law so soon as it was'।[১০৩] রমেশচন্দ্রের অনুবাদ কতটা সঠিক যে প্রশ্নে প্রবেশ করার প্রয়োজন দেখিনা—পাঠকরা তা বিচার করবেন। তবে রামানন্দের উক্তিটি আমার কাছে পরিষ্কার নয়, এবং তার যেটুকু বুঝেছি, তাতেও আমি তাঁর সঙ্গে একমত নই। যাই হক সতীদাহ প্রথা নিবারণে রামমোহনের ভূমিকা সম্বন্ধে বিবেকানন্দ বা রামানন্দ যা বলেন, আজকের দিনের আলোচনায় তার কোন প্রাসঙ্গিকতা আছে বলে আমি মনে করিনা। সতীদাহ প্রথা নিবারণের প্রায় সব কৃতিত্বটাই বিবেকানন্দ দেন রামমোহনকে, আর রামানন্দের মতে রামমোহনের চেষ্টা ব্যতীত অত তাড়াতাড়ি আইন করে সে প্রথার উচ্ছেদ হত না। বিবেকানন্দ বা রামানন্দ ঐতিহাসিক হন বা না হন, যে উপলব্ধির ও আবেগের বশেই তাঁরা তাঁদের মন্তব্য করে থাকুন না কেন, এটা স্পষ্ট যে তাঁদের কারোর দৃষ্টিতেই সতীদাহ-উচ্ছেদ আন্দোলনের সমসাময়িক ঐতিহাসিক পরিস্থিতিটা পরিষ্কার ছিলনা—অর্থাৎ, নানা ঘটনার ফলে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই ভারতে বৃটিশ-শাসনের চরিত্রের যে পরিবর্তন ঘটতে থাকে—যার জন্য শেষ পর্যন্ত ১৮২৯ সালে Bentinck আইন করে সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদ করার ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তটি গ্রহণ করেন, তার সঙ্গে তাঁদের সবিশেষ পরিচয় ছিল না। সে পরিস্থিতি সম্বন্ধীয় অনেক বেশী তথ্য আজ আমাদের হাতে আছে। সে পরিস্থিতিটা আজ আমাদের কাছে অনেক বেশী পরিষ্কার। সতীদাহ উচ্ছেদের আন্দোলনে রামমোহন এবং Bentinck এবং আরও অনেকের কি ভূমিকা ছিল তা আজ আমরা তখনকার ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর আলোকে অনেক বেশী খুঁটিয়ে সমীক্ষণ করতে পারি। সুতরাং রামানন্দের উক্তি সত্য কি মিথ্যা তা প্রমাণ করার প্রয়োজন কি আজ? সে প্রসঙ্গের অবতারণা করাইত অবান্তর। আজকের ঐতিহাসিকের কাছে সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদের জন্য রামমোহন কি করেন সেটাই

মূল প্রশ্ন, সে সম্বন্ধে তাঁর ভক্ত রামানন্দ কি বলেন তা উপেক্ষণীয়। কিন্তু রমেশচন্দ্র ভক্তের যুক্তি খণ্ডন করার নিরর্থক পরিশ্রমে লিপ্ত হন। তাঁর উদ্দেশ্য মনে হয়, এক ঢিলে ভগবান এবং ভক্ত উভয়কেই ঘায়েল করা। যাই হক, 'প্রকৃত সত্য ঠিক ইহার বিপরীত', রমেশচন্দ্রের এ কথার অর্থ কি? রামমোহন কি সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদের বিরোধী ছিলেন? বা, সে ব্যাপারে তাঁর চেয়ে Bentinck এর আন্তরিকতা বেশী ছিল? বা, Bentinck-এর একটা মহৎ উদ্যোগে তিনি বাধা দিতে চান? বা, আইন করার তিনি বিরোধিতা করেন? আইন করার বিরুদ্ধে মত দেওয়া এবং কোন কারণে, আইন করার বিজ্ঞতা সম্বন্ধে আশঙ্কা প্রকাশ করা, এ দুটো কি এক ব্যাপার? আমার মনে আছে, জনৈক উগ্র প্রগতিবাদী শিক্ষক একবার রামমোহন-আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁর ছাত্রদের বলেন যে রামমোহন Bentinck-এর সতীদাহ-প্রথা-নিবারক আইন করার প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। ছাত্ররা সব চমকে ওঠে। তাদের সন্দেহাকুল প্রশ্নের উত্তরে শিক্ষক মশাই আরও বলেন—রমেশচন্দ্রের মত যে সে কথা 'বেন্টিঙ্ক নিজেই লিখিয়াছেন'। কিছু বৌদ্ধিক অস্বস্তির মধ্যে ব্যাপারটা সেদিনকার মত মিটে গেলেও ছাত্রদের সন্দেহের নিরসন ঘটে না। যাই হক সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদের ব্যাপারে 'প্রকৃত সত্য' কি, তা আমরা সমসাময়িক ঘটনাবলীর মধ্য থেকেই আবিষ্কার করার চেষ্টা করব, বিবেকানন্দ বা রামানন্দের মতামত থেকে নয়। আর, যে দুটি প্রমাণের ভিত্তিতে রমেশচন্দ্র লেখেন 'প্রকৃত সত্য ঠিক ইহার বিপরীত', সে দুটিকে আপাতবিচারে সঠিক ধরে নিলেও, সমসাময়িক ঐতিহাসিক পরিস্থিতির আলো তাদের সিদ্ধতার সীমিত চরিত্রকে প্রকট করে দেয়। এটা একটা সহজ কথা যে, কোনো ঐতিহাসিক ঘটনাকে তার নিজস্ব প্রসঙ্গ এবং যোগসূত্রগুলি থেকে বিচ্ছিন্ন করে বিচার করলে, তার প্রামাণিক রূপটির প্রকৃত পরিচয় মেলে না। প্রত্যেক ঐতিহাসিক প্রমাণের চরিত্র এবং সিদ্ধতার পরিমিতি নির্ণীত হয় বিশেষ বিশেষ বাস্তব অবস্থার দ্বারা।

একটা কথা। সতীদাহ প্রথা রহিতকরণে রামমোহনের ভূমিকা সম্বন্ধে রমেশচন্দ্র বলেন যে রামমোহনের 'নারী জাতির সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা ছিল, (৪১); তিনি সতীদাহ প্রথার মত সমাজের···গ্লানি সম্বন্ধে অসন্তোষ অনুভব' করেন, এবং সে গ্লানিবোধ এবং অসন্তোষ ভাষায়ও প্রকাশ করেন; এবং 'সহমরণের নিষ্ঠুরতা রামমোহনের মানবিকতাকে বিচলিত করিয়াছিল',—এই মাত্র। সে

গ্লানি দূর করার কোন প্রকৃত—রমেশচন্দ্রের ভাষায় 'আপ্রাণ', চেষ্টা তিনি করেন নি। অর্থাৎ, রামমোহনের 'শ্রম ও আয়াস'—নিছক আবেগোচ্ছলতা, বাগাড়ম্বর এবং 'gallantry'—তার কোনো প্রকৃত মূল্য নেই। সুতরাং সতীদাহপ্রথা রহিত করার বাহাদুরীটা প্রকৃত Bentinckএরই প্রাপ্য, রামমোহনের নয়। এখানে একটা কথা বলে নেওয়া ভাল যে, এ প্রবন্ধের লেখক একজন সামান্য ঐতিহাসিক মাত্র, কোনরকম ঐতিহাসিক 'messianism' বা ব্যক্তিকেন্দ্রিক আধিবিদ্যকতার প্রতি তার কোনো আকর্ষণ নেই। সহমরণ প্রথা রহিত করার জন্য রামমোহন এবং Bentinck-এর ভূমিকার প্রকৃতি ও গুরুত্ব সম্বন্ধে রমেশচন্দ্র যে সব যুক্তি উপস্থিত করেন যথাসাধ্য সেগুলির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করাই তার উদ্দেশ্য—Bentinck-এর কৃতিত্বের কোনরকম অবমতি বা রামমোহনের কৃতিত্ব সম্বন্ধে কোনরকম অত্যুক্তি করা নয়। তাঁদের মধ্যে কার কৃতিত্ব প্রধান এবং কার অপ্রধান সে সম্বন্ধে শিশুপাঠ্য ইতিহাসের লেখার মত এক কথায় একটা ঢালাও রায় না দিয়ে সমস্ত ব্যাপারটিতে তাঁরা কে কি ভূমিকা গ্রহণ করেন তা পরীক্ষা করা দরকার।

অবশ্যই সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদের প্রসঙ্গ উঠলেই সর্বাগ্রে আমাদের মনে রামমোহন এবং Bentinck-এর কথা উদয় হয়। কিন্তু তার জন্য একথা মনে করার কারণ নেই যে মাত্র তাঁদেরই প্রচেষ্টায় সে প্রথার উচ্ছেদ ঘটে। রমেশচন্দ্র একরকম ঠিকই বলেন যে 'রামমোহনের বহু পূর্ব হইতেই সে সহমরণ প্রথার বিরুদ্ধে বহু আন্দোলন হইয়াছে, এবং ইংরেজ সরকারও ইহা রহিত করিবার বহু নিষ্ফল চেষ্টা করিয়াছিলেন' (৪০)। অর্থাৎ,—আন্দোলনের প্রকৃতি যাই হক না কেন, রামমোহন এবং Bentinck ছাড়াও অনেকে তাতে অংশ গ্রহণ করেন। কিন্তু রমেশচন্দ্র যেটা বলেন নি সেটা হচ্ছে যে ওই দীর্ঘ-দিনব্যাপী অন্যান্য অনেক ব্যক্তির বহু চেষ্টাই চূড়ান্ত ফল প্রসব করে ১৮২৯ সালের ডিসেম্বর মাসে। শুধু তাই নয়, সতীদাহ প্রথা নিবারণে Bentinck-এর ভূমিকা মুখ্য এবং রামমোহনের ভূমিকা গৌন, এটা প্রমাণ করার উৎসাহে তিনি ইঙ্গিত দেন যে Bentinck-এর ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তের ওপর রামমোহনের দীর্ঘকালব্যাপী 'শ্রম ও আয়াস'-এর কোনো প্রভাব পড়েনি। রমেশচন্দ্রের যুক্তি অনুযায়ী ভারতে আসার পূর্বেই Bentinck যখন বিষয়টি সম্বন্ধে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেন, তখন ভারতে সে বিষয়ে রামমোহন বা অন্য কেউ কি বলেন বা না বলেন, তার দ্বারা প্রভাবিত হবার কোনো প্রবণতা তাঁর থাকার

কথা নয়। কোম্পানীর সরকারের প্রধান হিসাবে একমাত্র নিজের ক্ষমতা বলেই তিনি তাঁর দৃঢ় প্রতিজ্ঞা কার্যকরী করেন। মনে হতে পারে রমেশচন্দ্র Bentinck-এর একজন ভক্ত।

আর একটা কথা একটুখানি এখানে বলেনি। Bentinck এবং রামমোহন দুজনেই ছিলেন দুই সমসাময়িক ঐতিহাসিক পুরুষ। ভারতের এক বিশেষ ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে দুজনেই হিন্দুদের এক বৃহৎ সামাজিক সমস্যার সমাধানে সচেষ্ট হন, নিজ নিজ ক্ষেত্রে। দেশের সেই পরিস্থিতিতে দুজনের মর্যাদা সমান ছিল না—Bentinck ছিলেন গভর্ণর-জেনারেল, ভারতের সর্বময় কর্তা; সীমিত হলেও কোনো গুরুতর বিষয়ে একটা পাকা সিদ্ধান্ত নেবার আইন-সঙ্গত ক্ষমতা তাঁর ছিল। রামমোহন ছিলেন কলকাতা-শহরবাসী একজন বিশিষ্ট বাঙ্গালী বাবু—বৃটিশ সরকারের প্রজা। তিনি দেশের কোন সামাজিক সমস্যা সম্বন্ধে একটা দৃঢ়মত পোষণ করতে পারতেন, একটা আন্দোলনও গড়ে তুলতে পারতেন, কিন্তু তাঁর মতকে একটা আইনসিদ্ধ কার্যকরী রূপ দেবার ক্ষমতা তাঁর ছিল না। ঠিক কোন সময়ে Bentinck সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদ করার দৃঢ়প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেন তা আমাদের জানা নেই, (১৮২৭ সালের আগে নয়) তবে ভারতবাসীদের মঙ্গলকামী হিসাবে তাঁর একটা পুরোণ পরিচয় ছিল। তিনি গভর্ণর-জেনারেল হিসাবে ভারতে আসার বহুপূর্ব থেকেই রামমোহন সতীদাহ-বিরোধী-আন্দোলন শুরু করেন। ভারতীয় ব্যাপারে কিছুটা অভিজ্ঞ এবং আগ্রহশীল ব্যক্তি হিসাবে রামমোহনের আন্দোলনের সঙ্গে তিনি হয়ত ভালভাবেই পরিচিত ছিলেন। তবে সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদের আইনটি তিনিই করেন, রামমোহন নয়। সুতরাং সে কাজের কৃতিত্ব তাঁরই প্রাপ্য, রামমোহনের নয়। তবে তিনি যে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তটি নেন, সেটা সম্পূর্ণ তাঁর ব্যক্তিগত ইচ্ছারই পূরক, বা শুধু তাঁর ব্যক্তিগত দায়িত্বে এবং ক্ষমতা বলে নেন, এরকম ধারণার কোনো ভিত্তি নেই। ১৮২৯ সালে আইনটি তৈরী হবার আগে ইংলণ্ডে এবং এদেশে, সতীদাহ সমস্যাটিকে কেন্দ্র করে অনেক ঘটনা ঘটে, যার ওপর Bentinck-এর কোন হাত ছিল না। সে ঘটনাগুলোকে উপেক্ষা করে Bentinck-এর ১৮২৯ সালের সিদ্ধান্তের ওপর সব গুরুত্ব অর্পণ করা সঠিক বিচার নয়। বরং এ কথা বলাই যুক্তিযুক্ত যে Bentinck-এর সিদ্ধান্তটি দীর্ঘ-কালব্যাপী নানা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার চূড়ান্ত ঐতিহাসিক পরিণতি।

বহু প্রাচীনকাল থেকেই ভারতবর্ষের সর্বত্রই হিন্দু সমাজে সতীদাহ প্রথা

প্রচলিত ছিল—কোথাও কম, কোথাও বেশী। দাহ করা ছাড়া অন্য উপায়েও বিধবাদের হত্যা করা হত। সমাজের বিশেষ কোন্ কোন্ শ্রেণীর মধ্যে এই বর্বর প্রথাটি প্রতিপালিত হত সে আলোচনার প্রয়োজন এখানে নেই। তবে প্রথাটির খুব ব্যাপক প্রচলন ছিল তা মনে করা ঠিক নয়। অবশ্যই প্রথাটি যে হিন্দু সমাজে এক বিষম মানবিক সমস্যার সৃষ্টি করে তাতে সন্দেহ নেই। বিধবাদের পিতামাতা এবং প্রিয় আত্মীয়-পরিজন ছিলেন। এছাড়াও, দেশে সহৃদয় হিন্দু একেবারে ছিলেন না তা মনে করা সঙ্গত নয়। বিধবাদের সহমরণের যন্ত্রণা থেকে রক্ষা করতে কোন হিন্দুই চাইতেন না এ কথা বিশ্বাস করা খুই কঠিন। প্রকৃত পক্ষে, শাস্ত্রানুশাসন অনুযায়ী সহমৃতা হতে বিধবারা বাধ্য ছিলেন না। প্রথাটির উচ্ছেদের জন্য কখনও সংগঠিত ভাবে কোন জনমত গড়ে তোলার চেষ্টা উনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে হয় নি। দেশের মুসলমান শাসকরা কেউ কেউ প্রথাটিকে বন্ধ করার চেষ্টা করেন, কিন্তু সফল হন না। ব্যক্তিগত চেষ্টায় তা কখন কখন বন্ধ করা হত। আমরা জানি মারাঠা হোলকার রাণী অহল্যাবাই তাঁর শোকাহত শ্বশুরের অনুরোধে সহমৃতা হন নি। সমস্যা এই যে দেশের হিন্দু নরপতি এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিরাও তখন সাধারণ ভাবে ছিলেন লোকাচার, দেশাচার প্রভৃতির দাস। লোকাচারের বিষ তাঁদের হৃদয় বৃত্তিকে অসাড় করে দেয়। শাস্ত্রকে উপেক্ষা করে লোকাচারগুলিকে অনুসরণ করেন তাঁরা অন্ধভাবে। ফলে, সতীদাহের মত একটা নিষ্ঠুর, বীভৎস প্রথাকে রোধ করতে উদ্যোগী তাঁরা হন না। হয়ত মনে মনে তাঁরা অনেকেই ক্ষুব্ধ ও পীড়িত হতেন, কিন্তু সাহস করে সেটির প্রতিরোধে অগ্রসর হতেন না। এ ছাড়াও সহমরণের সঙ্গে অনেক ক্ষেত্রে হিন্দু পরিবার-গুলির ঐহিক স্বার্থ জড়িত থাকত। পরিবারের বিধবাদের হত্যা করে যদি কিছু ধন সম্পদ লাভ করা যায় তাহলে ধর্ম ও লোকাচারের দোহাই দিয়ে প্রথাটিকে বহাল রাখাই তাঁরা প্রশস্ত মনে করতেন। তবুও বলা যায়, যে সতী-দাহ সর্বত্র ঘটলেও কখনও তা একটা ভয়াবহ আকার ধারণ করে নি। তবে অন্যান্য অঞ্চলের চেয়ে বঙ্গদেশে তার প্রাদুর্ভাব পরিলক্ষিত হত—যে কোন কারণেই হক। অন্তত যে সময়ের কথা আমরা আলোচনা করছি, সে সময়ে বঙ্গদেশের সামাজিক জীবনে সেটি এক বিষম অভিশাপ হয়ে দেখা দেয়। অবশ্য উনবিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকেই দেখা যায়, উদার, হৃদয়বান, মানবিক-দৃষ্টি-সম্পন্ন কিছু বঙ্গবাসী সতীদাহ প্রথার বিরোধিতা করেন। লক্ষ্যণীয় যে, রাধাকান্ত

দেব, রামকমল সেন, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মতিলাল শীল প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিরা, যাঁরা সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদের বিরোধিতা করেন, তাঁদের পরিবারে কখনও কোন বিধবা সহমৃতা হন বলে জানা যায় না। রামমোহনই যে সর্ব-প্রথম বিধবাদের প্রাণ রক্ষা করতে উদ্যোগী হন, এ কথা মনে করা সঠিক নয়। তবে তিনিই প্রথম ভারতবাসী যিনি দেশে সতীদাহ-বিরোধী একটি সার্থক আন্দোলন গড়ে তোলেন। তিনি ঠিক কোন সময় সে কাজে অবতীর্ণ হন তা বলা কঠিন। কেন তিনি হন সে সম্বন্ধে একটা মনগড়া কাহিনী প্রচলিত আছে। যাই হক, এ বিষয়ে তিনি সক্রিয় হন ১৮১৫ সালে কলকাতায় স্থায়ীভাবে বাস করতে আরম্ভ করার পর। প্রকৃত পক্ষে, সংস্কার সংগ্রামে অবতীর্ণ হবার জন্যই তিনি কলকাতা শহরে স্থায়ীভাবে তাঁর শিবির সংস্থাপন করেন। ওই বছরই তিনি তাঁর আত্মীয় সভা প্রতিষ্ঠা করেন। আত্মীয় সভার প্রতিষ্ঠা একটা গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা—এক অভূতপূর্ব উদ্যোগ। তখনকার দিনে শিক্ষিত মানুষের মন থেকেও সংস্কারের প্রভাব দূর করা খুবই কঠিন ছিল। রামমোহন মনে করেন যে হিন্দু সমাজের বর্বর প্রথাগুলিকে উচ্ছেদ করতে হলে, সামাজিক জীবনকে নতুন ভাবে গড়ে তুলতে হলে, দেশের আধুনিকীকরণ করতে হলে, সমাজের ভদ্র, শিক্ষিত ব্যক্তিদের একত্রিত করা এবং সংস্কারোদ্যোগী করা একান্ত প্রয়োজন। আত্মীয় সভার সভ্যেরা মোটামুটি ছিলেন রামমোহনের মতানুবর্তী। অবশ্যই সেটি একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠী ছিল। সেটিকে প্রকৃত পক্ষে রামমোহন-গোষ্ঠী নামে অভিহিত করা যেতে পারে। গোষ্ঠীর আলোচনা সভায় বিদেশীরাও যোগ দিতেন। আত্মীয় সভার দৃঢ় সহযোগিতা ছাড়া রামমোহনের পক্ষে সফল হওয়া সম্ভব ছিল না।

ইতিমধ্যে, ১৮১২ থেকে ১৮১৭ সালের মধ্যে সতীদাহ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কোম্পানীর সরকার কিছু বিধিনিষেধ বলবৎ করেন। সেগুলিকে বাতিল করার জন্য সমাজের প্রভাবশালী রক্ষণশীল গোষ্ঠী সরকারের কাছে আবেদন করেন। সে আবেদনের বিরুদ্ধে ১৮১৮ সালের আগষ্ট মাসে যে পাল্টা আবেদন করা হয় তার উদ্যোক্তা ছিলেন আত্মীয় সভার সভ্যেরা। ১৮২৯ সালে যখন Bentinck আইন করে সতীদাহ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করেন, তখন যাঁরা তাঁকে অভিনন্দন জানান তাঁদের মধ্যে রামমোহন-গোষ্ঠী ছিলেন অন্যতম।

নানাসূত্রে রামমোহন ভারতে কর্মরত কিছু ইংরাজদের সঙ্গে পরিচিত হন। অনেকের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘনিষ্ট হয়। তাঁরা সাধারণভাবে সতীদাহ

প্রথার বিরোধী ছিলেন। রামমোহন যে তাঁর কর্মসূচী নিয়ে তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করেন সেটা অনুমান করা অসঙ্গত নয়। হিন্দু রামমোহনের সতীদাহ-বিরোধী অভিমতকে যেমন তাঁরা সমর্থন করেন, তেমনি সে অভিমত তাঁদেরও উৎসাহ বর্ধন করে। বঙ্গদেশে বসবাসকারী ইংরাজরা এবং 'Evangelical' পাদ্রী সম্প্রদায় রামমোহন-গোষ্ঠীর কার্যকলাপ সম্বন্ধে ভাল ভাবেই অবহিত ছিলেন।

উনবিংশ শতাব্দীর একেবারে গোড়া থেকেই বিদেশী শাসক, যাজক ও ধর্মপ্রচারক গোষ্ঠীগুলির মধ্যে হিন্দুদের অমানবিক, বর্বর ধর্মীয় ও সামাজিক প্রথাগুলির বিরোধিতা বেশ জোরালো হয়ে উঠতে থাকে। তাতে ক্রমশঃ যোগ দেন, উদার দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন, যুক্তিবাদী, শিক্ষিত উচ্চশ্রেণীর হিন্দুরা। ওই হিন্দুদের সংখ্যা নগন্য হলেও তাঁদের কণ্ঠস্বর ছিল যেমন স্পষ্ট, তেমনি দৃঢ়। *ফলে বঙ্গদেশে ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের অনুকূল একটা* উদ্দীপনাপূর্ণ ও ক্ষুব্ধ পরিবেশ সৃষ্টি হয়, যা কোম্পানীর কর্তৃপক্ষের নিরপেক্ষ ও সাবধানী প্রশাসনিক নীতিকে ক্রমাগত বিব্রত করতে থাকে, এবং তার ভিত্তিকে শিথিল করে দেয়। ইংরাজ 'Evangelical'-দের অদম্য উৎসাহ ও অধ্যবসায়ের ফলে ১৭৯৩ সালের 'pious clause', ১৮১৩ সালে একটা কার্যকরী নীতি হিসাবে স্বীকৃত হয়। শুধু তাই নয়। Lord Wellesley-র শাসনকাল থেকেই মোটামুটি দুটি ব্যাপার স্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রথমত, কোম্পানীর শাসননীতি নানা রাজনৈতিক আশঙ্কায় উদ্বেজিত হলেও, ক্রমশ তা একটা 'aggressive humanitarianism'-এর আকার গ্রহণ করে, এবং দ্বিতীয়ত, ১৮০০ সালে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ-এর প্রতিষ্ঠা শাসক ইংরাজ এবং শাসিত ভারতবাসীর মধ্যে যে বৌদ্ধিক সহযোগিতার সূচনা করে, তার উৎসাহ বেশ দ্রুত এবং ব্যাপকভাবে সমাজ-সংস্কারের ক্ষেত্রে প্রসারিত হয়। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে বঙ্গদেশের ইতিহাস একটা মোড় নেয়—সে ঘটনায় রামমোহনের [illegible] ছিল যেমন বিপুল বিতর্কিত, তেমনি বিপুল অনন্যতায় উজ্জ্বল।

[illegible] লে রামমোহন সহমরণ প্রথার বিরোধিতা করে বাংলায় একটি [illegible] রেন। তিনি সেখানে যে সব যুক্তি উপস্থিত করেন তার [illegible] শাস্ত্রাহশাসন। তাঁর মতে সহমরণ প্রথা শুধুমাত্র মানবতা- [illegible] তিনি প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে [illegible] নয়। [illegible] পালন লোকাচার-

দেশাচার প্রভৃতির দাসত্ব মাত্র। সাধারণত, বিধবাদের দুঃখ, হতাশা, মূঢ়তা এবং দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তাদের পরিবারের লোকেরা নিজেদের ঐহিক স্বার্থ সিদ্ধির জন্য তাদের সহমৃতা হতে প্ররোচিত করে। ১৮১৭ সালে সদর দেওয়ানী আদালতের প্রধান বিচারপতির অনুরোধে পণ্ডিতপ্রবর মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার সহমরণ সম্বন্ধে অভিমত দেন যে 'চিতারোহণ অপরিহার্য্য নয়,—ইচ্ছাধীন বিষয় মাত্র। অনুগমন এবং ধর্ম্মজীবন যাপন—এই উভয়ের মধ্যে শেষটিই শ্রেয়তর। যে স্ত্রী অনুমৃতা না হয় অথবা অনুগমনের সঙ্কল্প হইতে বিচ্যুত হয়, তাহার কোন দোষ বর্ত্তে না।'[১০৭] পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয়ের এই অভিমতটি প্রমাণ হিসাবে নিজের বক্তব্যের সমর্থনে রামমোহন ব্যবহার করেন।

১৮১৬ সালে প্রকাশিত ঈশোপনিষদের ইংরাজী অনুবাদের ভূমিকায় রামমোহন তাঁর হিন্দু দেশবাসীদের 'dreadful acts of self-destruction and the immolation of the nearest relations, under the delusion of conforming to sacred religious rites'[১০৮]-এর কথা ক্ষোভের সঙ্গে উল্লেখ করেন। সতীদাহ সম্পর্কিত সরকারী নিয়ন্ত্রণবিধিগুলি যথারীতি পালিত হচ্ছে কিনা তার ওপর নজর রাখার জন্য রামমোহন একটি 'Vigilance Committee' গঠন করেন, এবং স্বয়ং শ্মশান ঘাটে উপস্থিত হয়ে বিধবাদের সহমৃতা হতে নিরস্ত করার চেষ্টা করেন।[১০৯] ১৮১৮ সালের শেষে তাঁর সহমরণ-প্রথা-বিরোধী প্রথম পুস্তিকাটির একটি ইংরাজী অনুবাদ তিনি রচনা করেন 'European gentlemen'দের জন্য। ওই বছরেই বিষয়টি সম্বন্ধে তাঁর প্রথম বাংলা পুস্তিকাটি প্রকাশিত হবার পরই সতীদাহ প্রথার যথার্থতা সম্বন্ধে হিন্দু পণ্ডিত ও ভদ্র-সমাজে বেশ তীব্র বাদানুবাদের সৃষ্টি হয়। রামমোহনের মতামতের বিরোধিতা করে জনৈক বিশিষ্ট পণ্ডিত একটি বাংলা পুস্তিকা প্রকাশ করেন—তার সঙ্গে একটি ইংরাজী অনুবাদও জুড়ে দেন। পুস্তিকাটির সমীক্ষা প্রসঙ্গে শ্রীরামপুরের ব্যাপটিষ্ট প্রচারকদের পত্রিকা 'The Friend of India' লেখেন: 'It is............among the first attempt yet made for three thousand years, to appeal to the public respecting the justice and propriety of practices, received as sacred by the Hindoos, from their being sanctified by antiquity'।[১১০] এক বছর পরে ১৮১৯ সালে রামমোহন বিষয়টির ওপর তাঁর দ্বিতীয় পুস্তিকাটি প্রকাশ করেন। "The

Friend of India' মন্তব্য করেন : 'we are happy to find that Rammohone-raya on whose late excellent pamphlet so humanely addressed to his own countrymen on this subject, this (উপরোক্ত বিশিষ্ট পণ্ডিত লিখিত পুস্তিকা) is intended as a most fierce attack, has prepared an answer thereto is his own language, with a view to its being circulated among such of his countrymen as still feel unwilling to give up this horrid custom. With an English translation of his reply to his pamphlet we trust he will soon favour the British public' ।[১১] রামমোহন 'The Friend of India'-র আশা পূর্ণ করেন। ১৮২০ সালের প্রথমেই দ্বিতীয় পুস্তিকাটির একটি ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত হয়। অনুবাদটি নিবেদিত হয় তদানীন্তন গভর্ণর-জেনারেল Lord Hastings-এর পত্নীর উদ্দেশে—কেন তা বলা বাহুল্য। এটা স্পষ্ট যে সহমরণ প্রথার প্রবর্তক ও নিবর্তক, উভয়েই নিজ নিজ যুক্তির দ্বারা বঙ্গদেশ-বসবাসকারী বিদেশী ভদ্রলোকদের এবং কোম্পানীর সরকারকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করেন, এবং বিদেশীরাও উৎসাহের সঙ্গে সহমরণ-বিষয়ক বাদানুবাদে যোগ দেন। ১৮২৯ সালে রামমোহন সহমরণ বিষয়ে আর একটি রচনা প্রকাশ করেন—এর এক বছর পূর্বে Bentinck গভর্ণর-জেনারেল হিসাবে ভারতে উপস্থিত হন। ১৮২৯ সালের ডিসেম্বর মাসে সহমরণ প্রথা নিষিদ্ধ হয়। পরের বছর রামমোহন প্রকাশ করেন তাঁর 'Abstract of the argument regarding the burning of widows considered as a re igious rite'। রচনাটির গোড়াতে তিনি লেখেন : 'Although the practic· itself has now happily ceased to exist under the Government of Bengal, nevertheless it seems still desirable that the substance of those publications should be condensed in a concise but comprehensive manner, so that enquirers may with little difficulty, be able to from a just conclusion, as to the true light in which this practice is viewed in the religion of Hindus'[১২]। রচনাটির উপসংহারে লেখক বলেন : 'We should not omit the present opportunity of offering up thanks to Heaven whose protecting arm has rescued our weaker sex from cruel murder, under the cloak of religion, and our character, as a people, from the contempt and pity with which it has been

regarded, on account of this custom, by all civilized nations on the surface of the globe'।[১১৩] রামমোহন পরিচালিত সংবাদপত্র 'সম্বাদ কৌমুদী,'-ও সহমরণ প্রথার বিরোধিতায় একটা বড় ভূমিকা গ্রহণ করে।

রামমোহন বা তাঁর গোষ্ঠীর কথায় কান দেবার মানুষের সংখ্যা হিন্দু সমাজে যে তখন খুবই কম ছিল তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু এটাও সন্দেহাতীত যে রামমোহন গোষ্ঠী তাঁদের সাহসিকতা এবং নিষ্ঠার দ্বারা সমাজে একটা বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি করেন—সৃষ্টি করেন সংস্কারের অনুকূল একটা নৈতিক, যুক্তিসহ লড়াকু পরিবেশ, যা ধীরে ধীরে বহু মানুষকে প্রভাবিত করে, এবং অকুণ্ঠিত ভাবে প্রশংসিত হয় বিদেশী মহলে।

Bentinck তাঁর আইন বলবৎ করার পূর্বে তাঁর স্বজাতীয় বিভিন্ন পদাধিষ্ঠিত ব্যক্তির মতামত গ্রহণ করেন। মতামত গ্রহণ করেন রামমোহনেরও। রামমোহনের কার্যকলাপের সঙ্গে তিনি পরিচিত ছিলেন। তিনি অবশ্যই জানতেন যে রামমোহনের অনুগামীর সংখ্যা অল্প, কিন্তু তাঁরা দুর্বল নন। এবং এটাও তাঁর বুঝতে কষ্ট হয়নি যে বঙ্গদেশের সংস্কারক গোষ্ঠীর শিরোমণি ছিলেন রামমোহন। Bentinck-রামমোহন সাক্ষাৎ সম্বন্ধে রক্ষণশীল 'সমাচার চন্দ্রিকা' (৮ আগষ্ট, ১৮২৯) মন্তব্য করেন: '২৭ জুলাই ইণ্ডিয়া গেজেট-নামক সমাচারপত্রেতে এই এক অশুভ সমাচার প্রচার হইয়াছে যে গবর্নরমেণ্ট এইক্ষণে সহমরণ নিবারণের চেষ্টাতে আছেন এবং এতদ্দেশীয় খ্যাত এক ব্যক্তি সকল নগরবাসির প্রতিনিধি হইয়া ঐ অনুচিত বিষয়ের প্রমাণ ও প্রয়োগ লিখিয়া সমর্পণ করিতে স্বীকার করিয়াছেন এবং তিনি মহামহিম শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন এবং শ্রীযুতও এই বিষয় নিবারণে নিতান্ত মানস প্রকাশ করিয়াছেন'।[১১৪] সহমরণ বিষয়টি নিয়ে রামমোহনের সঙ্গে পরামর্শ করার কোনো সাংবিধানিক বা প্রশাসনিক বা সামাজিক বাধ্যবাধকতা Bentinck-এর ছিল না। কিন্তু তবুও তিনি তা করেন। সেটা যেমন তাঁর উদারতা এবং বিচক্ষণতার পরিচায়ক, তেমনি, তা করে তিনি রামমোহনের কৃতিত্ব, নেতৃত্ব এবং আন্দোলনকে যথোপযুক্ত মর্যাদা এবং স্বীকৃতি দেন।

সতীদাহের সমর্থকেরা Bentinck-এর আইন রদ করার জন্য বিলাতে প্রিভি কাউন্সিলে আবেদন করেন। রামমোহনের বিলাত যাবার পরিকল্পনার নানা উদ্দেশ্যের মধ্যে সে আবেদনটির বিরোধিতা করাও ছিল অন্যতম। এই প্রসঙ্গে

'India Gazette' সম্পাদকীয় স্তম্ভে মন্তব্য করেন : 'In consequence of the Petition to Parliament got up by those natives who are opposed to the abolition of the rite of widow-burning., Ram Mohun Roy is taking to England a Counter-Petition, a copy of which he put into our hands before his departure with permission to publish it after he was gone', এবং আরও, 'the Counter-Petition of which Ram Mohun Roy is the bearer, and which will prove to the Legislature that when, in their enactments for the government of this country, they proceed on principles of just and enlightened policy, there is a class of natives, which we know to be steadily encreasing in number and influence, capable of appreciating their motives and intentions, and equally competent to understand the operation of measures which subserve private and party interests, but do not promote the public good'।[১১৫] বিলাতে বসে Bentinck-এর আইনের সমর্থনে রামমোহন যে একটি দীর্ঘ সমীক্ষা রচনা করেন তার শেষাংশে তিনি বলেন : 'Whence, it may be asked arose a practice so repugnant to reason, and so contrary to the most ancient, and highest legislative authority of the Hindoos ? Only (I reply) from the jealousy of their Princes who were unable to tolerate the idea of their wives proving forgetful of them, and associating with other men after their deaths, and their dependants were induced to follow their footsteps, actuated by the same motives, and also by the influence of example, while their surviving relations did not fail to encourage the practice, for the reasons above explained, to promote their own interests, and literary men of similar feelings have not been wanting, to support their views, by interpolations, and inventions, under the name of traditions'।[১১৬] ১৮৩২ সালের ৯ই জুলাই, Bentinck-এর বন্ধু Ravenshaw লণ্ডন থেকে Bentinck-কে লেখেন : 'After 3 days argument before the privy council, the petition against you for putting down suttee was dismissed yesterday to the no small gratification if one can be-lieve him of Ram Mohan Roy who was present all the time'।[১১৭]

পাঠকেরা বিচার করবেন রামমোহনের কার্যকলাপ সম্বন্ধে যা বলা হল, তা সমাজ সংস্কারের লক্ষণযুক্ত কিনা। রমেশচন্দ্রের মতে তা প্রকৃত সংস্কারের চেষ্টা বলে বিবেচিত হতে পারে না, কেননা সে চেষ্টার মধ্যে 'আপ্রাণ চেষ্টা'র লক্ষণ তিনি দেখতে পান নি। রমেশচন্দ্রের অজানা থাকার কথা নয় যে রামমোহনের বিরোধীরা তাঁর প্রাণনাশের চেষ্টা করেন। রামমোহনের অপরাধ নিশ্চয় খুব গুরুতর ছিল—না হলে দেশাচার, লোকাচার ইত্যাদির মহান ঐতিহ্যের বঙ্গদেশীয় ধারক, বাহক, এবং পোষকরা তাঁকে একেবারে খতম করার চেষ্টা করেন কেন। তাঁরা কি মনে করেন যে সতীদাহ নিবারণের মত দুষ্কর্মের বাহাদুরীটা প্রধানত রামমোহনেরই প্রাপ্য, Bentinck-এর নয়, বা, যে, Bentinck-কে রামমোহনই বিগড়ে দেন? রমেশ চন্দ্র কি বলেন?

রমেশচন্দ্র মনে করেন যে সতীদাহ নিবারণের জন্য অসন্তোষের কিছু বাষ্প উদ্গীরণ এবং বাকচাতুরী করা ছাড়াও রামমোহনের 'আপ্রাণ চেষ্টা' অর্থাৎ, আরও কিছু করা উচিত ছিল। প্রশ্ন হ'ল যে 'আরও'-টা কি? সরকারের ঘরে তিনি ধর্ণা দিতে পারতেন, বা সরকারী কর্তৃপক্ষকে ঘেরাও করতে পারতেন। তিনি কলকাতার রাজপথে সতীদাহ-বিরোধী মিছিল পরিচালনা করতে পারতেন, বা ময়দানে মহতী এক জনসভা আহ্বান করতে পারতেন। সত্যাগ্রহ, বা আমরণ অনশন করতে পারতেন। সশস্ত্র অভ্যুত্থানের চেষ্টা করতে বা লাটভবনের দোর গোড়ায় আগুনে আত্মাহুতি দিতে পারতেন—হয়ত তাহলেই তাঁর চেষ্টাকে 'আপ্রাণ চেষ্টা' বলা যেতে পারত। রমেশচন্দ্র হয়ত বলতে চান যে, তাঁর আরও 'radical' একটা কিছু করা উচিত ছিল। একটা বিশেষ ঐতিহাসিক পরিবেশে কোন একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি কি করেছিলেন, বা করতে চেষ্টা করেছিলেন; যা করেছিলেন তা কেন করেছিলেন এবং কি উপায়ে করেছিলেন, ইত্যাদি ব্যাপারের প্রকৃতি হৃদয়ঙ্গম করতে চেষ্টা করা এবং তার বিশ্লেষণ করাই ঐতিহাসিকের কাজ। তাঁর কি করা উচিত ছিল, সে প্রশ্নের স্থান 'sober history' তে নেই।

সতীদাহ নিবারণে Bentinck' এর ভূমিকার গুরুত্ব আলোচনা করার আগে ভারতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পরিস্থিতি সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে দুচারটে কথা বলতে চাই। সেই পরিস্থিতির আলোতেই, আমি মনে করি, Bentinck-এর অবদানের তাৎপর্য্য এবং মহত্ত্ব সম্যক হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষপাদ থেকেই, ভারতে আগত ইংরাজ শাসকদের

মধ্যে William Jones প্রমুখ কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তি ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও অনুরাগ প্রদর্শন করলেও, সাধারণভাবে ইংরাজরা ভারতীয়দের, বিশেষভাবে বৃহৎ হিন্দু সমাজের ধর্মকর্ম, আচার আচরণ, প্রথা পরম্পরা প্রভৃতির প্রতি একটা গভীর ঘৃণা ও অবজ্ঞার ভাব পোষণ করতেন। কিন্তু, সে গুলিতে কোনরকম হস্তক্ষেপ না করাই ছিল কোম্পানীর সরকারের মৌল প্রশাসনিক নীতি—কারণটা মূলত রাজনৈতিক। কোম্পানী তার সামরিক বাহিনীর সাহায্যেই তাদের ব্যবসা বানিজ্যের নিরাপত্তা ও রাজনৈতিক প্রাধান্য স্থাপন করে, এবং সে নিরাপত্তা ও প্রাধান্যের স্থায়ীত্বও নির্ভর করে তাদের সামরিক বাহিনীর শক্তি, আনুগত্য এবং তৎপরতার ওপর। সে বাহিনী গঠিত হয় প্রধানত দেশীয় হিন্দু ও মুসলমান সিপাহীদের দ্বারা। ফলে, তা, যেমন ছিল কোম্পানীর রাজনৈতিক শক্তির প্রধান অবলম্বন, তেমনি ছিল তার দুর্বলতারও মূলবিন্দু। ১৮২৯ সালে, অর্থাৎ পলাশীর সাফল্যের ৭০ বছর পরে, কোম্পানীর রাজনৈতিক প্রাধান্যের ভিত্তি যখন সুদৃঢ়, তখনও Metcalfe, ভারতে কোম্পানীর মূল সমস্যাটিকে বর্ণনা করে বলেন: 'Our government in India is not a national government, that can rely on the affections of its subjects......We retain our dominion only by a large military establishment ; and, without a considerable force of British troops, the fidelity of our native soldiery could not be relied on'।[১১৮] Bentinck-ও ওই একই মত পোষণ করতেন (দ্রষ্টব্য: সূত্র ১১৮)। সুতরাং, কোম্পানীর কোন ব্যবস্থা দেশীয়, হিন্দু ও মুসলমান প্রজাদের মধ্যে, বিশেষভাবে সামরিক বাহিনীতে, কোন প্রকার বিক্ষোভের সৃষ্টি না করে সে বিষয়ে কর্তৃপক্ষ নিরন্তর বিশেষ সজাগ থাকতেন। কিন্তু তবুও এই সাবধানী, নিরপেক্ষ, হস্তক্ষেপ না-করার নীতি অক্ষরে অক্ষরে পালন করা সম্ভব হয়নি। নানা প্রশাসনিক স্বার্থে, এবং মানবিকতার খাতিরেও বটে, তাঁদের মাঝে মাঝে হস্তক্ষেপ করতে হয়। সামরিক বাহিনীতে বিক্ষোভ ও বিদ্রোহও ঘটে। এবং বেশ বিব্রত হলেও তাঁরা সেগুলিকে দমন করতে সক্ষম হন। এইখানে, একটু পেছিয়ে গিয়ে, পরীক্ষা করা যেতে পারে (বিশেষ ভাবে) হিন্দুদের ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনে সরকারী হস্তক্ষেপের সমস্যাটিকে।

ব্রিটিশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী অবশ্যই একটা বাণিজ্যিক সংস্থা ছিল।

তারা ভারতে আসে ধনোপার্জনের আশায়, ভারতবাসীকে সেবা বা সভ্য করতে নয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত তারা মোটামুটি নীরবেই ব্যবসা বাণিজ্য করে। তারা উপলব্ধি করে যে ভারতবর্ষ একটা অতি বৃহৎ রত্নখনি।

'Shortly upon that shore there heaped was,
Exceeding riches and all pretious things,
The spoyle of all the world, that it did pas
The wealth of th' East, and pompe of Persian kings ;
Gold, amber, yvorie, perles owches, rings,
And all that else was pretious and deare......'
(Edmund Spenser—Faerie Queene. III, IV. 23)

ভারতে তাদের বাণিজ্যিক সাফল্যের অসীম সম্ভাবনা নিহিত আছে। সুতরাং, অসুবিধা, বাধা, বিপত্তি যতই থাকুক না কেন, তাদের বাণিজ্যিক স্বার্থকে সেখানে স্থায়ীভাবে কায়েম করতে তারা তৎপর হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে, ভারতের আভ্যন্তরীণ নৈরাজ্য তাদের লক্ষ্য সাধনের বিপুল সহায় হয়। ১৭৫৭ থেকে ১৭৯৯ সালের মধ্যে যে চমকপ্রদ সামরিক ও রাজনৈতিক সাফল্য তারা অর্জন করে, তার ফলে এদেশে তাদের শেকড় আরও গভীরে প্রবেশ করে। তাদের রাজনৈতিক প্রাধান্য প্রায় প্রশ্নাতীত হয়ে ওঠে। ক্রমশঃ, ভারতে তারা গড়ে তোলে এক বিশাল বাণিজ্যিক সাম্রাজ্য—বা, অর্থনৈতিক শোষণের সাম্রাজ্য।

তাদের নগ্ন ধনৈষণা কিন্তু দুটি ব্যাপারের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। প্রথমত, তারা ছিল ধর্মে খ্রীষ্টান—প্রটেসট্যান্ট খৃষ্টান। তাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে তারা একমাত্র সত্য ঈশ্বরে বিশ্বাসী, একমাত্র সত্য ধর্মের অনুগামী, উচ্চতর নৈতিক মানের পরিবাহক, এবং উন্নততর সভ্যতার অধিকারী। বস্তুত তারা মনে করত যে ভারতে তাদের সাফল্যের রহস্য নিহিত আছে, সত্য এবং সর্বশক্তিমান খৃষ্টান ঈশ্বরের ইচ্ছা এবং কৃপার মধ্যে। Clive আপাতদৃষ্টিতে ভারতে আগমন করেন ইংরাজ কোম্পানীর প্রতিনিধি হিসাবে, কিন্তু প্রকৃত তিনি এখানে আবির্ভূত হন খৃষ্টান ঈশ্বরের প্রতিনিধি রূপে। তবে অষ্টাদশ শতাব্দীর নবম দশক পর্যন্ত কোম্পানীর কর্মচারীরা ধর্মে খৃষ্টান হলেও, কর্মে ছিল বনিক—অর্থাৎ, ওই সময় পর্যন্ত, তাদের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক প্রত্যয়গুলির সঙ্গে তাদের অর্থনৈতিক স্বার্থ ও লক্ষ্য গুলিকে তারা গুলিয়ে ফেলেনি। দ্বিতীয়ত, তারা ছিল

জাতিতে ইংরাজ। তাদের একটা বিচিত্র জাতীয় 'ethos' ছিল—দীর্ঘদিনের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তারা শেখে জাতীয় জীবনে দেশের পার্লামেন্টের অভিভাবকত্ব মেনে নিতে, তার প্রাধান্যের কাছে নত হতে, তার ভ্রূকুটিকে ভয় করতে। কোম্পানীর ভারতীয় কর্মচারীরা ছিলেন কোম্পানীর লণ্ডনস্থিত পরিচালকদের নিয়ন্ত্রণাধীন। আবার কোম্পানীর ভারতনীতির ওপর তাঁদের দেশীয় আইনের নিয়ন্ত্রণ ছিল যথেষ্ট। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে কোম্পানীর ভারতীয় প্রশাসন ও বাণিজ্যনীতির ওপর পার্লামেন্টের নিয়ন্ত্রণ ধাপে ধাপে বৃদ্ধি পায়। কোম্পানীর কর্মচারীদের রাজনৈতিক অবিমৃষ্যকারিতা, দুর্নীতি, ভারতীয়দের প্রতি অবিচার, অত্যাচার প্রভৃতির ওপর পার্লামেন্টের কড়া নজর থাকত। প্রকৃতপক্ষে, ভারতে ইংলণ্ডের বাণিজ্যিক স্বার্থ সমৃদ্ধ ও স্থায়ী হক, এটা একটা জাতীয় বাসনায় পরিণত হয়। এবং এই জন্যই, ১৭৫৭ সালের পর থেকে একনাগাড়ে ভারতে কোম্পানীর শক্তিবৃদ্ধি ঘটলেও, ইংলণ্ডের শাসকরা এবং কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ তাদের বিপুল সংখ্যক ভারতীয় প্রজাদের দ্বারা একটা প্রচণ্ড-প্রক্রিয়ায় ভারত থেকে উৎপাটিত হবার আশঙ্কা থেকে কখনই মুক্ত হতে পারেন নি।

১৭৫৭ সালের পর ভারতীয় ইংরাজ বণিক-শাসকরা,—কোম্পানীর ইংলণ্ডীয় কর্তৃপক্ষের পোষকতায়, বঙ্গদেশে একটা বেপরোয়া দস্যুতা ও শোষণের রাজত্ব কায়েম করে। ফলে দেশীয় মানুষের জীবনে নেমে আসে একটা বিষম বিপর্যয়। অবশ্য তারজন্য ইংরাজদের খৃষ্টান বিবেক বিন্দুমাত্র বিব্রত হয় না। শতাব্দীর শেষভাগে শুরু হয় ওই অবস্থার বিরুদ্ধে একটা প্রতিক্রিয়া—শুরু হয় ওই দুঃশাসনের অবসান ঘটানোর চেষ্টা। এ বিষয়ে পার্লামেন্টে যে ক্ষুব্ধ আলোচনা হয়, তার মূল কথা ছিল দুটি। প্রথমত, ব্রিটিশদের জাতীয় মানমর্যাদা, তাদের ন্যায়পরায়ণতা এবং রাজনৈতিক দায়িত্বশীলতার জাতীয় ঐতিহ্য কোম্পানীর ভারতশাসনের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। একদল লোভী, উৎপীড়ক, দায়িত্বহীন কর্মচারীকে সে ঐতিহ্য অবজ্ঞা করতে দেওয়া যেতে পারে না। ভারতবাসীর প্রতি ইংলণ্ডের একটা দায়িত্ব ও কর্তব্য আছে। সেই দায়িত্ব এবং কর্তব্যের দিকে দৃষ্টি রেখে কোম্পানীর ভারতীয় শাসনকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করা দরকার যাতে কোম্পানীর বাণিজ্যিক সমৃদ্ধি এবং ভারতীয় প্রজাদের সুখ-সমৃদ্ধি দুই-ই এক সঙ্গে ঘটতে পারে। অর্থাৎ, দেখা যায় যে ভারতশাসন ক্ষেত্রে কতকগুলি ইংরাজদের ব্যক্তিগত দাপট ও প্রাধান্যের অবসান ঘটিয়ে, ব্রিটিশ জাতীয়

সরকারের নৈর্ব্যক্তিক আইনের-শাসন প্রতিষ্ঠা করার উদ্যোগ শুরু হয়। দ্বিতীয়ত, একটা রক্ষণশীল ভাবতত্ত্ব প্রচার করা হয়। হিন্দুদের ধর্মীয় ও সামাজিক রীতিনীতির প্রকৃতি যাই হক না কেন, তাদের মত একটা প্রাচীন জাতির ধর্মে কর্মে হস্তক্ষেপ করার অধিকার ইংলণ্ডের মত একটা অর্বাচীন জাতির থাকতে পারে না: 'India might have her faults, he (Burke) declared, "but God forbid we should pass judgement upon a people who formed their laws and institutions prior to our insect origins of yesterday!"'[১১৯] 'India had to be governed according to Indian experience and tradition, lest the fabric of Indian society be destroyed'।[১২০] বিজিত, দুর্গত ভারতবাসীকে রক্ষা করার, তার প্রতি ন্যায়বিচার করার দায়িত্ব ইংরাজদের আছে, কিন্তু তার সংস্কারগুলিকে ধ্বংস করে, তাকে ধুয়ে মুছে সভ্য করার অধিকার তাদের নেই। এই রক্ষণশীল উদারতা ও অচ্ছিত্বের পেছনে ভারতবাসীদের সম্বন্ধে যে একটা চাপা আশঙ্কা ছিল তা উপলব্ধি করা কঠিন নয়: হিন্দুদের ধর্মে কর্মে হস্তক্ষেপ করে, বা ইয়োরোপীয় ছাঁচে তাদের সভ্য করার চেষ্টা করে নিজের বিপদ ডেকে এনো না। তাদের সুখদুঃখের প্রতি দৃষ্টি রাখলে, তাদের প্রতি ন্যায় বিচার করলেই তারা ইংরাজ শাসনের প্রতি অনুগত থাকবে।

বিংশ শতাব্দীর একজন ঐতিহাসিক, এই প্রসঙ্গে বলেন, 'The parliamentary debates during the trial of Hastings and the subsequent investigations into the affairs of the East India Company, and especially the speeches of the younger Pitt, Burke and Sheridan, give ample proof of the sudden emergence of imperial missionarism and dominant refrain of the white mans' burden'।[১২১] Burkeএর তত্ত্বদৃষ্টি ছিল অবশ্যই মহৎ, কিন্তু সীমিত। ইতিহাস সে কথা শুনেও শোনে না—তাকে সরিয়ে দিয়ে এগিয়ে যায়। ধনোপার্জনের আকাঙ্খার যেমন কোনো সীমা নেই, তেমনি শক্তি বিস্তারেরও সীমা নেই—প্রকৃতপক্ষে শক্তির বৃদ্ধি ঘটলেই, উপার্জন বৃদ্ধি পায়। তাছাড়াও, Burke-এর কথা হায়দর আলি বা টিপু সুলতান বা মারাঠা সর্দারদের কানে ঢোকে না। তাঁরাও, ধন এবং শক্তি, দুটির বৃদ্ধিতেই সমান আগ্রহী ছিলেন। সুতরাং তাঁদের প্রতিরোধ ধ্বংস না হলে কোম্পানীর সম্পদ, শক্তি, সাম্রাজ্য,

কোনটাই নিরাপদও নয়, স্থায়ীও হবে না। ১৭৯০ থেকে ১৮০৬ সালের মধ্যে মহীশূর সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়, আর মারাঠাদের ধ্বংস হতে সামান্ত বাকি থাকে। আরও অনেকে প্রায় বিনা প্রতিরোধেই আত্মসমর্পণ করে—কোম্পানীর আগ্রাসন এবং শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু ওই আশঙ্কা তবুও কাটে না। সামরিক বলে রাজনৈতিক প্রাধান্ত স্থাপিত হয় বটে, কিন্তু নৈতিক শাসন নয়। ভারতীয় প্রজাদের আনুগত্য অর্জন করার জন্ত তাই প্রয়োজন হয় Burke-এর তত্ত্বের চেয়ে উচ্চতর একটা ভাবতত্ত্বের উদ্ভাবন করার। সে দায়িত্ব প্রধানত গ্রহণ করে Clapham Sect। Lord Cornwallis-এর সময়েই Charles Grant (বড়) সে তত্ত্ব বেশ স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন: 'It remains for us to show how we shall be distinguished from those (পর্তুগীজ, ওলন্দাজ ও ফরাসী) nations in the history of mankind; whether conquest shall ever have been in our hands the means, not merely of displaying a government unequalled in India for administrative justice, kindness, and moderation; not merely of encreasing the security of the subject and prosperity of the country, but of advancing social happiness, of meliorating the moral state of men, and of extending a superior light, further than the Roman eagle ever flew'।[১২২] তিনি আরও বলেন: 'is it not reasonable, is it not necessary, to conclude that they (ভারতবাসীরা) were given to us, not merely that we might draw an annual profit from them, but that we might diffuse among their inhabitants, long sunk in darkness, vice and misery, the light and the benign influences of truth, the blessings of well-regulated society, the improvements and the comforts of active industry'?[১২৩] সেই একই কথা—ভারতবাসীর প্রতি ইংরাজ জাতির একটা দায়িত্ব ও কর্তব্য আছে, 'imperial missionarism'। লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্ত Grant পার্লামেন্টের কাছে যা সুপারিশ করেন, সংক্ষেপে তা হচ্ছে যে পার্লামেন্টের উচিত ভারতে পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞান ও ইংরাজী ভাষা প্রবর্তন করা, ভারতবাসীদের খৃষ্টধর্মের আলো বিতরণ করা এবং সে কাজদুটি সুষ্ঠু ভাবে সম্পন্ন করার

জন্ত প্রটেষ্ট্যান্ট পাদ্রীদের ভারতে প্রবেশ করায় ওপর থেকে সব নিষেধ থেকে তুলে নেওয়া। এই নতুন, সাম্রাজ্যিক ভাবতত্ত্বের প্রবক্তারা ইতিহাসে 'Evangelicals' নামে পরিচিত।

'Evangelicals'-দের মূল ভাবনাটা Grant-এর ভাষায় স্পষ্ট : 'what are the best means of perpetuating our empire there ?...... upon what general principles may we best hope to make our connection with that contry permanent, and as far as we can, indissoluble'।[১২৪] পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞান, এবং ইংরাজী ভাষা যে সে স্থায়ীত্বের অনুকূল হবে তাতে Grant-এর সন্দেহ ছিল না : 'To introduce the language of the conquerors seems to be an obvious means of assimilating the conquered people to them'।[১২৫] আর ভারতবাসীদের মধ্যে খ্রীষ্টধর্মের প্রচার সে উদ্দেশ্য সাধনের যে সমান সহায়ক হবে সে বিষয়েও কোম্পানীর কর্তৃপক্ষের অনেকের সন্দেহ ছিল না। এ বিষয়ে 'Evangelical' গভর্ণর জেনারেল Lord Teignmonth এর অভিমত সম্বন্ধে সাম্প্রতিক কালের একজন লেখক বলেন : 'Lord Teignmouth undertook "to prove that independent of every other consideration it is sound policy to encounrage Xn. Missions" which might create a class of Indians intimately bound to Britain by religious ties'।[১২৬] পথটা সোজা এবং খুবই কার্যকরী : ' "Only by christianising the natives can we stengthen and secure ourselves." The path of duty and policy is always the same।[১২৭] এক শতাব্দীরও আগে আর একজন বিশিষ্ট ইংরাজ লেখক বিষয়টি সম্বন্ধে মন্তব্য করেন : 'It was not merely the desire of the Directors as christian men, but it was their interest also, as rulers of a great empire, that the blessed religion of Jesus should make its way among the people—and the more rapidly, the better'।[১২৮]

'Evangelical'-দের অভিপ্রায়টার কোন নতুনত্ব ছিল না, ছিল তাদের উপায়টায়। তাঁরা একটা বিশ্বদৃষ্টির অধিকারী ছিলেন। পূত খ্রীষ্টধর্মের স্পর্শ দিয়ে পৃথিবী থেকে সব বর্বরতা দূর করাই ছিল তাঁদের ব্রত। ভারতীয় হিন্দুরা ছিল 'a race of men lamentably degenerate and base,

retaining but a feeble sense of moral obligation...governed by malevolent and licentious passions, strongly exemplifying the effects produced on society by great and general corruption of manners, and sunk in misery by their vices'।[১২৯] এই হিন্দুদের উদ্ধার করার জন্যই ঈশ্বর ইংরাজদের পাঠান ভারতবর্ষে। যুক্তিটা সহজ: হিন্দুরা প্রাচীন এবং ইংরাজরা অর্বাচীন হতে পারে; কিন্তু হিন্দুরা অসভ্য এবং ইংরাজরা সভ্য—'our religion is sublime, pure and beneficent. Theirs is mean, licentious and cruel' বলেন 'Evangelical' চূড়ামণি William Wilberforce।[১৩০] একটা অসভ্য জাতিকে সভ্য করার মহান দায়িত্ব যাঁরা গ্রহণ করেন, তাঁদেরও এটা দৈব অধিকার অসভ্যদের ধর্ম কর্মে হস্তক্ষেপ করা, তাদের ধর্মান্তরিত করা, তাদের চরিত্রের পরিবর্তন ঘটানো। 'abominable Hindus'-রা যদি একথা উপলব্ধি করে যে 'Evangelical' রা তাদের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল ছাড়া আর কিছু চায় না, তাহলে তারা ইংরাজ শাসনের প্রতি অনুগত হতে বাধ্য। ফলে লাভবান হবে উভয়পক্ষই। আধুনিক কালের একজন ঐতিহাসিক বলেন: 'The Evangelical had an almost Hebraic conviction that wordly success and power, although not to be striven for on their our accournt, attended the faithful pursuit of duty, and were instrumental in forwarding God's purposes in the world......Duty and self-interest were one. To educate and to evangelize was also to make the earth pour forth her abundance...The promotion of civilization and material prosperity in India would immensely further the original and continuing purpose of the British in the East: the great beneficiary would be British commerce.'।[১৩১]

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইয়োরোপীয় বণিকদের ভারতাগমনের ফলে ভারত নতুন করে পাশ্চাত্য জগতের ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত হয়। এই সংযুক্তি কালক্রমে ভারতে পরিবর্তনের একটা বিপুল আবর্ত সৃষ্টি করে। প্রথম থেকেই ওই বণিকরা নানাভাবে ভারতীয় জীবনকে প্রভাবিত করে—প্রকৃত পক্ষে তাদের উপস্থিতিটাই ভারতীয় জীবনে একটা পরিবর্তনের প্ররোচক হয়ে দেখা দেয়। আবার তাদের চরিত্রও ভারতীয় সাংস্কৃতিক প্রভাবে পরিবর্তিত হয়। অন্তদের

কথা এখানে ছেড়ে দেওয়া যাক। ব্রিটিশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাদশা জাহাঙ্গীরের আমল থেকেই ভারতে তাঁদের বাণিজ্য ঘাঁটি স্থাপন করে। ইংরাজ বণিকরা আসতেন তাঁদের দেশ থেকে 'sahib' রূপে, ফিরে যেতেন 'nabob' হয়ে। অর্থাৎ অসভ্য ভারতে এসে সভ্য ইংরাজরা অসভ্য হয়ে যেতেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে, বঙ্গবিজয়ের পর 'sahib'-দের এই 'nabob' হওয়াটা খুবই উৎকট হয়ে দেখা দেয়। নৈতিক এবং রাজনৈতিক, দুটি কারণেই 'nabob'-রা নিজেদের দেশে ঘৃণা, অবজ্ঞা এবং ব্যঙ্গের পাত্র হন। ইংলণ্ডের সমাজে এই ধারণাই সৃষ্টি হয় যে 'nabob'-রা ভারতে তাঁদের অসদুপায়ে অর্জিত ধনৈশ্বর্যের জোরে ব্রিটিশ সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনকে দূষিত করে। ভারতে যারা ছিল একদল গৃধ্নু, অখৃষ্টান, উৎপীড়ক—এক একটি ক্ষুদে 'despot', তারা যে ইংলণ্ডের পরম্পরাগত রাজনৈতিক উদারনীতি, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, ধর্মপরায়ণতা, ন্যায়পরায়ণতা, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ প্রভৃতি জাতীয় বৈশিষ্ট্যগুলিকে নষ্ট করে দেবে, এই আশঙ্কা ইংলণ্ডে ব্যাপকভাবে অনুভূত হয়। চেষ্টা করা হয় ব্রিটিশ রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনকে ওই সব বণিক 'nabob' দের প্রভাব থেকে মুক্ত রাখার। পার্লামেণ্টে এই নিয়ে দীর্ঘ আলোচনার সূত্রপাত হয়—বিশেষভাবে Warren Hastings এর 'impeachment' কে কেন্দ্র করে। 'nabob' দের উৎপাত সম্বন্ধে Burke পার্লামেণ্টকে হুঁশিয়ার করে দেন: 'all the corrupt wealth of India, acquired by the oppression of that country, for the corruption of all liberties of this······Today, the Commons of Great Britin prosecute the delinquents of India.—To-morrow the delinquents of India may be the Commons of Great Britain।'[১৩২]। কিন্তু Burke-এর দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে একটা অসঙ্গতি ছিল। তিনি বিশ্বাস করতেন ন্যায়পরায়ণতার বিশ্বআদর্শে, বিশ্বপ্রয়োগে—তা, তাঁর মতে, বিভাজ্য হতে পারে না। তিনি চান সভ্য, খ্রীষ্টান ইংরাজরা ভারতে সভ্য খৃষ্টানোচিত ব্যবহার করবে—তাদের জাতীয় রাজনৈতিক উদারতা, আইনানুবর্তিতা, ন্যায়পরায়ণতা প্রভৃতির পরিবাহক হিসাবে তারা ভারতে ন্যায়ের শাসন প্রবর্তন করবে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ভারতবাসীদের ধর্মে কর্মে হস্তক্ষেপ করা, অর্থাৎ, তাদের ওপর ইয়োরোপীয় ধর্ম ও সংস্কৃতি চাপিয়ে দেওয়ার ঘোর বিরোধী ছিলেন। অর্থাৎ, তিনি আংশিকভাবে

ভারতকে ইংলণ্ডের সঙ্গে যুক্ত করতে চান, আবার আংশিকভাবে তাকে ইংলণ্ডের প্রভাব থেকে মুক্ত রাখতে চান। হিন্দুদের দেশে ন্যায়ের শাসন প্রবর্তিত করব, অথচ তাদের ধর্মে কর্মে হস্তক্ষেপ করব না; হিন্দুদের পরিবর্তন করার চেষ্টা থেকে নিবৃত্ত থাকব, অথচ হিন্দুদের দেশে, তাদের রাজনৈতিক শক্তিহীনতা এবং ধর্মের ও সমাজের কলুষিত পরিবেশে খৃষ্টান ইংরাজদের অপরিবর্তিত রাখব, অর্থাৎ 'sahib'-দের 'nabob' হতে দেব না—এসব অবাস্তব কথা। ভারতবাসীরা যদি প্রকৃত তাদের রাজনৈতিক ও সামাজিক শক্তি বজায় রাখতে সমর্থ হত, তাহলে, তাদের ধর্মে কর্মে বিদেশী বণিকদের হস্তক্ষেপ করার কোনো প্রশ্নই উঠত না, হয়ত তাদের সরে পড়তে হত। এইখানেই 'conservative' Burke-এর সঙ্গে 'Evangelicals' দের পার্থক্য। ইংরাজরা যদি সভ্য ও উন্নত জীবনের অধিকারী হয়, ন্যায়পরায়ণতাই যদি তাদের স্বভাবসিদ্ধ হয়, যদি তারা প্রকৃত খৃষ্টান হয়, তাহলে তাদের পক্ষে অসভ্য, অনুন্নত, অখৃষ্টান, মূঢ়, দুর্নীতির পঙ্কে নিমজ্জিত হিন্দুদের উদ্ধার না করা, অর্থাৎ, তাদের চরিত্রের পরিবর্তন না করা, বা তাদের ধর্মে কর্মে হস্তক্ষেপ না করা, অধর্ম, অমানবিক, অখৃষ্টানোচিত ব্যবহার। 'Evangelical'দের কথা হচ্ছে, তাঁরা যদি হিন্দুদের সভ্য করার কাজ থেকে বিরত থাকেন, তাহলে তাঁরা যেমন তাঁদের ঈশ্বর প্রদত্ত দায়িত্ব পালনে অবহেলা করবেন, তেমনি 'sahib' দের 'nabob' হওয়া বন্ধ করতে পারবেন না। দেখা যায় যে Burke যখন ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টে তাঁর বক্তৃতা দিতে ব্যস্ত, তখন ভারতে Cornwallis তাঁর প্রস্তাবকে কার্যকরী করতে গিয়ে (হয়ত) অজ্ঞাতসারে 'Evangelical' দের কর্মসূচীর গোড়া পত্তন করেন।

বণিকরাও ধনোপার্জনের জন্যই বাণিজ্য করতে নামেন। কিন্তু ধনোপার্জন করার মানেই অখৃষ্টানোচিত ব্যবহার করা নয়। প্রকৃতপক্ষে, ধনৈষণা এবং ঈশ্বরৈষণার মধ্যে কোনো বিরোধ নেই—'God' এবং 'mammon', উভয়কেই এক সঙ্গে আরাধনা করা যায়। এটাই জীবনের সহজ সাধনা: 'the laws of God are so happily adjusted that, in benefiting the natives, we benefit ourselves'।[১৩৩] একেই বলে প্রটেষ্ট্যাণ্ট খৃষ্টধর্মের 'holy worldliness'-এর আদর্শ। 'Evangelical' রা Burke-এর আধাখেঁচড়া প্রস্তাব বাতিল করে, ভারতকে ইংলণ্ডের, তথা পাশ্চাত্য জগতের ঐতিহাসিক আবর্তে এনে ফেলার উদ্যোগে আত্মনিয়োগ করেন। 'Evangelical'-রাও

ভারতে এক 'despotism' এর প্রবর্তন করেন, তবে সেটা নির্ভেজাল খৃষ্টান 'humanitarian despotism'—'imperial missionarism'-এর এক সংশোধিত সংস্করণ।

'Evangelical' কর্মসূচী রূপায়ণের প্রকৃত দায়িত্ব গ্রহণ করেন 'Evangelical' পাদ্রীরা। তাঁদের উদ্যোগের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক লক্ষ্যদুটি ছিল পরস্পরের পরিপূরক। সে বিষয়ে তাঁরা বেশ স্পষ্টবাদীও ছিলেন। পাদ্রী William Carey মনে করেন : 'every Indian convert...becoming a firm friend of British rule'[১৩৪]। পাদ্রী Henry Townly আরও স্পষ্ট: '...every convert to Christianity will rally round the British sceptre and feel his temporal security and happiness indentified with the stability of the rulers............principles of Christianity ...bind the conscience of every one to submit to the rulers whom God in his providenc has placed over them ; whether such rulers be of foreign extraction, or their own fellow-countrymen. The language of scripture is "Submit yourselves to every ordinance of man for the Lord's sake, whether it be to the king, as supreme ; or unto governors, as unto them that are sent by him for the punishment of evil-doers" (I Pet ii, 13-14)"[১৩৫]

তবুও, পাদ্রীদের ৪০ বছরের তৎপরতা সত্ত্বেও ১৮৩৩ সালে বঙ্গদেশে (খুব সম্ভব শুধু প্রটেষ্টাণ্ট মতাবলম্বী) খৃষ্টানদের সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ায় মোটামুটি ১৪০৬তে।[১৩৬] 'Evangelical' পাদ্রী এবং প্রশাসকেরা যেটা ঠিক বুঝতে পারেন নি, সেটা হচ্ছে যে কোম্পানীর ভারতীয় প্রজাদের 'firm friend of British rule'-এ পরিণত করার সম্ভবত বেশী কার্যকরী, অন্য উপায়ও একটা ছিল। ধরা যাক, বঙ্গদেশের গোমস্তা, মুন্সী, বেনিয়ান, ব্যবসায়ী, জমিদার বাবুদের কথা। এঁরা সকলেই কোম্পানীর সাহায্যে, সহযোগে এবং কৃপায় বিপুল জাগতিক ঐশ্বর্য ও সামাজিক মর্যাদা অর্জন করেন, সকলেই 'firm friend of British rule' ছিলেন। বঙ্গদেশে বা ভারতবর্ষে কারা খ্রীষ্টান হয় এবং কেন হয়, সে সব প্রশ্নের আলোচনা এখানে অবান্তর। আসল কথা অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বিশেষভাবে পশ্চিম ইয়োরোপে, Burke-এর মত 'Evangelical'-রাও একটা বৌদ্ধিক ও ভাবতাত্ত্বিক সংগ্রামে লিপ্ত হন—ফরাসী 'Enlightenment'-এর বিরুদ্ধে। কিন্তু ফরাসী বিপ্লবকে ঠেকানো যায় না,

ঠেকানো যায় না বিপ্লবী ফরাসী দেশের 'dechristianisation'কে, ইংলণ্ডের শিল্প বিপ্লবকেএবং 'Adam Smith'-এর অর্থতত্ত্বকে। মানুষ যখন তার নিজের ধীশক্তির আলোতে বিশ্বলীলার রহস্য উন্মোচন করতে সক্ষম বলে নিজেকে মনে করে, তার প্রয়োগ-পটুতা ও প্রতিভা যখন মানুষের পার্থিব জীবনে অনন্ত সুখ সমৃদ্ধির সম্ভাবনাকে সূচিত করতে পারে, এবং তার সহজ ন্যায়-অন্যায় বোধ যখন সমাজে ন্যায়ের, প্রীতির এবং সহযোগিতার শাসন প্রতিষ্ঠা করতে উদ্যোগী হয়, তখন ঈশ্বর নামক 'hypothesis'টির প্রয়োজনে বিশ্বাস করা মানুষের কাছে গৌণ হয়ে পড়ে। তখন প্রচলিত ধর্মান্ধতা বা মানুষের জীবনে ঈশ্বরের আধিপত্যের তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টাও এক ধরণের 'despotism'—আধ্যাত্মিক 'despotism'। আবার কোম্পানীর বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকারকে বহাল রাখার চেষ্টার অর্থ, অন্য ব্যবসায়ীদের বাণিজ্য করার স্বাধীনতা হরণ করা, তাদের বাণিজ্যিক প্রতিভাকে নিষ্পিষ্ট করা, এবং সমাজে ধন ও সমৃদ্ধির বৃদ্ধিকে সংকুচিত করা। 'Mercantilism'ও এক ধরণের 'despotism'—অর্থনৈতিক 'despotism'। অষ্টাদশ শতাব্দীর পশ্চিম ইয়োরোপীয় 'Enlightenment', শিল্প বিপ্লব, অবাধ বাণিজ্যনীতি এবং 'Utilitarianism' উনবিংশ শতাব্দীর প্রভাতকালেই ইংলণ্ডের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনে পরিবর্তনের একটা মৃদু আলোড়ন সৃষ্টি করে। এর সঙ্গে, Napoleon-এর ধ্বংস ইংলণ্ডের জাতীয় মর্যাদা ও শক্তি বৃদ্ধি করে। বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী এবং সমৃদ্ধ জাতি হিসাবে ইংরাজরা তখন বিশ্বের অভিভাবকত্ব গ্রহণে তৎপর হয়।

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকেই ইংলণ্ডে সংস্কারের একটা প্রবল ঝড়ের সূচনা দেখা দেয়। যে রাজনৈতিক ও সমাজ চিন্তা সে ঝড়কে দিগাভিমুখী করতে চেষ্টা করে তা হচ্ছে 'utilitarianism'। ইংলণ্ডে 'utilitarianism-এর গুরু ছিলেন Jeremy Bentham—জন্ম ১৭৪৮ সালে। ঘোর যুক্তিবাদী এবং কড়াকু দৃষ্টবাদী, 'তিনি ঈশ্বরে অবিশ্বাস করিতেন বলিলে কম বলা হয়, তিনি না-ঈশ্বরে বিশ্বাস করিতেন'।[১০৭] একজন আধুনিক ঐতিহাসিক মন্তব্য করেন: 'The Utilitarians, completing the work of their intellectual ancestors abolished God and substituted human for Divine Justice'।[১০৮] Bentham-এর মতে 'natural law' বস্তুটি একটা আজগুবী ব্যাপার। 'Law' মানুষের তৈরী, মানুষের ব্যবহারিক জীবনের প্রয়োজন থেকেই তার সৃষ্টি, মানুষের সুখ,

সমৃদ্ধি ও শান্তির সহায় হওয়াই তার পরম লক্ষ্য। মানুষ সমাজবদ্ধ হয়ে বাস করলেও কার্যত নিজের নিজের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধিতে লিপ্ত—আর সে অধিকারও তার আছে। এই অবস্থায় একটা সামাজিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হওয়ার স্বাভাবিক আশঙ্কা থাকে। তাই তা রোধ করার জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত আইন ও শাসন। সে আইন সমাজে ব্যক্তির অবাধ স্বার্থান্বেষণকে স্বভাবতই নিয়ন্ত্রিত করবে। এমতাবস্থায় দেশের আইন ও শাসন সমাজে ব্যক্তিদের পারস্পারিক সম্পর্কগুলি এমন ভাবে বিন্যস্ত করবে যাতে সে নিয়ন্ত্রণের পরিমাণ হয় ন্যূনতম, এবং প্রত্যেক ব্যক্তি সর্বাধিক পরিমাণে তার নিজের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করতে সমর্থ হয়। এইটাই হওয়া উচিত সমাজ এবং রাষ্ট্রের লক্ষ্য: 'Social aims were...the arithmetical sum of individual aims. Happiness...was each individual's supreme object ; the greatest happiness of the greatest number, was plainly the aim of society।'[১৩] Utilitarian-দের বীজমন্ত্র ছিল 'improvement'। তাঁদের চিন্তা ও কর্মসূচী ছিল নিরেট যুক্তিধর্মী, মানবতাবাদী, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য-বাদী, এবং প্রায়োগিক। সহজ কথায় তাঁদের মতে যে কোন শাসনতন্ত্রের যথার্থতা প্রতিপাদিত হয় তার কার্যকারিতায় দ্বারা—অর্থাৎ, সমাজের প্রত্যক্ষ সমস্যাগুলির কার্যকরী ও আশু সমাধানের, এবং মানুষের সুখ, শান্তি ও নিরাপত্তা সাধনের দ্বারা। কোনো সামাজিক প্রথা ও ব্যবস্থা, আচার বিচার, ভাব ভাবনা, যদি বর্তমান কালে মানব কল্যাণের অনুকূল না হয়, তাহলে, তা যতই প্রাচীন, পূত ও পরম্পরা-সিদ্ধ হক না কেন, অর্থহীন, অমানবিক এবং আইনের দৃষ্টিতে অসিদ্ধ ; সুতরাং বর্জনীয়। যে আইন যুক্তিসিদ্ধ, এবং যার লক্ষ্য ব্যবহারিক, তা সর্বজনীনও বটে—অর্থাৎ, কি ইংলণ্ড, কি আমেরিকা, কি ভারত, সব দেশেই তা প্রযোজ্য। ভারতবর্ষের উন্নয়নের জন্য আশু প্রয়োজন সেখানকার আইনগুলির সংস্কার করা, প্রশাসনকে দক্ষ, নিরপেক্ষ ও নিয়মতান্ত্রিক করা, একটা ব্যবহারিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করা, অবাধ বাণিজ্যের আনুকূল্য করা ইত্যাদি। ভারতবর্ষের মত একটা অনুন্নত উপনিবেশকে তাঁদের কর্মসূচীর প্রয়োগক্ষেত্র করা ছিল ব্রিটিশ 'utilitarian'-দের অন্যতম লক্ষ্য। এ বিষয়ে বিশেষভাবে উদ্যোগী হন Bentham-এর বন্ধু ও সহযোগী এবং কোম্পানীর একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী James Mill। 'Evangelical'-দের ধর্মোৎসাহ সম্পূর্ণ বাতিল করে দিলেও ভারতবাসীর চরিত্র, ধর্ম কর্ম

প্রভৃতির ঘোর নিকৃষ্টতা সম্বন্ধে তাঁদের সঙ্গে তিনি একমত ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, এ বিষয়ে 'Evangelical এবং 'utilitarian'-দের সাযুজ্য ছিল ঘনিষ্ঠ। কোম্পানীর ভারতনীতির ওপর Mill-এর যথেষ্ট প্রভাব ছিল: 'he had simplified the Indian question to three issues—the form of government, the nature of the laws, and the mode of taxation. Reform these, argued Mill, and the whole Indian society would undergo a vast transformation, setting it on a rapid advance up the scale of civilization'[38].

Bentham-Mill এর ঔপনিবেশিক পরিকল্পনা কার্যকর করার ভার পড়ে Munro, Elphinstone, Metcalfe, Bentinck, Macaulay প্রভৃতি ঔপনিবেশিক শাসক ও প্রশাসকদের ওপর। তাঁরা সকলেই 'utilitarian' তত্ত্বের দ্বারা প্রভাবিত হন, যদিও ঠিক কট্টর 'utilitarian' তাঁরা ছিলেন না—ছিলেন 'utilitarianism'-এর প্রতি গভীর ভাবে আকৃষ্ট 'whigs', 'liberals'। তাঁদের সমস্যাগুলি ছিল প্রত্যক্ষ। সেগুলির তাঁরা মোকাবিলা করেন অবশ্যই প্রধানত উদারপন্থী 'utilitarian' হিসাবে, কিন্তু তাঁদের সতর্ক দৃষ্টি থাকে কোম্পানীর রাজনৈতিক স্থিতি ও নিরাপত্তা এবং অর্থনৈতিক স্বার্থের দিকে। 'Utilitarian'-দের ভারত নীতির মৌল অসঙ্গতিটা Bentham ও Mill-এর চোখে সম্ভবত স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। একজন বিশিষ্ট ঐতিহাসিক লেখেন: 'Bentham was the disciple of Adam Smith and up to the end of his life stood as an adversary of the colonial system : when he became a Radical, his economic objections were reinforced by political objections against a system which handed over the colonists to the mercy of functionaries sent out by the metropolis. Yet England was preserving a part of her colonial empire and founding new colonies. Were Bentham and his disciples going to demand that all the colonies should be abandoned ? Colonisation is a fact before which their logic capitulated ; and besides the logic of their system is double : in so far as their philosophy advocates the artificial and despotic identification of interests, might they not be tempted to consider the colonial empire as a vast field for experiments in philanthrophy and reform ? Bentham had always dreamed of making laws for India :

now that James Mill occupied an important post in the India Company, might not his dream become a reality? "I shall be the dead legislative of British India. Twenty years after I am dead, I shall be a despot." Twenty-eight years after his death the Indian penal code came into force; it had been drawn up by Macaulay under the influence of Bentham's and James Mill's ideas, so that Bentham, who had failed to give a legal code to England, did actually become the posthumous legislator of the vastest of her possesions।[১৪১] অসঙ্গতিটা দেখতে পান স্থানীয় শাসকেরা।

তাঁদের মূল সমস্যা ছিল 'colonialism' এবং 'liberalism', এই দুটিকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করা। তাঁদের আশা ছিল যে ওই অসম্ভব কাজটাকে সম্ভব করতে পারলে উপনিবেশিক রাজনৈতিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা এক বিচিত্র ঈঙ্গ-ভারতীয় জাতকের সৃষ্টি করতে পারে। তাঁদের সমস্যা—প্রকৃতপক্ষে আশঙ্কা, কি ছিল? আবার Metcalfe-এর ভাষায়: 'Our dominion in India is by conquest; it is naturally disgusting to the inhabitants, and can only he maintained by military force'।[১৪২] আবার, 'It is the curse of a government over a conquered country, that it cannot trust the people. Our subjects are internal enemies, ready at least for change, if not ripe for insurrection'।[১৪৩] Metcalfe-এর সমাধান কি ছিল? 'If is our positive duty to render them justice, to respect and protect their rights and to study their happiness. By the performance of this duty, we may allay and keep dormant their innate disaffection'।[১৪৪] সহজ কথায় কোম্পানীর ভারতীয় প্রজারা কোম্পানীর বন্ধু হতে পারে না, কিন্তু তবুও, পাশ্চাত্য সভ্যতা, ব্রিটিশ উদার-নীতি, আইনের শাসন প্রভৃতি আশীর্বাদী থেকে তাদের বঞ্চিত করা হবে অব্রিটিশ কাজ। সে আশীর্বাদী তাদের ওপর বর্ষণ করার নীতিগত বাধ্যবাধকতা যাই থাক না কেন, তা যে সমসাময়িক পরিস্থিতিতে কার্যকর, এবং ভবিষ্যতের পক্ষেও নিরাশাজনক নয়, এরকম একটা প্রত্যয় তাঁরা নিজেদের মনে সৃষ্টি করেন। এটি একটি অভিনব সমাধান। Macaulay সংক্ষেপে সেটিকে ব্যক্ত করেন: 'We have to engraft on despotism those blessings

which are the natural fruits of liberty'।[১৪৪] Bentinck ব্যাপারটাকে বেশ পরিষ্কার করে বলেন শতাব্দীর একেবারে গোড়াতে মাদ্রাজের গভর্ণর হিসাবে (দ্রষ্টব্য : সূত্র ১৪৫)। 'Despotism' এবং 'liberalism-এর এই বিচিত্র সমন্বয়ের একটা নিদর্শন মেলে ১৮৩৩ সালের 'Charter Act'-এ : 'the Act…expressly provided that no native or natural-born subject of the Crown resident in India should be by reason only of his religion, place of birth, descent, colour, or any of them be disqualified for any place in the Company's service'।[১৪৬] এ নীতি কতদূর কার্যকর করা হয় তা পরবর্তী কালের ইতিহাস প্রমাণ করে। Macaulay প্রকৃতপক্ষে, যে শাসনের সুপারিশ করেন তাও কার্যত, এক ধরণের 'despotism'— সাম্রাজ্যিক আমলাতন্ত্র এবং অবাধ বাণিজ্যের সম্মিলিত 'despotism'।

উদারচেতা, ভারতবাসীর কল্যাণকামী ইংরাজ প্রশাসকদের আত্মবিশ্বাসের অভাব ছিল না কিন্তু নিজেদের নীতির স্ববিরোধটি লক্ষ্য করে তাঁরা বেশ কিছুটা বিভ্রান্ত বোধ করেন। 'Evangelical'-রা ভারতে তাঁদের 'spiritual philanthropy'র উপযোগিতা সম্বন্ধে যতটা নিশ্চিত ছিলেন, 'utilitarian'-রা তাঁদের 'secular philanthropy'-র উপযোগিতা সম্বন্ধে ততটা নিশ্চিত হতে পারেন নি। সাম্রাজ্য হারাবার আশঙ্কা ছিল তাঁদের বেশী—কেননা তারা ছিলেন সে যুগের সাচ্চা 'liberal'। তবুও ভারতীয় প্রজাদের আনুগত্য অর্জনের জন্ত সেই পথেই তাঁরা অগ্রসর হন।

কিন্তু শক্তিমানেরই ভয় থাকে শক্তি হারাবার। আর সে শক্তি যদি অবদমিত অপরাধবোধে তাঁর আত্মাকে কখন পীড়িত করে, তখন তাঁর বুদ্ধি ও বিবেক খোঁজে সে শক্তির একটা নৈতিক যথার্থতা ও অবলম্বন। কখন কখন তিনি ভাবালু ভবিষ্যবেদীতেও পরিণত হন। শোনা যাক এই প্রসঙ্গে Macaulayর কথা : 'we shall never consent to administer the pousta to a whole community, to stupefy and paralyse a great people whom God has committed to our charge for the wretched purpose of rendering them more amenable to our control. What is power worth if it is founded on vice, on ignorance, and on misery ; if we can hold it only by violating the most sacred duties which as governors we owe to the governed, and which,

as a people blessed with far more than an ordinary measure of political liberty and of intellectual light, we owe to a race debased by three thousand years of despotism and priestcraft? We are free, we are civilised, to little purpose, if we grudge to any portion of the human race an equal measure of freedom and civilisaton.

'Are we to keep the people of India ignorant in order that we may keep them submissive? Or do we think that we can give them knowledge without awakening ambition? Or do we mean to awaken ambition and to provide it with no legitimate vent? Who will answer any of these questions in the affirmative? Yet one of them must be answered in the affirmative, by every person who maintains that we ought permanently to exclude the natives from high office. I have no fears. The path of duty is plain before us: and it is also the path of wisdom, of national prosperity, of national honour.

'......It may be that the public mind of India may expand under our system till it has outgrown that system; that by good government we may educate our subjects into a capacity for better government; that having become instructed in European knowledge, they may, in some future age, demand European institution. Whether such a day will ever come I know not. But never will I attempt to avert or to retard it. Whenever it comes, it will be the proudest day in English history. To have found a great people sunk in the lowest depths of slavery and superstitions, to have so ruled them as to have made them desirous and capable of all privileges of citizens, would indeed be a title to glory all our own. The sceptre may pass away from us. Unforeseen accident may derange our most profound schemes of policy. Victory may be inconstant to our arms. But there are triumphs which are followed by no reverse. There is an empire exempt from all natural causes of decay. Those triumphs are the pacific triumphs of reason over barbarism; that empire is the imperishable empire of our arts and our morals, our literature and our laws.'। [১৪৭]

এরকম স্বপ্ন Bentinck-ও দেখেন একটা অন্য প্রসঙ্গে একটু কম উদ্দীপনার সঙ্গে। ভারতে ইয়োরোপীয়দের বসবাস সম্বন্ধে তাঁর মত তিনি ব্যক্ত করেন (দ্রষ্টব্য সূত্র ১৪৭)। তখনও যাঁরা মনে করতেন 'It is easy to govern the Hindus in their ignorance', Macaualy দেখিয়ে দেন তাঁদের দৃষ্টির সঙ্কীর্ণতাকে। অবশ্য Macaulay যদি জানতে পারতেন পঞ্চাশ বছর বাদে ভারতবাসীরা কি চাইতে পারে, তাহলে ১৮৩৩ সালে পার্লামেন্টকে তিনি কি পরামর্শ দিতেন তা বলা কঠিন। তবে Macaulay ছিলেন তাঁর নিজের আমলের মানুষ, এবং তাঁর এই 'imperial sentimentalism'-এর অংশীদার ছিলেন তখন ভারতে ইংরাজ শাসকবর্গের অনেকেই। অবশ্য এই 'sentimentalism' এর সঙ্গে 'pragmatism'-ও মেশান ছিল। ব্যাপারটা Macaulay-র ভগ্নিপতি, Charles Trevelyan স্পষ্ট করে দেন: 'The existing connectien between two such distant countries as England and India, cannot, in the nature things, be permanent : no effort of policy can prevent the natives from ultimately regaining their independence. But there are two ways of arriving at this point. One of these is through the medium of revolution ; the other, through that of reform. In one, the forward movement is sudden and violent ; in the other, it is gradual and peaceable. One must end in the complete alienation of mind and separation of interests between ourselves and the natives ; the other in a permanent alliance, founded on mutual benefit and good-will'।[১৪৮] মোট কথা, শালা ও ভগ্নীপতি মিলে উপনিবেশিক শাসনতন্ত্রের যে ব্যাখ্যা দেন, তাকে সংক্ষেপে বলা যায় 'imperial liberal missionarism'।

উনবিংশ শতাব্দী ইংলণ্ডের 'patriotism'-এর যুগ। দেশপ্রেমের সে উদ্দীপনার কিছু পরিচয় পূর্বেই দেওয়া হয়েছে Charles Grant এবং Macaulay-র ভাষায়। উনবিংশ শতাব্দীর সামরিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সাফল্য ইংলণ্ডকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতিতে পরিণত করে—তার প্রকৃত বিশ্বপ্রবেশ ঘটে সেই যুগে। স্বভাবতই এই জাতীয় বৃদ্ধি ও সমৃদ্ধি দেশের মানুষের মনে প্রবল গর্ব ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। পৃথিবীর অনুন্নত জাতিগুলিকে সভ্যতা-সংস্কৃতির পাঠ দেওয়া, তাদের উদ্ধার করা ইংলণ্ডীয় দেশপ্রেমের একটা প্রধান অভিব্যক্তি হয়ে দেখা দেয়। এবং সে কাজের জন্য তারাই যে পৃথিবীর যোগ্যতম জাতি এ ধারণা তাদের মধ্যে দৃঢ় হয়। তাদের এই বিশ্ব-

'missionarism'-এর দুএকটা নমুনা দেওয়া যেতে পারে। একজন ইংরাজ বলেন: 'I believe that England is intimately identified with that progressive perfection, and that on the permanent maintenance of her power is essentially dependent the welfare of mankind'[১৪৯]। আর একজন বলেন: 'There never was a country so evidently destined by Providence, so nobly endowed by nature, .with all the gifts requisite to make it the heart and soul of all the European colonies over the globe, as Great Britain'[১৫০]। ইংরাজদের এই জাতীয় মহত্ত্ববোধের এবং বিশ্বদায়িত্ব-চেতনার একজন প্রবক্তা ছিলেন Bentinck (দ্রষ্টব্য সূত্র ১৫০। প্রসঙ্গত, একজন ইংরাজ ধর্মযাজকের একটা উদ্দীপনাপূর্ণ ভাষণ এই একই সূত্রে দেখুন)। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদশক থেকে শুরু করে, সমগ্র উনবিংশ শতাব্দী ধরে এই 'imperial missionarism' এবং 'patriotism'-এর সমবায়ে রচিত হয় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ এবং উপনিবেশিক শাসননীতির ভাবতাত্ত্বিক বুনিয়াদটি। সম্প্রতি একজন লেখক বলেন, '...ideologically the Victorian desire was to improve the rest of the world by a programme of Christian regeneration to spread civilization on the British model, since this was the only God-ordained perfection open to mankind"[১৫১]।

অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীর ওই জাতীয় পরিবেশে Bentinck, ব্রিটিশ অভিজাত শাসক শ্রেণীর একজন হিসাবে, তাঁর কর্মজীবনে প্রবেশ করেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যিক ভাবতত্ত্ব ও কর্মসূচীর তিনি একজন বিশিষ্ট পরিবাহক ছিলেন, এবং পরিণত বয়সে, প্রায় সাত বছর ইংলণ্ডের এক বৃহৎ উপনিবেশের শাসনকর্তা হিসাবে সেখানে সেগুলিকে কার্যকর করার চেষ্টাই তার শ্রেষ্ঠকীর্তি।

ভারতীয় ইংরাজ শাসকেরা প্রথম থেকেই হিন্দুদের প্রচলিত বর্বর প্রথা এবং দুষ্টাচারগুলির ঘোর বিরোধী ছিলেন। কিন্তু সাধারণভাবে 'complete toleration in religion was a fundamental principle of the British Government'। এই নীতির জন্য দায়ী প্রধানত কোম্পানীর রাজনৈতিক পরিস্থিতি, এবং রক্ষণশীল নীতির প্রভাবও বটে। উনবিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকেই দেখা যায় যে ওই নীতির *ভিত্তি ক্রমশ শিথিল হয়ে* পড়ছে—কেন সে ইঙ্গিত আগেই দেওয়া হয়েছে। Lord Wellesley-ই

প্রথম বিষয়টি সম্বন্ধে একটা দৃঢ় মনোভাব গ্রহণ করেন, এবং হিন্দুদের কয়েকটি নিষ্ঠুর প্রথাকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে অধিষ্ঠিত কোম্পানীর ইংরাজ কর্মচারীদের মধ্যে তাঁর সমর্থকের অভাব ছিল না। তাঁদের মধ্যে অনেকেই উগ্র ব্যবস্থা গ্রহণের পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু তবুও নানা দ্বিধা, বাধা, আশঙ্কা এবং মূল নীতির কোন পরিবর্তন না ঘটার ফলে, ব্যাপারটা অগ্রসর হয় ধীরে, এবং তার সাফল্যও ঘটে মাত্র আংশিক ভাবে।

আগেই বলা হয়েছে সতীদাহ ঘটত বেশী বঙ্গদেশেই। কোম্পানীর অনেক উচ্চপদস্থ কর্মচারী, প্রথাটির ঘোর নিন্দা ও বিরোধিতা করেন। তাঁদের চেষ্টা ও চাপে, এবং 'Evangelical' আন্দোলনের প্রভাবে অবশেষে কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ ১৮১২ সালের ডিসেম্বর মাস থেকে প্রথাটিকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করেন। কিন্তু সে বাধানিষেধগুলি বিশেষ ফলপ্রসূ হয় না। এবং অভিযোগ ওঠে যে 'The Government and the Suddar Court were in fact getting into a dilemma by attempting to introduce justice and law into what was in itself the highest kind of illegality, the most palpable injustice, and the most revolting, cruelty'।[১৫২] প্রকৃতপক্ষে, সমস্যাটি খুবই কঠিন ছিল। ১৮১২ সালের সরকারী হুকুমনামার বলে যে সব বিধিনিষেধগুলি প্রবর্তন করা হয়, সেগুলিকে কার্যকর করার দায়িত্ব ছিল প্রধানত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটদের। তাঁদের ব্যক্তিগত সাহস, প্রত্যয়, নিষ্ঠা এবং তৎপরতার ওপর অনেকটা নির্ভর করত সেই বিধিনিষেধগুলির সাফল্য। কিন্তু তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ ব্যাপারটা সম্বন্ধে বেশ উদাসীন এবং নিরাসক্ত ছিলেন। কেউ কেউ মনে করেন 'any immediate compulsatory measure to stop the performance of this rite would be premature, and might occasion a general and unfavourable sensation in the public mind'।[১৫৩] আবার কোন কোন ম্যাজিষ্ট্রেট সতীদাহ প্রথার নিয়ন্ত্রণ করতে নেমে, তার থেকে যে কিছু ব্যক্তিগত ফায়দা হাসিল করতেন তারও অন্তত একটা প্রমাণ Bentinck-এর শাসনকালেই মেলে। জনৈক Mr. Sage ৮০০/৯০০ টাকা ঘুষ নিয়ে অবৈধ ভাবে একটি বিধবাকে সহমৃতা হবার অনুমতি দেন।[১৫৪] এসব বাধা এবং অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও অধিকাংশ ম্যাজিষ্ট্রেট

এবং অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা যে সতীদাহ প্রথার নিষিদ্ধকরণ চাইতেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। একটা বিরোধী মতের নমুনা দেওয়া যেতে পারে। একজন বিশিষ্ট বিচারক, Mr. Courtney Smith বলেন: 'My opinion is, that the toleration of the practice of Suttee is a reproach to our Government, and that the entire and, immediate abolition of it would be attended w!th no sort of danger'।[১৫৫] 'Mr. J. H. Harrington, the most distinguished Judge of former days ever raised to the Sudder Bench', তিনিও Mr. Smithএর সঙ্গে এ বিষয়ে সম্পূর্ণ একমত ছিলেন।[১৫৬] কোম্পানীর কর্মচারীরা ছাড়াও পাদ্রী ও যাজক সম্প্রদায় এবং অন্যান্য ইংরাজরাও সতীদাহ প্রথার উচ্ছেদের পক্ষপাতী ছিলেন। কোম্পানীর একজন 'Chaplain', ১৮২৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে একটি চিঠিতে লেখেন: 'As to the praticability of abolishing the custom, there is, I believe, but one opinion with well informed persons.—Nothing would be easier.—The Government has only to frame a regulation prohibiting the practice under proper penalties—the highest penalties—and the local Magistrate would then he empowered to act with decision. I do not apprehend the smallest political risk would be incurred by such a prohibition, and this I know to be the opinion of some of the ablest and most experienced Magistrates in Bengal. The Natives would submit as a matter of course. An immense majority would approve. Some of the determined and violent adherents to custom, might do the deed in private, but this could not often occur. The practice would gradually die away, and we shall have wiped off the stain which now attaches to our Government.

'The question, as it respects political risk is not to be gravely discussed.—Another question may arise in the minds of those who consider the character of our Government in India, as to whether it is fair and equitable to do which interferes with their Religious system. But this question may be soon settled. No theories of what may be politically expedient, ought to sanction what is a flagrant breach of every natural and moral feeling. The voice of reason and humanity

ought to prevail".[১৫৭] প্রভাবশালী শ্রীরামপুরের ব্যাপটিষ্ট পাদ্রীরা সতীদাহ প্রথাটিকে উচ্ছেদ করার জন্ত দীর্ঘদিন ধরে সরকারকে প্ররোচিত করে। প্রথাটিকে আংশিক ভাবে নিয়ন্ত্রণ করার জন্ত সরকারী ব্যবস্থাগুলির ক্রমবর্ধমান ব্যর্থতাই প্রথাটিকে সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করার অনুকূল একটা আন্দোলনকে জোরালো করে তোলে—এদেশে এবং ইংলণ্ডে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একজন বিশিষ্ট অংশীদার John Poynder ১৮২৭ সালের ২১শে এবং ২৮শে মার্চ অংশীদারদের সভায় হিন্দুদের নিষ্ঠুর ও বর্বর প্রথাগুলি সম্বন্ধে একটি দীর্ঘ বক্তৃতা করেন। বক্তৃতটি খুবই তথ্য সমৃদ্ধ। তিনি প্রমাণ করতে চান যে, আইন করে সতীদাহ প্রথা অবিলম্বে নিষিদ্ধ করা ব্রিটিশ সরকারের কর্তব্য, এবং তা সহজেই করা যায়। শুধু ইংরাজ নয়, ভারতীয়েরাও সে নিষিদ্ধকরণকে স্বাগত জানাবে। John Poynder বিষয়টি সম্বন্ধে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটিও উপস্থিত করেন। 'That this Court, taking into consideration the continunance of Human Sacrifices in India, is of opinion that, in the case of all Rites, or Ceremonies, involving the destruction of Life, it is the duty of a Paternal Government to interpose for their prevention; and therefore recommends to the Honourable Court of Directors to transmit such Instructions to India, as that Court may deem most expedient for accomplishing this object, consistently with all practicable attention to the feelings of the Natives'.[১৫৮] প্রস্তাবটি গৃহীত হয়।

উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে সতীদাহ নিবারণের সমস্যাটি ইংলণ্ডে কোম্পানীর কর্তৃপক্ষের কাছে একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের আকার ধারণ করে। বিষয়টি সম্বন্ধে জোরালো আলোচনা হয়; বহু সমীক্ষা, পুস্তিকা, গ্রন্থ প্রভৃতি রচিত হয়, এবং বিভিন্ন ব্যক্তির মতামতগুলি পরে ১৮২১ থেকে ১৮৩০ সালের মধ্যে পার্লামেন্টের নথি হিসাবে আট খণ্ডে মুদ্রিত হয়।[১৫৯] ইতিমধ্যে কলকাতা শহরে রামমোহন তাঁর সতীদাহ বিরোধী আন্দোলন শুরু করেন। ১৮১৭ সালে সদর দেওয়ানী আদালতের প্রধান বিচারপতি যে সহমরণ সম্বন্ধে পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের অভিমত গ্রহণ করেন, সেটাও একটা তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। মোট কথা, সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদ করার জন্ত যে একটা নতুন এবং জোরালো ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার এ উপলব্ধি এদেশের এবং ইংলণ্ডের

কর্তৃপক্ষের মনে দৃঢ়তর হয়। কিন্তু কিভাবে তা করা যায় সে সম্বন্ধে তাঁদের মনে বেশ কিছু দ্বিধা থাকে—রাজনৈতিক সংকটের আশঙ্কা তাঁদের মন থেকে দূর হয় না। সুতরাং, একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে, দূর থেকে তড়িঘড়ি কোন পাকা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ ইতস্তত করেন, এবং ব্যাপারটি সম্বন্ধে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নেবার দায়িত্ব যে স্থানীয় গভর্ণর-জেনারেলের ওপর থাকাই যুক্তিযুক্ত এই অভিমত পোষণ করেন। ১৮২৩ সালের ১৭ই জুন তারিখে লেখা একটি চিঠিতে কোম্পানীর পরিচালক মণ্ডলী, গভর্ণর-জেনারেল ও তাঁর কাউন্সিলের সদস্যদের পূর্বে লেখা একটা চিঠির উত্তর দেন: 'We are disposed to give you a large discretion in regard to the prevention of Suttee, because we are persuaded that no general rule can be laid down with either safety or efficiency ; and that the adaptation of particular measures to local peculiarities can only be effected by the Indian Governments. ..... It is undoubtedly the policy of our Government to abstain from interference with the religious opinions and prejudices of the Natives,

'To us however it appears very doubtful,......whether the measures which have been already taken in pursuance of this principle have not tended rather to increase than to diminish the frequency of the practice.

'It is...with much reluctance that we consent to make the British Government, by a specific permission of the *Suttee*, an ostensible party to the sacrifice ; we are averse also to the practice of making British Courts expounders and vindicators of the Hindoo Religion, when it leads to acts which, not less as legislators than as Christians, we abominate.

'This reasoning we will, at present, push no farther than to enjoin you, for this as well as for other considerations, to intefere as little as possible.

'...the practice of suttee is not a tenet of Religion, to which the people are enthusiastically attached ; but rather an abuse fostered by interested Priests or Relations ; these instances of partial success do lead us to regard the notion of prohibition modified according to circumstances, of this barbarous custom with rather less of apprehension than it has generally produced. We say this without hesitation because we are not at all afraid

that you will act imprudently upon our declaration. You will take it, as it is meant, for an encouragement to you seriously to consider the subject, and an assurance of our disposition to co-operate in such measures as your superior means of estimating consequences may suggest to you. Assuredly the most acceptable form of success would be that which would be brought about by such an increase of intelligence among the people as should show them the wickedness and absurdity of the practice ; next to this we should rejoice to see the abolition effected by influence, and the co-operation of the higher order of Natives'।[১৬০] কথাগুলির মধ্যে কোম্পানীর কর্তৃপক্ষের বিষয়টি সম্বন্ধে দ্বিধা এবং সংকল্প, দুই-ই প্রকটিত। 'the co-operation of the higher order of Natives' কিভাবে সংগ্রহ করা যায়, সে সম্বন্ধে 'the late J H. Harrington Esq. in 1825 suggested that magistrates should be authorized "to hold out some public encouragement, as an honorary dress, title or other rewards, to any landholder or other persons of local influence, who should distinguish himself by active and successful endeavours to discourage and suppress the sacrifice of Hindoo widows'।[১৬১] গভর্ণর-জেনারেল Lord Amherst ও তাঁর কাউন্সিল সতীদাহ প্রথাটিকে উচ্ছেদ করার পক্ষপাতী হলেও, নানা কারণে 'ধীরে চল' নীতিই অনুসরণ করেন। ১৮২৪ সালের ডিসেম্বর মাসে তাঁরা লণ্ডনে কোম্পানীর পরিচালক মণ্ডলীকে লেখেন : 'We entirely participate with your honourable court in the feelings of detestation with which you view the rite, and in your earnest desire to have it suppressed ; and we beg to assure you, that nothing but the apprehension of evils infinitely greater than those arising from the existence of the practice, could induce us to tolerate it for a single day.

'The whole course of our proceedings has been, in conformity with the principle enjoined by your honourable court, to interfere as little as possible ;

'we are decidedly of opinion that the adoption of any new measures of importance is particularly inexpedient at the present moment.

'We do not wish to pledge ourselves for the future, even by sketching any specific plan for the approbation of your honou-

rable court. We hope we have satisfied your honourable court, that we anxiously desire to see the abolition of the practice; that reasonable doubts may he entertained of the safety of suppressing it; that the present moment is particularly unsuitable to such an attempt; that something has been effected by us; that the subject continues to receive its full share of our attention; and that we shall keep our minds open to avail ourselves of favourable circumstances, or useful information'।[১৩২]

এটা স্পষ্ট যে Lord Amherst কোম্পানীর পরিচালক মণ্ডলীর ইঙ্গিতে সাড়া দিতে সাহস করেন নি—যদিও ব্যক্তিগত ভাবে তিনি সতীদাহ প্রথার উচ্ছেদ চান। পরিচালক মণ্ডলী এদেশের পরিস্থিতির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত না থাকলেও এবং কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত হলেও, যদি Amherst সতীদাহ প্রথার উচ্ছেদে তখন উদ্যোগী হতেন, তাহলে তাঁরা তাঁকে যে সমর্থন করতেন তাতে সন্দেহ নেই।

পরবর্তীকালে একজন বিশিষ্ট ইংরাজ ঐতিহাসিক লেখেন: 'The Court of Directors had long been anxious for the abolition of Suttee and in 1824 had declared their conviction of the practicability of abolishing the practice, or at least of the safety with which it might he prohibited'।[১৩৩] আর একজন লেখেন: 'In 1824 the Directors went so far as to express the opinion that it was practicable or at least safe to abolish suttee, but they would not take the responsibility of ordering abolition.'[১৩৪]

অংশত সেই 'responsibility' পালন করার জন্য কোম্পানীর পরিচালক মণ্ডলী Bentinck-কে পাঠান ভারতে। ১৮২৮ সালের ৪ঠা জুলাই Bentinck কলকাতা পৌঁছান, এবং ভারতের শাসনভার গ্রহণ করেন। তিনি রামমোহনের সমবয়সী ছিলেন। গভর্ণর-জেনারেল হয়ে ভারতে আসার পূর্বে ১৮০৩ থেকে ১৮০৭ সাল পর্যন্ত তিনি মাদ্রাজের গভর্ণর ছিলেন। তখন তাঁর বিশ্বাস ছিল যে ভারতে ইংরাজদের সামরিক ও রাজনৈতিক সাফল্য 'affords a hope of equal benefit to the great mass of the people'।[১৩৫] ভারত সম্বন্ধে তাঁর অনেক কিছু পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু ১৮০৬ সালে ভেলোরে সিপাহীদের যে বিদ্রোহ ঘটে তার জন্য কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ তাঁকেই প্রধানভাবে দায়ী করেন। তিনি পদে ইস্তফা দিয়ে দেশে

ফিরে যান। তাঁর ভারতীয় পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়। ১৮১৯ সালে তাঁকে আবার মাদ্রাজের গভর্ণর পদে মনোনীত করা হয়, কিন্তু তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। বছরতিনেক বাদে তিনি জানান যে ভারতের গভর্ণর-জেনারেলের পদ গ্রহণ করতে তিনি প্রস্তুত আছেন। কোম্পানীর পরিচালকদের তাঁর সম্বন্ধে আগ্রহ থাকলেও, তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী Liverpool ব্যাপারটাকে চাপা দেন। অবশেষে, ১৮২৭ সালে তাঁর এক আত্মীয় George Canning-এর প্রধানমন্ত্রীত্বকালে তাঁকে পদটি দিলে তিনি তা গ্রহণ করেন। মনোনয়নের তালিকায় তাঁর নাম ছিল ষষ্ঠ। তবে প্রথম পাঁচজন পদটি গ্রহণ করতে অস্বীকার করলে, তিনি সেটি পান। হয়ত, কেউ কেউ এ ঘটনার মধ্যে ঈশ্বরের ইঙ্গিত দেখতে পাবেন। ওই বয়সে, এবং ষোলআনা শারীরিক সুস্থতা না থাকা সত্ত্বেও কেন তিনি ভারতের গভর্ণর-জেনারেলের পদটি গ্রহণ করেন সে বিষয়ে একজন ঐতিহাসিক সম্প্রতি মন্তব্য করেন: 'Bentinck would have been less than human if he had not been moved by the wish to restore his Indian and personal reputation. Still resentful of what he had always felt was an unjust decision to recall him from India, he no doubt thought that a successful term as governor-general would altogether bury the unsettled controversy over Madras. On top of this, and what probably clinched the matter, was the fact that recently he had been suffering a period of financial difficulty, and the governor-general's salary of £10,000 a year and expenses could scarcely be sneezed at; and as both his wife and he agreed, "It formed the best situation in His Majesty's gift." '।[১৬৬] বিষয়টি সম্বন্ধে প্রটেষ্ট্যান্ট খৃষ্টান Bentinck-এর দৃষ্টি ছিল খুবই স্বচ্ছ (দ্রষ্টব্য: সূত্র ১৬৬। এই একই সূত্রে আর একজন গভর্ণর-জেনারেলের সমস্যা দেখুন)। ধরে নেওয়া যেতে পারে যে বিশুদ্ধ ভারত-হিতৈষণাই তাঁর গভর্ণর-জেনারেলের পদ গ্রহণ করার একমাত্র প্রেরণা ছিল না।

স্বদেশে, অভিজাত শাসককুলে Bentinck একজন বিশিষ্ট উদারপন্থী, উন্নয়নোদ্যোগী, সংস্কারোৎসাহী ব্যক্তি, ও দক্ষ সৈনিক হিসাবে খ্যাতি লাভ করেন, এবং তিনি 'utilitarian' গোষ্ঠির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। গভর্ণর-জেনারেল হিসাবে ভারত-যাত্রার পূর্বে এক বিদায়ী ভোজ সভায় James

Mill কে তিনি বলেন : "I am going to British India, but I shall not be Governor-General. It is you that will be Governor-General"।[১০৭] মনে হওয়া স্বাভাবিক যে তিনি James Mill-এর একজন অন্ধ ভক্ত ছিলেন। কিন্তু ঠিক তা নয়। 'Utilitarian' দের আড্ডায় তিনি যতই 'the pure milk of the Benthamite word' গলাধঃকরণ করুন না কেন, যাকে ইংরাজীতে বলা হয় 'doctrinaire' তা তিনি ছিলেন না। একজন বিশিষ্ট ঐতিহাসিকের মতে 'Bentinck……was a whig of the old school',[১০৮] অর্থাৎ, একজন অভিজাত উদারপন্থী রাজনীতিজ্ঞ। তাঁর অনুরাগীদের দৃষ্টিতে তিনি ছিলেন 'straight-forward, honest, upright, benevolent, sensible……unaffected, open, candid, kind'.।[১০৯] এ সত্ত্বেও কেউ কেউ আশঙ্কা করেন যে একজন 'impetuous innovator' হিসাবে ভারতে তিনি হয়ত সাংঘাতিক কিছু একটা করে বসতে পারেন। তাঁর সম্বন্ধে, এক প্রসঙ্গে, Castlereagh একবার মন্তব্য করেন 'How intolerably prone he is to whig revolution every where'।[১১০] তাঁর সম্বন্ধে এ ভয়ও থাকে যে তিনি 'seeking "to facilitate transfer of the government of India from English to Indian hands'।[১১১] যাই হক, তাঁকে কোন বিশেষ রাজনৈতিক বা সামাজিক মতাদর্শের অন্ধ অনুবর্তী মনে করা ঠিক নয়। সহজ কথায় তিনি ছিলেন একজন উদার, দূষ্টবাদী, মানবদরদী শাসক : '...the happiness and prospects of mankind...I honestly confess it to be my ambition to promote'।[১১২] তিনি ছিলেন একজন সৎ এবং উদার খৃষ্টান। তাঁর চিন্তায় এবং চরিত্রে 'Evangelical'-দের আধ্যাত্মিক প্রত্যয় এবং প্রেরণা সুস্পষ্ট। কিন্তু, তাঁদের ধর্মীয় উগ্রতা থেকে তিনি মুক্ত ছিলেন। ভারতবর্ষকে একটি সভ্য, উন্নত দেশে পরিণত করাই, তিনি মনে করেন, ইংরাজ শাসকদের লক্ষ্য হওয়া উচিত। তাঁর পূর্বে যাঁরা ভারত শাসন করেন, তাঁরা প্রায় সকলেই যোগ্য শাসক ছিলেন বটে, কিন্তু, নিজেদের দেশের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য, ভারতের প্রকৃত উন্নতির অনুকূল অনেক কাজই তাঁরা অবহেলা করেন : 'I will merely observe that the almost entire neglect in which the sources of wealth, convenience and civilization have been so

long left, is a positive scandal and disgrace to our government.'।[১৭৩] ভারতীয় সাম্রাজ্যের সর্বময় কর্তা হিসাবে, তাঁর মতে, প্রত্যেক গভর্ণর-জেনারেলের উচিত ভারতীয় প্রজাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া এবং তাদের প্রতি 'great moderation' প্রদর্শন করা। ভারতবাসীদের স্বার্থেই তাদের জীবনযাত্রা প্রণালীর পরিবর্তন করা প্রয়োজন, কিন্তু তা বেপরোয়া ভাবে করা উচিত নয়: 'The great curse of our rule has been a constant interference with the long established native system of Indian society, and of the introduction of our own fancies and schemes,'।[১৭৪] Bentinck এক প্রসঙ্গে বলেন: 'I think it very likely, that the interference of government with education, as with most of the other native institutions, with which we have too often so mischievously meddled, might do much more harm than good'।[১৭৫] একজন সাচ্চা খৃষ্টান হিসাবেই তিনি তাঁর ভারতীয় কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। তিনি ক্ষোভের সঙ্গে লক্ষ্য করেন যে ভারতীয় সম্পদের সিংহভাগ আত্মসাৎ করেন ইংরাজ শাসকরা—ভারতীয় প্রজাদের উপকারের জন্য বিশেষ কিছু জোটে না। এ আচরণ খৃষ্টানোচিত নয়: 'We do not do as we would be done by. We profess but do not practice Christianity and know that charity best, which begins at home.'।[১৭৬] ইংলণ্ড থেকে আগত সভ্য, উন্নত, খৃষ্টানদের, Bentinck-এর এই কথাগুলো ভালো করে বুঝিয়ে দেবার জন্যই রামমোহন 'The Precepts of Jesus' রচনা করেন। মোট কথা, ভারতবাসীদের উন্নত করার জন্য Bentinck কৃতসংকল্প ছিলেন বটে, তবে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী ছিল বেশ 'pragmatic'—অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করার পক্ষপাতী ছিলেন তিনি।

সতীদাহ নিবারণ সম্পর্কে কোম্পানীর কর্তৃপক্ষের, এবং ভারতীয় প্রশাসকদের মতামতের সঙ্গে যে Bentinck ভালোভাবেই পরিচিত ছিলেন তা মনে করা সঙ্গত। মনে করা সঙ্গত যে কোম্পানীর কর্তৃপক্ষও Bentinck-এর ভারত-শাসন সম্বন্ধীয় মতামতগুলি সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন, এবং ভেবে চিন্তে ওই সময় তাঁকে গভর্ণর-জেনারেল হিসাবে ভারতে পাঠাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। আর এতেও সন্দেহ নেই যে ভারতে আসার পূর্বে তাঁর ভবিষ্যৎ কর্মসূচী সম্বন্ধে Bentinck কর্তৃপক্ষের সঙ্গে খুঁটিয়ে আলোচনা করেন। তাঁর সতীদাহ নিবারণ

করার চেষ্টা যে কর্তৃপক্ষের সমর্থন লাভ করবে সে বিষয়ে তিনি একরকম নিশ্চিত ছিলেন। ভারতে আসার কয়েক মাস পরে তিনি প্রধান সেনাপতি Lord Combermere-কে একখানি চিঠিতে লেখেন : 'Having had the suttee question very much pressed upon my attention in England, and feeling the great responsibility which under any view of the case, and under any decision must belong to me, both in my private and public capacity, I came to this resolution for my own future comfort, that as soon as possible I would come to a decision upon the question, in some way or other'।[১৭] এর মাস দুই বাদে Bentinck কোম্পানীর পরিচালক মণ্ডলীর একজন সভ্যকে যে চিঠিখানি লেখেন, তাতে তাঁর মানসিক দ্বন্দ্বটি প্রকটিত হয় : 'Having observed the great interest taken by the court of proprietors in the question of suttees, I think it not unlikely that the subject may again be brought into public discussion. As no step of this kind will in all probability be taken without previous communication with you, I am anxious very shortly to state my own views and wishes upon this most important point.

'There cannot be alive the man more anxious for the abolition of that horrible rite than myself. I do not believe that among all the most anxious advocates of that measure any one of them could feel more deeply than I do, the dreadful responsibility hanging over my happiness in this world and the next, if as the governor-general of India I was to consent to the continuance of this practice for one moment longer, not than our security, but than the real happiness and permanent welfare of the Indian population rendered indispensable. I determined therefore, before I came to India, that I would instantly take up the question, that I would come to as early a determination upon it, as a mature consideration, involving so many and such distant references would allow, and having made my decision, "Yes or no", to stand by it and set my conscience at rest. So I have proceeded'।[১৮]

Bentinck-এর এই উদ্ধৃতিটি রমেশচন্দ্রের কলমে কি আকার ধারণ করে তা ওই একই সূত্রে দেখুন।

সতীদাহ-সমস্যার সমাধান করা ছাড়াও Bentinck-এর আরও অনেক কাজ অনেক সমস্যা, অনেক দুশ্চিন্তা ছিল। তবে অংশত তাঁর ব্যক্তিগত প্রত্যয় ও উপলব্ধির জন্য, অংশত কর্তৃপক্ষের চাপের জন্য এবং অংশত রামমোহন গোষ্ঠীর আন্দোলনের জন্য সতীদাহ উচ্ছেদের ব্যাপারে একটা দৃঢ় এবং স্থির সিদ্ধান্ত নেবার সমস্যাটা বিশেষ জরুরী আকার ধারণ করে। Bentinck-এর একটা সুবিধা ছিল—সেই সময় ভারতে কোম্পানীর রাজনৈতিক পরিস্থিতি বেশ শান্ত এবং নিশ্চিন্ত ছিল; কোন সূত্র থেকে কোন রকম আক্রমণ বা যুদ্ধের আশঙ্কা ছিল না। এ ছাড়াও Bentinck জানতেন যে ব্রিটিশ শাসনের মহত্ব প্রমাণ এবং ভারতবাসীর মঙ্গল সাধন করার জন্য সময় তিনি বেশী পাবেন না। সুতরাং, ভারতে এসেই দ্রুত কাজে নেমে পড়লেও সতীদাহ উচ্ছেদ ব্যাপারে কোন তাড়াহুড়ো করার বা কোন একক উদ্যোগে প্রবৃত্ত হবার চেষ্টা থেকে তিনি বিরত থাকেন। ভেবে চিন্তে, ভালো করে মাটি দেখে, ধীরে ধীরে পা ফেলার সিদ্ধান্ত তিনি গ্রহণ করেন। সাম্রাজ্যের নিরাপত্তাই ছিল তাঁদের সকলের প্রধান চিন্তা, এবং সে নিরাপত্তা বারো আনা নির্ভর করত কোম্পানীর সামরিক বাহিনীর সিপাহীদের মনোভাবের ওপর। তাদের অসন্তোষ বা বিদ্রোহের আশঙ্কায় ইংলণ্ডের কর্তৃপক্ষ থেকে স্থানীয় সাধারণ ইংরাজ কর্মচারীরা পর্যন্ত সকলেই নিরন্তর সন্ত্রস্ত থাকতেন। Bentick-এর নিজের অভিজ্ঞতা এ বিষয়ে খুবই তিক্ত ছিল: 'When Governor of Madras, I saw, in the mutiny of Vellore, the dreadful consequences of a supposed violation of religious customs upon the minds of the native population and soldiery'।[১৭] সুতরাং সতীদাহ উচ্ছেদ করার সংকল্প তাঁর যতই দৃঢ় হক না কেন, সাম্রাজ্যের নিরাপত্তার প্রশ্ন ছিল তাঁর কাছে অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ। ঝুঁকি একটা নিতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন বটে, কিন্তু বেপরোয়াভাবে নয়।

ভারতে আসার মাস চারেক বাদে তিনি সামরিক বাহিনীর 'Officers'-দের কাছে একটা গোপন ইশ্‌তেহার বিলি করেন। বিষয়টা সতীদাহ। সেখানে লেখা থাকে: 'to the christian and to the Englishman, who by tolerating sanctions, and by sanctioning incurs before

God the responsibility of this inhuman and impious sacrifice not of one, but of thousands of victims, these feelings of anxiety must be and ought to be extreme. The whole and sole justification is state necessity—that is, the security of the British empire, and even that justification, would be, if at all, still very incomplete, if upon the continuance of the British rule did not entirely depend the future happiness and improvement of the numerous population of this eastern world'।[১৮০] সামরিক কর্তাদের কাছ থেকে Bentinck তাঁর কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর চান : 'Would debarring the practice of suttee create any sensation among the native officers and sepoys of the Hindu persuasion likely to evince itself in tumult or revolt, or actual opposition to the measures enacted for its abolition? Would they consider the suppression of this particular rite so great a hardship, as to cause amongst them manifestations of disgust or irritation, or ill will and disaffection to the state? Supposing actual opposition or manifestations of feelings of a serious and unpleasent nature to be in your opinion improbable would interference in the matter of suttee to the extent of a total abolition of the usage, create anxiety and alarm amongst the sepoys, under the apprehension of other innovations, or exite a dread that this was only the first step towards a more general attack on their customs and religion; or would such interference be deemed by them an abandonment of our professed desire to abstain from invading thir customs? Notwithstanding an apparent passive submission to an edict for the discontinuane of suttee, would the effect of such a measure be to create sullenness amongst the men, or any distrust of our motives; or would it be likely to generate and diffuse among the native soldiers the slightest aversion to our rule and authority?'[১৮১] এর দুদিন বাদে প্রধান সেনাপতিকে লেখেন : 'As every step taken in a measure involving such serious consequences requires the utmost possible

prudence and precaution, I have thought it better for the sake of future security in the event of a decision in favour of abolition, and in the event of consequent disasters, to be able to shew that I had neglected no means of ascertaining the sepoy feeling'।[১৮২] সামরিক কর্তাদের এই সঙ্গে নির্দেশ দেওয়া হয় যে ব্যাপারটি সম্বন্ধে তাঁরা যেন গোপনতা রক্ষা করেন, এবং দেশীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে বিষয়টি সম্বন্ধে কোন আলোচনায় যেন প্রবৃত্ত না হন। মোট কথা সমস্ত ব্যাপারটি সম্বন্ধে 'extreme caution' অবলম্বন করাই ছিল Bentinck-এর নীতি। এছাড়াও, সহমরণ প্রথা উচ্ছেদের জন্য অসন্তুষ্ট হিন্দুদের তুষ্ট করার জন্য Bentinck-এর সরকার এ প্রস্তাবও করেন যে দীর্ঘদিন প্রচলিত তীর্থকর দেওয়া থেকে তাদের রেহাই দেওয়া যেতে পারে।

সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদ করার কাজে যেমন তাঁর অধস্তন ইংরাজ সহকর্মীদের, তেমনি 'higher order of Natives'-দের সহযোগিতা যে একান্ত প্রয়োজন তা Bentinck ভালভাবেই উপলব্ধি করেন। ১৮২৯ সালের ফেব্রুয়ারী এবং মার্চ মাসে যথাক্রমে নিম্নলিখিত বিজ্ঞপ্তি দুটি কলকাতার খবরের কাগজে প্রকাশিত হয়: 'The Governor-General invites the communication of all suggestions tending to promote any branch of national industry; to improve the commercial intercourse by land and water; to amend any defects in the existing establishments; to encourage the diffusion of education and useful knowledge; and to advance the general prosperity and and happiness of the British Empire in India.

'This invitation is addressed to all Native Gentlemen, Landholders, Merchants, and others, to all Europeans both in and out of the service, including that useful and respectable body of men, the Indigo Planters, who from their uninterrupted residence in the Mufussil, have peculiar opportunities of forming an opinion upon some of those subjects.'

'......Governor-General will give private audiences to Native Gentlemen, and to Natives of respectability, who may wish to see him.'।[১৮৩]

সহমরণ প্রথা উচ্ছেদ করার ব্যাপারে Bentinck কোম্পানীর সামরিক বাহিনীর প্রায় পঞ্চাশজন উচ্চপদস্থ কর্তার অভিমত গ্রহণ করেন। তিনি তাঁর কাউন্সিলের সভ্য, উচ্চ আদালতের বিচারক, জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট, পুলিশ অধিকর্তা প্রভৃতি উচ্চপদস্থ বেসামরিক ব্যক্তিদের সঙ্গেও পরামর্শ করেন। বিষয়টি সম্বন্ধে বিশিষ্ট প্রবীন সংস্কৃতজ্ঞ ভারততত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত Horace Hayman Wilson-এর মতামতের ওপর তিনি বিশেষ গুরুত্ব দেন। রামমোহনের ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে তিনি পরিচিত হন, এবং তাঁর সঙ্গেও বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেন—সম্ভবত দ্বারকানাথ ঠাকুরের সঙ্গেও করেন। আলোচনায় সকলেই যে তাঁর সঙ্গে একমত হন তা নয়, তবে অধিকাংশই অবিলম্বে সহমরণ প্রথা সম্পূর্ণ উচ্ছেদের সমর্থন করেন। Wilson সহ কয়েকজন তার সম্পূর্ণ বিরোধিতা করেন। এইভাবে প্রায় দেড় বছর ধরে গভীর সতর্কতার সঙ্গে বহু গবেষণা আলোচনা, ভাবনা চিন্তা, পরামর্শ বিবেচনা করার পর Bentinck রচনা করেন সহমরণ সম্বন্ধে তাঁর দীর্ঘ, মনোজ্ঞ সমীক্ষাটি ১৮২৯ সালের নভেম্বর মাসে। সমীক্ষাটিতে তিনি বিভিন্ন ব্যক্তিদের মতামত এবং ভারতের সমসাময়িক অবস্থা নিপুণভাবে বিশ্লেষণ করে দেখান যে সহমরণ প্রথা উচ্ছেদ করা শুধু যে উচিত তা নয়, নির্বিঘ্নে সম্ভবও বটে।

Bentinck শুরু করেন : 'Whether the question be to continue or to discontinue the practice of suttee, the decision is equally surrounded by an awful responsibility. To consent to the consignment, year after year, of hundreds of innocent victims to a cruel and untimely end, when the power exists of preventing it, is a predicament which no conscience can contemplate without horror. But, on the other hand, if heretofore received opinions are to be considered of any value, to put to hazard, by a contrary course, the very safety of the British Empire in India, and to extinguish at once all hopes of those great improvements affecting the condition not of hundreds and thousands, but of millions, which can only be expected from the continuance of our supremacy, is an alternative which, even in the light of humanity itself, may be considered as a still greater evil'। অতীতে মুসলমান এবং ইংরাজ শাসকরা যা করেননি, তিনি তা করেন। কেন? 'In venturing to be

the first to deviate from this practice, it becomes me to shew, that nothing has been yielded to feeling, but that reason, and reason alone, has governed the decision. So far indeed from presuming to condemn the conduct of my predecessors, I am ready to say, that in the same circumstances, I should have acted as they have done. So far from being chargeable with political rashness, as this departure from an established policy might infer, I hope to be able so completely to prove the safety of the measure, as even to render unnecessary any calculation of the degree of risk, which, for the attainment of so great a benefit, might wisely and justly be incurred. So far also from being the sole champion of a great and dangerous innovation, I shall be able to prove that the vast preponderance of present authority has long been in favour of abolition'।১৮৪ Bentinck শেষ করেন: 'The first and primary object of my heart is the benefit of the Hindoos. I know notbing so important to the improvement of their future condition, as the establishment of a purer morality, whatever their belief, and a more just conception of the will of God. The first step to this better understanding will be dissociation of religious belief and practice from blood and murder. They will then, when no longer under this brutalizing excitement, view with more calmness, acknowledged truths. They will see that there can be no inconsistency in the ways of Providence, that to the command received as divine by all races of men, "No innocent blood shall be spilt", there can be no exception ; and when they shall have been convinced of the error of this first and most criminal of their customs, may it not be hoped, that others which stand in the way of their improvement may likewise pass away, and that thus emancipated from those chains and shackles upon their minds and actions, they may no longer continue, as they have done, the slaves of every foreign conqueror, but that they may assume their just places among the great families

of mankind. I disown in these remarks or in this measure any view whatever to conversion to our faith. I write and feel as a Legislator for the Hindoos, and as I believe many enlightened Hindoos think and feel.

'Descending from these higher considerations, it cannot be a dishonest ambition that the Government of which I form a part, should have the credit of an act, which is to wash out a foul stain upon British Rule, and to stay the sacrifice of humanity and justice to a doubtful expediency; and finally as a branch of the general administration of the Empire, I may be permitted to feel deeply anxious that our course shall be in accordance with the noble example set to us by the British Government at home, and that the adaptation where practicable to the circumstances of this vast Indian population, of the same enlightened principles, may promote here as well as there, the general prosperity, and may exalt the character of our Nation.'।[১৮৫] Bentinck-এর কর্মসূচীতে ভ্রান্ত হিন্দুধর্মের অনুগামীদের অভ্রান্ত খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করে সভ্য করার বা প্রাচীনত্ব ও পরম্পরাসিদ্ধতার যুক্তিতে হিন্দুদের আচার বিচারগুলিকে বহাল রাখার কোন স্থান ছিল না। হিন্দু বিধবাদের সহমৃতা হবার প্রথা বাধ্যতামূলক কি শাস্ত্রানুমোদিত, সে প্রশ্ন Bentinck-এর কাছে ছিল গৌণ; সে প্রথা বর্বর, অমানবিক, অন্যায় এবং অযৌক্তিক, এটাই মুখ্য কথা, সুতরাং অবিলম্বে তার উচ্ছেদ প্রয়োজন।

Mill এবং Macaulay, 'imperial missionarism' এবং 'sentimentalism,' 'liberalism' এবং 'humanitarianism,' 'patriotism' এবং 'pragmatism', এই সবকিছুর মিশ্রণে তৈরী Bentinck-এর সমীক্ষাটি যেমন তাঁর ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গী এবং প্রত্যয়ের দ্যোতক, তেমনি উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যিক ভাবতত্ত্বের একটি প্রকৃষ্ট প্রতিবেদন। সেটিকে আর একটু উদ্ধৃত করা যেতে পারে। এক জায়গায় Bentinck বলেন: 'Prudence and self-interest would counsel me to tread in the footsteps of my predecessors. But in a case of such momentous importance to humanity and civilization, that man must be reckless of all his present or future happiness who could listen to the

dictates of so wicked ahd selfish a policy. With the firm undoubting conviction entertained upon this question, I should be guilty of little short of crime of multiplied murder, if I could hesitate in the performance of this solemn 'obligation'।[১৮৬] আর এক জায়গায় বলেন : 'When we had powerful neighbours and had greater reason to doubt our own security, expediency might recommend an indirect and cautious proceeding, but now that we are supreme, my opinion is decidedly in favour of an open, avowed and general prohibition, resting altogether upon the moral goodness of the act and our power to enforce it, and so decided is my feeling against any half measure, that were I not convinced of the safety of total abolition, I certainly should have advised the cessation of all interference'[১৮৭]। Bentinck-এর সতীদাহ উচ্ছেদ করার 'determination'-এর প্রকৃতিটি কিরকম ছিল তা বোঝা কঠিন নয়। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ Bentinck যতই হন না কেন, অবস্থা প্রতিকূল হলে তিনি অবশ্যই পেছিয়ে যেতেন। সমীক্ষার শেষের দিকে তিনি লেখেন : 'the conclusion to which I have come, is completely borne out, both by reason and authority. It may be justly asserted that the Government, in this act, will only be following, not preceding, the tide of public opinion long flowing in this direction'।[১৮৮]

১৮২৯ সালের ডিসেম্বর মাসে সহমরণ প্রথা আইন করে উচ্ছেদ করা হয়। এই প্রসঙ্গে Bentinck এবং তাঁর কাউন্সিলের সভ্যেরা লণ্ডনে কোম্পানীর কর্তৃপক্ষকে লেখেন : 'In conclusion we venture to express a confident expectation that under the blessing of Divine Providence the important measure which we have deemed it our duty to adopt will be efficacious in putting down the abhorrent practice of suttee, a consummation, we feel persuaded, not less anxiously desired by your Honourable Court than by every preceding Government of India, although the state of the country was less favourable in former times than at present, for its full and complete execution. It will be too much to expect that the promulgation of the abolition will not excite some degree of clamour and dissatisfaction, but we are firmly

persuaded that such feelings will be short-lived, and we trust that no apprehension need he entertained of its exciting any violent opposition or any evil consequences whatsoever'।[১৮৯]

Bentinck যখন ভারতের গভর্ণর-জেনারেল নিযুক্ত হন তখন তাঁর দেশে যে পরিবর্তন ও সংস্কারের একটা বিপুল আলোড়ন চলছে, সে ইঙ্গিত আগেই দেওয়া হয়েছে। Bentinck-এর সংস্কারৈষণা তাঁর সমসাময়িক'দেশীয় বৌদ্ধিক এবং সামাজিক পরিবেশের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়। প্রকৃত পক্ষে, কোম্পানীর শাসনকে ভারতীয়দের কাছে গ্রহণীয় করার এবং ভারতীয় প্রজাদের উন্নত এবং সুখী করার জন্য যে বৃহৎ ভূমিকা তিনি গ্রহণ করেন, তা যেমন তাঁর ব্যক্তিগত কৃতিত্বের পরিচায়ক, তেমনি একটা বিশেষ ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার এক পরিণতিও বটে। এটা স্পষ্ট যে, সেই সময় ইংলণ্ড এবং ভারত, উভয় দেশেই সহমরণ প্রথা উচ্ছেদের অনুকূল একটা পরিবেশ গড়ে ওঠে, এবং ভারতের গভর্ণর-জেনারেল হিসাবে Bentinck-এর নিয়োগ খুবই সময়োচিত হয়েছিল। তিনিও সেই অনুকূল অবস্থার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেন। সহমরণ প্রথা উচ্ছেদের কাজে তিনি নানাদিক থেকে বিপুল সমর্থন ও সহযোগিতা লাভ করেন। Bentinck নিজেই বলেন বার বার যে সহমরণ প্রথা উচ্ছেদের সিদ্ধান্ত তাঁর একার সিদ্ধান্ত নয়--একটা দীর্ঘ প্রচেষ্টার চূড়ান্ত ফল। যে 'favourable state of the country', 'tide of public opinion long flowing in this direction' প্রভৃতির কথা তিনি এবং তাঁর সহকর্মীরা বলেন, সে পরিস্থিতির সৃষ্টিতে রামমোহনের কি একটা বৃহৎ ভূমিকা ছিল না? যে মত বঙ্গদেশের অল্পসংখ্যক উদারচেতা, মানবদরদী হিন্দুদের ব্যক্তিগত মত ছিল, যে ক্ষোভ তাঁরা নীরবে পোষণ করতেন, তাকে সরব ও সংহত করে একটা তীব্র ও ব্যাপক আন্দোলনে রামমোহনই কি পরিণত করেননি? Bentinck-এর ভারতাগমনের বহু পূর্ব থেকে যাঁরা সহমরণের বিরোধিতা করেন, তাঁদের ভূমিকা উপেক্ষা করলে Bentinck-এর কৃতিত্বের সঠিক পরিচয় দেওয়া হয় না। Bentinck-এর স্মারকস্তম্ভে Macaulayর যে প্রশংসাবাণী খোদিত হয়, সে সম্বন্ধে একজন ইংরাজ ঐতিহাসিক মন্তব্য করেন: 'As is often the case with inscriptions and obituary notices, the panegyric is liable to criticism that its subject is spoken of as if he alone was responsible for the achievements of his time. The work and

influence of other high-minded administrators should not be overlooked...'।[১২০] আর একজন সমসাময়িক ঐতিহাসিক লেখেন: 'Fortified by the opinion of the most experienced and the most liberal-minded men in service, and confident of the support of the Court of Directors Lord William Bentinck and his two Counsellors, Mr. Butterworth Bayley and Sir Charles Metcalfe... passed that celebrated regulation'।[১২১]

Bentinck ছাড়া অন্য কেউ তখন গভর্নর-জেনারেল হিসাবে কার্যভার গ্রহণ করলে কি হত সে গবেষণা ব্যর্থ। তবে অবস্থার আনুকূল্য বিচার না করে, এবং সব বিরোধিতা অগ্রাহ্য করে তিনি এককভাবেই তাঁর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন, একথা মনে করা মোটেই সঙ্গত নয়। তবে এটাও ঠিক যে তিনি যা করেন তা তাঁর পূর্বে কেউ করেননি; যে ইচ্ছাশক্তি, প্রত্যয়ের দৃঢ়তা, নিষ্ঠা, উদার ও মানবিক দৃষ্টিভঙ্গী, পরিবেশ বিজ্ঞতা, নেতৃত্ব দেবার যোগ্যতা প্রভৃতি গুণগুলি কোন ব্যক্তির পক্ষে একটা বৃহৎ সিদ্ধান্ত গ্রহণের সহায়ক হয়, সেগুলি সবই Bentinck-এর চরিত্রে ছিল। প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর কালের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের নিরাসক্ত ঐতিহাসিক পেছন দিকে চেয়ে Bentinck-এর হিন্দুজাতির 'secular redemption'-এর কর্মসূচীর মধ্যে হয়ত একজন উদার মানব-হিতৈষী সাম্রাজ্যবাদীর আত্মপ্রবঞ্চনার কিছু ইঙ্গিত পেতে পারেন, তবে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে Bentinck-এর চিন্তা ও কর্ম নিঃসন্দেহে যুগোপযোগী ছিল। Bentinck-এর কৃতিত্ব অনেকটা একটা খেলোয়াড় দলের সাফল্যে দলের অধিনায়কের কৃতিত্বের মত। তাঁর পূর্বতন শাসকদের সহমরণ উচ্ছেদ করার 'wish' ছিল; Bentinck-এর ছিল 'will'। একটা অনুকূল পরিবেশে তিনি সে 'will'-কে কার্যকরী করেন। তাঁর সহমরণ প্রথা উচ্ছেদের সিদ্ধান্ত মোটেই কোন 'messianic' ঘটনা নয়।

সহমরণ প্রথা রহিত-করণে রামমোহন এবং Bentinck-এর ভূমিকা সম্বন্ধে দুএকটি সমসাময়িক অভিমত এখানে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে বলে মনে হয় না। শ্রীমতী Frances Keith Martin বলেন যে সহমরণ প্রথা উচ্ছেদ করার জন্য Bentinck 'merits loud applause' এবং তাঁর ভারত শাসন 'more illustrious than that of any of his predecessors' হিসাবে বিবেচিত হবার দাবী করতে পারে। একই প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন: 'the full

onus of merit will be perceived to rest, not on the Government, but on one of the most eminent Philanthropists that any country has ever produced, and without whose extraordinary and unceasing exertions, it would be supererogatory to insinuate that the act of council, now so generally applauded might never have been passed'।[১৯২] সে 'Philanthropist' হচ্ছেন রামমোহন রায়। শ্রীমতী Martin যে তৎকালে একজন অন্ধ রামমোহন-ভক্ত ছিলেন তাতে সন্দেহ নাই। তবে তাঁর অভিমত সম্বন্ধে Bengal Hurkaru'র সম্পাদকের মন্তব্য এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য: 'Our fair correspondent has paid a just tribute on the labours of that learned Brahmun and ardent philanthropist, Ram Mohun Roy. This enlightened Hindoo has long laboured to prove to his countrymen that the custom is not only abhorrent to every principle of humanity but is actually in contradiction to the Shasters or Sacred writings. It must indeed be a proud and happy reflection to this eminent and worthy Native Gentleman that his exertions and his hopes, are now about to be consummated by the manliness and good feeling of the present Government......Lord William Bentinck has done all that a Governor could do. If he has not devoted so many years of labour and anxiety to the accomplishment of the same object, he has evinced the same sincerity of purpose, and has seized on the first opportunity of effecting, at one blow, what Ram Mohun Roy has prepared the way for by the energy of argument, and the grace of eloquence. Let us not therefore offer our exclusive praise and gratitude either to Ram Mohun Roy or to Lord Wm. Bentinck. The former would never have succeeded in his patriotic and enlightened labours without the co-operation of the latter, nor would Lord Bentinck, have ventured on so desirable a measure, if the minds of the natives had not been prepared to abandon the worst of superstitions, by the unwearied labours of their distinguished countryman'।[১৯৩] সহমরণ প্রথা নিবারণে রামমোহনের ভূমিকা সম্বন্ধে একটি পত্রিকায় প্রকাশিত একটি রচনার একাংশ 'India

সেগুলোর সঙ্গে অবশ্যই রামমোহন সবিশেষে পরিচিত ছিলেন। সেগুলো যে প্রথাটিকে নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হয়, এবং কেন ব্যর্থ হয়, তাও অবশ্যই তিনি জানতেন। 'the practice might he suppressed quietly and unobservedly by increasing the difficulties, and by the indirect agency of the police'—এ কথার প্রকৃত অর্থ পরিষ্কার নয়। তবে এটা ঠিক তিনি চান আগের চেয়ে দৃঢ় হস্তক্ষেপ এবং সে হস্তক্ষেপ অবশ্যই আইন মোতাবেক হওয়া দরকার, এবং তার লক্ষ্য শেষ পর্যন্ত, প্রথাটির উচ্ছেদ। এখন, উচ্ছেদ করার স্পষ্ট এবং সোজা উপায় ছিল—সরাসরি আইন করা: 'The practice of suttee, or of burning or burying alive the widows of Hindus, is hereby declared illegal, and punishable by the criminal courts'।[১৯৬] Bentinck তাই করেন। আরও একটা উপায় ছিল: 'to effect the abolition by the indirect interference of the magistrates and other public officers'।[১৯৭] সম্ভবত রামমোহনও এই উপায় অবলম্বন করতে Bentinckকে পরামর্শ দেন। সরাসরি আইন করা যে একটা 'drastic' পদ্ধতি তাতে কোনো সন্দেহ নেই—এবং কত 'drastic' তা আইনটির একটি অনুচ্ছেদ পড়লেই বোঝা যায়: 'All zamindars, taluqdars, or other proprietors of land, whether malguzari or lakhiraj; all sadar farmers and under-renters of land of every description; all dependent taluqdars; all naibs and other local agents; all native officers employed in the collection of the revenue and rents of land on the part of government, or the court of wards; munduls or other head men of villages are hereby declared especially accountable for the immediate communication to the officers of the nearest police station of any intended sacrifice of the nature described in the foregoing section; and any zamindar, or other description of persons above noticed, to whom such responsibility is declared to attach, who may be convicted of wilfully neglecting or delaying to furnish the information above required, shall be liable to he fined by the magistrate

or joint magistrate in any sum not execeeding two hundred rupees, and in default of payment to be confined for any period of imprisonment not exceeding six months'।[১৯৮] সরাসরি আইন করার অর্থ ব্যঞ্জনা রামমোহন নিশ্চয় উপলব্ধি করেন, এবং এও অনুমেয় যে Bentinck-এর সঙ্গে বিষয়টির আলোচনাতেও ব্যাপারটা আরও স্পষ্ট হয়। রামমোহন মনে করেন যে প্রস্তাবিত উচ্ছেদমূলক আইনটি সাধারণভাবে সংস্কারগ্রস্ত হিন্দু সমাজের চিরাগত ধর্মীয় ও সামাজিক আচার বিচার, ধ্যানধারণা গুলির প্রতি একটা আকস্মিক ও প্রত্যক্ষ আঘাত হয়ে দেখা দেবার আশঙ্কা খুব বেশী। সহমরণ প্রথা উচ্ছেদের চেয়ে বেশী যে ব্যাপারটা তাদের বিব্রত ও শঙ্কিত করতে পারে তা হচ্ছে সরকারের পুরোন নীতির বাতিল-করণ এবং হিন্দু সমাজের সংস্কার করা সম্বন্ধে একটা নতুন, কঠোর ও আপোষহীন মনোভাব। রামমোহনের মনে হয় যে এইভাবে একটা প্রবল ঝাঁকুনি দিয়ে তাদের মধ্যে ভীতি ও অনিরপত্তাবোধের মানসতা সৃষ্টি করা সুবিবেচনার কাজ করা হবে না। রামমোহনের এই ধারণার অংশীদার Bentinck-এর সহযোগীদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন। ধরা যাক Charles Metcalfe-এর কথা। তিনি Bentinck-এর কাউন্সিলের একজন সদস্য ছিলেন। উদারমতাবলম্বী প্রশাসক হিসাবে তিনি বিশেষ মর্যাদা ও খ্যাতির অধিকারী ছিলেন। Bentinck-এর চেয়ে তাঁর ভারতীয় অভিজ্ঞতা অনেক বেশী ছিল। সহমরণ প্রথা নিবারণে তিনি Bentinck-এর একজন সহযোগী ছিলেন, এবং Bentinck-এর পর তিনি অস্থায়ী গভর্ণর-জেনারেল নিযুক্ত হন। তিনি Bentinck-এর ভাষায় 'In the Delhi Territory...never permitted a suttee to be performed'।[১৯৯] তিনিও তাঁর সতীদাহ সম্বন্ধীয় সমীক্ষায় লেখেন: 'I cordially concur in the proposed prohibition of the immolation of Hindu widows on the funeral pyres of their husbands.

'I do so, not without some apprehension, that the measure may possibly be used by the disaffected influential and designing of our subjects, to inflame the passions of the multitude and produce a religious excitement, the consequences of which, if once set in action, cannot be foreseen।[২০০] Metcalfe

তাঁর সমীক্ষায় অবশ্য একথাও বলেন : 'But there is reasonable ground to hope that the prohibition will be submitted to without resistance and, if it be carried into effect tranquilly, and be not made an engine to excite insurrection in the early period of its operation, I have no fear whatever of its causing any danger remotely'। সমস্যাটি নিয়ে খুঁটিয়ে এইসব আলোচনা কাউন্সিলের সভায় Bentinck-এর সঙ্গে তাঁর নিশ্চয় হয়। আইন করার অশুভ ফল সম্বন্ধে রামমোহনের আশঙ্কা যে অমূলক নয় Bentinck নিজেও তাঁর সমীক্ষায় তা স্বীকার করেন।

ব্যাপারটা দাঁড়ায় এই যে, ভারতে ইংরাজদের শক্তি 'supreme', এই কারণে এবং যুক্তিতেই রামমোহন যখন মনে করেন যে সরকারের আইন করার ঝুঁকি না নেওয়াই বাঞ্ছনীয়, Bentinck তখন মনে করেন যে তা নেওয়া যায়, এবং তার জন্য কোন অশান্তি ঘটলে তা দমন করার ক্ষমতাও সরকারের আছে—সুতরাং, তাঁর মতে আইন না করাটা হবে যেমন অনুচিত, তেমনি সরকারের দুর্বলতার লক্ষণ। দেখা যায় তাহলে যে একই রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষীতে রামমোহন এবং Bentinck দুজনে সহমরণ প্রথা উচ্ছেদের দুটি বিভিন্ন পন্থার কথা চিন্তা করেন। দেশে কোন রকম ব্যাপক অশান্তি ঘটলে সরকার তার মোকাবেলা করতে পারবেন কি না, তা Bentinck-ই ভাল জানতেন, রামমোহন নয়। তাই Bentinck সব দিক বিবেচনা করে শেষ পর্যন্ত আইন করারই সিদ্ধান্ত নেন।

রামমোহন-ভক্ত রামানন্দ যদি মনে করেন রামমোহনের চেষ্টা ছাড়া সতীদাহ প্রথার উচ্ছেদ ঘটত না, তার জবাবে Bentinck-ভক্ত রমেশচন্দ্র প্রমাণ করেন যে Bentinck-এর চেষ্টা ছাড়া সতীদাহ প্রথার উচ্ছেদ ঘটত না। সতীদাহ উচ্ছেদ করতে 'determined' ছিলেন তখন অনেকেই—বিলাতে কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ 'determined' ছিলেন; খৃষ্টান পাদ্রীরা 'determined' ছিলেন; Bentinck 'determined' ছিলেন; এদেশে অধিকাংশ ইংরাজ প্রশাসকেরা 'determined' ছিলেন; আর রামমোহন ও তাঁর অনুবর্তীরাও 'determined' ছিলেন। এই এত মানুষ ও গোষ্ঠীর 'determination'-এর ফলেই সতীদাহের উচ্ছেদ ঘটে,—শুধুমাত্র Bentinck-এর একার 'determination'-এর জন্য নয়। ভারতীয় হিন্দু সমাজকে সতীদাহের মত এক বিষম

গ্লানির কবল থেকে মুক্ত করার জন্ম Bentinck বিলাত থেকে ভারতবর্ষে অবতীর্ণ হন,—এরকম ধারণার বশবর্তী ঐতিহাসিক, আমার মনে হয়, আজকাল সহজে খুঁজে পাওয়া যাবে না।

রমেশচন্দ্র সম্প্রতি রামমোহনের আপত্তি সম্বন্ধে একটা বিচিত্র কথা বলেন : 'when after a good deal of hesitation Lord William Bentinck decided to abolish the practice by legislation and consulted him (রামমোহন) in the matter, he counselled against the measure. The reason possibly was that he was unwilling on principle to accept the right of the foreign Government to regulate the Hindu society by law'।[২০১] হিন্দুদের ধর্মীয় ও সামাজিক কুপ্রথাগুলি নিয়ন্ত্রণ বা উচ্ছেদ করার জন্ম বিদেশী ইংরাজ সরকারের আইন করার অধিকার নেই, এসব কথা রামমোহন কখনই মনে করতেন না। সহমরণ প্রথা নিবর্তন-মূলক আইন করার পূর্বে অন্যান্ত কুপ্রথা উচ্ছেদ করার জন্ত যে আইন করা হয়েছিল, রামমোহন কখন তার বিরোধিতা করেন বলে জানা যায় না। তাঁর কোন লেখাতেও তিনি সে কথা বলেন না। বরং তিনি হিন্দু সমাজের কতকগুলি প্রচলিত সামাজিক আইন ও কুপ্রথা বাতিল করে নতুন আইন করার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন—বিশেষভাবে নারীদের সুখ, শান্তি ও নিরাপত্তার জন্ত। আইন করে সহমরণ প্রথা উচ্ছেদ করা সম্বন্ধে রামমোহন যে মত প্রকাশ করেন তার মধ্যে কোন নীতিগত আপত্তির ইঙ্গিত ছিল না, তাতে ছিল একটা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের উপযোগিতার প্রশ্ন। সহমরণ প্রথা উচ্ছেদের জন্ত আইন করা নীতিগতভাবে অন্যায়, বা তার অশুভ ফলের প্রতি কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা, বা তার বিরোধিতা করা, বা সরাসরি আইন না করে অন্ত কোন উপায়ে সে কুপ্রথাটিকে উচ্ছেদ করা প্রভৃতি ব্যাপারগুলির মধ্যে যে পার্থক্য আছে তা উপলব্ধি করা মোটেই কঠিন নয়। রামমোহন অবশ্যই মনে করতেন যে সহমরণ প্রথা যত শীঘ্র বন্ধ হয় ততই ভালো। রমেশচন্দ্র একথা বলতে পারতেন যে আইন না করে, অন্য, কঠোরতর কিছু প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করলে সহমরণ প্রথার উচ্ছেদ হয়ত কিছুটা বিলম্বিত হত, সুতরাং Bentinck-এর সিদ্ধান্তই ছিল শ্রেয়তর। কিন্তু যদি বিলম্ব ঘটত তাহলে রামমোহন কি খুশী হতেন, অবশ্যই নয়। আইন করে এবং নির্বিঘ্নে সে প্রথা বন্ধ হলে রামমোহন Bentinck-এর চেয়ে কম খুশী হন নি। সহমরণ প্রথা উচ্ছেদমূলক আইন দেশের প্রভাবশালী এক শ্রেণীর কাছে আপত্তি-

৮

কর হতে পারে, কিন্তু তা রামমোহনের কাছেও যে আপত্তিকর হবে এমন কোন ইঙ্গিত Bentinck-এর মন্তব্যে নেই। রামমোহন নিশ্চয় মনে করেন না যে সে আইন করা অন্যায়। সুতরাং নীতিগত কারণে তার বিরোধিতা করার প্রশ্ন উঠে কোথায়? আইন করা অন্যায় এবং আইন করা অবিজ্ঞ—এ দুটি সম্পূর্ণ পৃথক ব্যাপার।

ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলে হিন্দু সমাজে সহমরণ ঘটত খুবই কম। সেখানকার ইংরাজ শাসককরা প্রায় সকলেই একমত ছিলেন যে সহমরণ প্রথা উচ্ছেদ করলে দেশে কোন গুরুতর সংকট সৃষ্টির আশঙ্কা নেই। বঙ্গদেশেই সে প্রথার প্রচলন ছিল ব্যাপক, এবং বঙ্গদেশেই—সরকার যখন সে প্রথার সমস্যাটি নিয়ে বেশ বিব্রত এবং বিভ্রান্ত, রামমোহন এবং তাঁর ক্ষুদ্র গোষ্ঠি সেটিকে উচ্ছেদ করার জন্য আন্দোলন শুরু করেন। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকে উচ্ছেদের সমস্যা নিয়ে আলোচনা ও বিতর্ক যতই বৃদ্ধি পায়, ততই সমস্যাটির জটিলতা প্রকটিত হয়। স্পষ্ট বোঝা যায় যে শুধুমাত্র একজন বা গুটিকয়েক ব্যক্তির—তা যতই উদার ও শক্তিশালী তাঁরা হন না কেন—সদিচ্ছা, আন্দোলন বা সিদ্ধান্ত সমস্যাটির সমাধানের চাবিকাঠি নয়। বোঝা যায় যে প্রশ্নটি একটা বিচ্ছিন্ন সমাজ সংস্কারের প্রশ্ন মাত্র নয়—তার সঙ্গে এদেশে ইংরাজদের রাজনৈতিক স্বার্থ ও নিরাপত্তা জড়িত। এবং আরও বোঝা যায় যে ক্রমপরিবর্তমান সমসাময়িক রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতিকে সামগ্রিক দৃষ্টিতে বিচার না করে সে প্রথাটির উচ্ছেদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব নয়। যাঁরা বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করেন তাঁদের কাছে সেটির আকার, প্রকৃতি ও দুরূহতা ক্রমশ পরিস্ফুট হয়। প্রথম প্রশ্ন ওঠে, প্রথাটিকে উচ্ছেদ করা উচিত কিনা। যাঁরা মনে করেন তা করা উচিত, তাঁদের কাছে তখন দ্বিতীয় একটা প্রশ্ন ওঠে—কি ভাবে এবং কত শীঘ্র তা কার্যকর করা যায়। রামমোহন ব্যক্তিগত ভাবে মনে করেন যে প্রথাটির উচ্ছেদ করা উচিত, এবং অবিলম্বে সে কাজে প্রবৃত্ত হওয়াও উচিত। তবে সরাসরি আইন না করে, নানারকম কঠোর প্রশাসনিক ব্যবস্থার দ্বারা ধীরে ধীরে সেটিকে বন্ধ করাই বিচক্ষণতার কাজ হবে।

রমেশচন্দ্র তাঁর প্রবন্ধে উল্লেখ করেননি যে উচ্ছেদ-আইনটি বলবৎ হবার পর রামমোহন এবং তাঁর অনুবর্তীরা Bentinck-কে অভিনন্দন জানান। একটি চিঠিতে জানা যায়: 'Ram Mohan is entirely occupied in

getting signatures to the native address and both it and the christian address altho' profound should be presented at the same time'।[২০২] আইনটি ঘোষিত হলে বঙ্গদেশের রক্ষণশীল হিন্দু ভদ্র এবং পণ্ডিত সমাজে একটা বিক্ষোভ ও উত্তেজনা দেখা দেয় বটে, কিন্তু কোন 'great agitation' অবশ্যই ঘটে না। তাঁরা আইনটি রদ করার জন্য Bentinck-এর কাছে আবেদন করে ব্যর্থ হলে, বিচার প্রার্থী হন বিলাতে প্রিভি কাউন্সিলের কাছে। আগেই বলেছি রামমোহনও একটা পাল্টা আবেদন নিয়ে বিলাতে যান, এবং বিচারের সময় প্রিভি কাউন্সিলে উপস্থিত থাকেন। রক্ষণশীল গোষ্ঠীর আবেদন প্রিভি কাউন্সিল খারিজ করে দেন। এরপর নেমে আসে নীরবতা।

১৮৩১ সালে লেখা সতীদাহ সম্বন্ধীয় পূর্বোক্ত একটি রচনায় রামমোহন Bentinck-এর আইনটির যৌক্তিকতা প্রতিপাদন করার চেষ্টা করেন। তিনি লেখেন: 'As to the propriety, or justice, or humanity of re-establishing such a cruel usage, it may safely be left to the wisdom and discretion of the exalted individuals, before whom in this christian country and enlightened age, the subject is to the discussed.

'With regard to the question of policy, which to many statesmen seems paramount to justice ,humanity. conscience, law and religion ; It might have been alleged that the abolition would be an interference with the religious rites of the Hindoos, and would cause insurrection, perhaps revolution in the country, and terminate in the loss of the British possessions in India. In this point I beg to offer a few remarks.

'First. If there had been any chance of popular commotion being excited by such abolition, it might have been expected immediately after the measure was adopted in the latter end of the year 1829. About two years and upwards however passed, and no accounts have been received that any widow has been burnt, in opposition to the regulations of Government, or even that any attempt at commotion has ever been made.

'Thirdly. Even in Bengal a greater number of the most intelligent and influential of the natives, landholders, bankers,

merchants, and others, felt so much gratified with the removal of the odium, which the practice had attached to their character as a nation, that they united in presenting an address of thanks and congratulation, on the subject, to the Governor-General, Lord William Bentinck, on the 18th of January, 1830, and in like manner, when his Lordship, in his progress to the upper province, arrived at Buxar,......persons of the highest rank respectability, supported by numerous inhabitants, presented another address, expressive of their satisfaction at the abolition of the horrible custom.

'Fourthly. It was not religious devotion alone which prompted the generality of the natives of Bengal, who carried on the practice of widow burning to such an extent ; nor is that their motive for wishing its re-establishment. But it is their worldly interest which many wish to serve under the cloak of religion. Since according to their law of inheritence (the Dayabhaga) a widow is entitled to inherit the property of her deceased husband, without regard to his condition in life, and therefore is a complete bar to the claims of the father, mother, brothers, sisters and daughters of the deceased, who have all consequently a direct interest in the destruction of the widow. But in the upper provinces, where the Mitakshara is respected as the law of inheritence, according to which the rights of the surviving wife are more circumscribed, the relatives of the husband are not much interested in her death ; and in these provinces it is found that the Suttees are comparatively very rare.

'Fifthly.......the abolition of such a fertile source of intrigue and calculating cruelty cannot excite any apprehension of religious enthusiasm in those persons who are conscious of the unworthiness of the cause they advocate ; even if the Bengalees had possessed physical energy, and a warlike education.

'It might be alleged, that the British Government has pledged itself not to interfere with the religious rights of its Indian subjects ; but, it must not be forgotten, that according to common sense, as well as from a reference to precedent and the practice of the local government during the whole

period of its dominion in India, it is clear, that this rule was always unequivocally meant to apply to religious observances which are considered incumbent on the people, according to the principles of their own faith, and which are not a nuisance and outrage to public feeling. On this principle, the government, from time to time, prohibited various practices performed in the name of religion, such as the perambulation of the streets by Nagas, (or naked devotees), infanticide and suicide under the car of Juggannath, the self-destruction and public burning of lepers, human sacrifices, &c.&c.......on the score of nuisance, it (সতীদাহ প্রথা) is a source of greater offence and disgust to the public than the rest, from its being performed with more publicity and tumult, and exhibiting the most helpless of human beings expiring under the greatest sufferings. Therefore, a regard to consistency and its own character compelled the government to deal with this practice as they had done with the others before mentioned'।[২০৩] রামমোহন প্রকৃতপক্ষে, 'on principle......the right of the foreign Government to regulate the Hindu society by law'-এর সমর্থক ছিলেন।

Bentinck-এর সঙ্গে রামমোহনের যে আলোচনা হয় তার পূর্ণ চিত্রটি আমাদের কাছে নেই—হয়ত কোথাও লুকিয়ে আছে। এমতাবস্থায় সে আলোচনার ধারা সম্বন্ধে কিছুটা অনুমানের ওপর নির্ভর করা অসঙ্গত নয়—ঐতিহাসিক মাত্রেই তা করে থাকেন। যে মূল সূত্রগুলিকে ব্যবহার করে ঐতিহাসিক অতীতের একটা যুগের বা একটা অবস্থার বা একটা ঘটনার চিত্রটি পুনরঙ্কিত করেন, অনেক সময় সেগুলির মধ্যে কিছু কিছু ফাঁক থেকে যায়। সাধারণত অন্যান্য সম্পর্কিত সূত্রগুলির আলোকে ঐতিহাসিক অনুমানের দ্বারা সেই শূন্যস্থানগুলি পূর্ণ করেন। তাঁর অনুমান যে একেবারে সঠিক তা কেউই দাবী করেন না—প্রচারক ঐতিহাসিক ছাড়া। একটা বিষয়ের ওপর তাই ঐতিহাসিক সমীক্ষা, গবেষণা, ও বিশ্লেষণ চলে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে—'History is indeed an argument without end'।[২০৪] মনে হয়, সহমরণ প্রথা উচ্ছেদ সম্বন্ধে রামমোহন Bentinck-কে যা বলেন, এবং Bentinck সে সম্বন্ধে তাঁর সমীক্ষায় পাঠকদের যা বলেন, এ দুটোর মধ্যে একটা ফাঁক আছে। তবে সমগ্রভাবে বিচার করে একথা বলা অসঙ্গত হবে না

যে আলোচনার সময় রামমোহন সহমরণ নিরোধক আইন করার সম্ভাব্য বিপদের প্রতি Bentinck-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তাঁকে ইঙ্গিত দেন একটা বিকল্প পন্থা গ্রহণ করার যৌক্তিকতা সম্বন্ধে—আইন করার বিরোধিতা তিনি করেন না।

রামমোহন এবং Bentinck—সংস্কারক হিসাবে হিসাবে দুই ব্যক্তি ছিলেন বিভিন্ন ধাতের মানুষ। সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র দুটি পরিবেশে তাঁদের ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে। সহমরণ প্রথার উচ্ছেদের চেষ্টা করেন উভয়েই সমসাময়িক ইতিহাসের যন্ত্র এবং যন্ত্রী হিসাবে। কিন্তু Bentinck ছিলেন বিদেশী, বাইরের মানুষ—খৃষ্টান, utilitarian, উদার মানবতা-বাদী, ইংলণ্ডের বিশ্বদায়িত্বে বিশ্বাসী ভারত সাম্রাজ্যের সর্বেসর্বা। তিনি ভারতে আসেন 'white man's burden' বহন করতে। সহমরণ প্রথা উচ্ছেদ করার জন্য তিনি গ্রহণ করেন একটি বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত, পরিচয় দেন বিপুল সাহসিকতার। কিন্তু তা তিনি দেন বাইরের লোক হিসাবে। তাঁর সমস্যার ও সংগ্রামের প্রকৃতি ছিল স্বতন্ত্র। হিন্দুধর্ম বা হিন্দুদের সামাজিক আচার-বিচারের প্রতি তাঁর কোন শ্রদ্ধা ছিল না। সাম্রাজ্য শাসন ও রক্ষা করা, এবং মানবতার মূল্য প্রতিষ্ঠা করা—এই দুটি চিন্তা, তার দেশীয় প্রভাবের ফলে, তাঁর চিত্তে স্থিত হয় পরস্পরের পরিপূরক হিসাবে। সাম্রাজ্য হাত ছাড়া হয়ে গেলে শুধু যে ইংলণ্ডের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরাজয় ও ক্ষতি হবে তা নয়, মানবজাতির মঙ্গল করার একটা সুযোগও ইংলণ্ডের হাতছাড়া হয়ে যাবে। তবে সাম্রাজ্যের স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে তিনি হিন্দু বিধবার প্রাণরক্ষা করতে উদ্যোগী হতেন না: 'were I not convinced of the safety of total abolition, I certainly should have advised the cessation of all interference'। কিন্তু তাঁর প্রত্যয় এবং চরিত্র ছিল দৃঢ়। সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা [illegible] একটা আশঙ্কা সত্ত্বেও তিনি একটা ঝুঁকি নিয়েছিলেন, [illegible] তাঁর পূর্ববর্তী গভর্ণর-জেনারেলরা নিতে [illegible] সঠিক হয়—তাঁর ব্যক্তিগত আদর্শের [illegible] এই ঝুঁকি নেওয়াটা গভর্ণর-জেনারেল [illegible] পরিচায়ক। ভারতে তখন [illegible] আর কারোর নয়। তিনি [illegible] জন্যই, ভারতীয়

ইংরাজ শাসকদের প্রধান হিসাবে তিনি অন্ত্যজদের ভয় ভীতি অতিক্রম করেন, আবার অভারতীয় হিসাবে তিনি অগ্রাহ্য করেন হিন্দুদের শাস্ত্রের, পরম্পরায় এবং লোকাচারের অনুশাসনকে। তিনি তাঁরই অস্ত্রে, বাইরে থেকে পরাস্ত করেন হিন্দুদের প্রতিরোধকে।

অপরদিকে সহমরণ প্রথা উচ্ছেদের জন্য রামমোহন অবতীর্ণ হন এক তীব্র সংগ্রামে—হিন্দু সমাজের ভেতরের মানুষ হিসাবে, ধর্মপ্রাণ, হিন্দু ব্রাহ্মণ হিসাবে। রামমোহন নিজেকে প্রকৃত হিন্দু বলে মনে করতেন, নিজের ব্রাহ্মণত্ব বিসর্জন দেবার বিন্দুমাত্র প্রবণতা তাঁর ছিল না। ব্রাহ্মণত্বই ছিল তাঁর প্রেরণা, আত্মবিশ্বাস ও মর্যাদাবোধের উৎস। প্রাচীন ভারতে যে দৃপ্ত ব্রাহ্মণ কুল সমাজের বৌদ্ধিক ও নৈতিক পথপ্রদর্শকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন, আধুনিক ভারতে রামমোহন ছিলেন তাঁদের উত্তর পুরুষ। সুতরাং শাস্ত্রানুশাসনের যথার্থতা মানতে তিনি একটা বাধ্যতা অনুভব করেন। নিজেকে হিন্দু বলে পরিচয় দেব, অথচ শাস্ত্রানুশাসন মানব না, এটা সে যুগে ছিল একটা অসম্ভব ব্যাপার। তাই রামমোহনের সংগ্রাম ছিল শাস্ত্রের সংগ্রাম। তিনি যখন প্রকৃত হিন্দুধর্মকে উদ্ধার করতে প্রবৃত্ত হন, তখনও তাঁর অস্ত্র ছিল শাস্ত্র। হিন্দুদের হাত থেকে হিন্দু ধর্মকে উদ্ধার করাই ছিল তাঁর ব্রত। তিনি এমন একটি কথাও বলেননি যা শাস্ত্রানুমোদিত নয়। সহমরণ প্রথা যে অমানবিক, বর্বর, তা তিনি মর্মে মর্মে অনুভব করেন এবং সাহসভরে ঘোষণাও করেন, কিন্তু সে প্রথা উচ্ছেদ করার জন্ত তাঁর অস্ত্র হয় শাস্ত্র। তিনি ভাল ভাবেই জানতেন যে যাঁদের কাছে মানবতার মূল্য বিন্দুমাত্র নেই, তাঁদের কাছে মানবতার যুক্তি উপস্থিত করা নিষ্ফল। তাঁদের কাছে মূল্যবান ছিল শাস্ত্র এবং লোকাচার। তাই রামমোহন শাস্ত্র ঘেঁটেই তাঁর যুক্তি প্রতিষ্ঠা করেন, এবং খুলে দেন লোকাচারের ভণ্ডামীর ও নৃশংসতার মুখোস। শাস্ত্র থেকেই তিনি প্রমাণ করেন যে সহমরণ বাধ্যতামূলক নয়, সুতরাং তাকে বাধ্যতামূলক করা অশাস্ত্রীয়। রামমোহন হিন্দুদের ক্ষেত্রে দাঁড়িয়েই, তাঁদের ঘরের লোক হয়েই, তাঁদের অস্ত্রে তাঁদের পরাভূত করেন।

রামমোহন ছিলেন ঘরের শত্রু। তাই তাঁর দেশবাসী সহমরণ প্রথার সমর্থক হিন্দুরা তাঁর এবং তাঁর সহযোগীদের সম্বন্ধে বলেন যে তাঁরা 'have apostatized from the religion of their forefathers,......have defiled themselves by eating and drinking forbidden things

in the society of Europeans, and are endeavouring to deceive your Lordship in Council by assertions that there is no law regarding suttee practices...,'[২০৫] এবং আরও যে, 'Some blasphemous persons, whose minds are infected with atheism, misinterpret the meaning of the texts of several intelligent sages, through their incompetency to understand the genuine construction of the law'।[২০৬] মনে হয় রামমোহনের মত 'ধর্ম এবং ব্যবহার বর্জিত' মহাপাষণ্ডের প্রভাবেই Bentinck সহমরণ প্রথা উচ্ছেদ করার মত দুষ্কর্মে লিপ্ত হন।

বঙ্গদেশীয় ভদ্র, শিক্ষিত উচ্চবর্ণের হিন্দুসমাজে যাঁরা রামমোহনের বিরোধিতা করেন, তাঁরা শুধু দলে ভারী ছিলেন না, তাঁদের অনেকেই রামমোহনের চেয়ে ধনী ও প্রভাবশালী ছিলেন। তাঁরাই ছিলেন সমাজের নেতা, এবং তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ সংস্কারক হিসাবে এবং হিন্দু রমণীদের শুভাকাঙ্খী হিসাবে খ্যাতি লাভ করেন। এটা মনে হয় কোন ঐতিহাসিকের পক্ষেই অনুমান করা কঠিন নয় যে কত আত্মবিশ্বাস, প্রত্যয়ের দৃঢ়তা, প্রেরণার গভীরতা ও সাহস রামমোহনের ছিল, যার জন্য তিনি ওই সব হিন্দু সমাজপতিদের বিরোধিতা করতে সক্ষম হন। তিনি ছিলেন 'spirit of the times'-এর মূর্ত প্রতীক। সে সব কথা রমেশচন্দ্র তাঁর প্রবন্ধে উল্লেখ করার প্রয়োজন বোধ করেন নি। পণ্ডিত-ঐতিহাসিক বিচার করতে বসেন সহমরণ প্রথা উচ্ছেদে কার ভূমিকা মুখ্য এবং কার গৌণ। প্রমাণ করার চেষ্টা করেন—মায়ের চেয়ে মাসির দরদের মত—হিন্দু বিধবাদের প্রতি Bentinck-এর দরদ রামমোহনের চেয়ে অনেক বেশী ছিল। তাই Bentinck 'আপ্রাণ চেষ্টা' করে হিন্দু বিধবাদের জীবন রক্ষা করেন,—আর, রামমোহন যা করেন তা শুধু বাগাড়ম্বর। Bentinck আইন না করলে রামমোহনের চেষ্টা ব্যর্থ হত, যেমন পরবর্তীকালে সরকার আইন না করলে বিদ্যাসাগরের চেষ্টা ব্যর্থ হত। যে অভারতীয় খৃষ্টান আইন করে সহমরণ প্রথা উচ্ছেদ করেন, এবং যে ভারতীয় হিন্দু সে প্রথার উচ্ছেদ করা তাঁর জীবনের ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেন, তাঁরা উভয়েই ভারতবাসীর কৃতজ্ঞতার পাত্র, এবং মানবজাতির বন্ধু।

রামমোহন সমাজ-সংস্কারের বা সামাজিক পরিবর্তনের বিরোধী, একথা প্রমাণ করার জন্য রমেশচন্দ্র সংস্কার শব্দটিকে নিয়ে যে শুষ্ক তর্কের অবতারণা করেন তা পড়লে মনে হয় যে বিংশ শতাব্দীতে তিনি মধ্যযুগীয় 'realism' সম্বন্ধে একজন বিশেষজ্ঞ। সংস্কার ও পরিবর্তন, এ দুটির পারস্পারিক সম্পর্ক সম্বন্ধে পূর্বেই দু চার কথা বলা হয়েছে। মনে রাখা দরকার যে, যেমন ব্যক্তি-নিরপেক্ষ কোন সংস্কার ঘটতে পারে না, তেমনি মানুষের অনিচ্ছা এবং বাধা সামাজিক পরিবর্তনকে রোধ করতে পারে না। তবে সংস্কার একটি সম্পূর্ণ মানবিক প্রক্রিয়া তাই তার প্রকৃতি ও গতি নিরূপিত হয় সংস্কারকের শিক্ষা-দীক্ষা, ব্যক্তিত্ব, চিন্তা, সামাজিক মর্যাদা, পারিবেশিক পরিস্থিতি প্রভৃতির দ্বারা। সাধারণত মানুষের কল্যাণের দিকে দৃষ্টি রেখেই কোন অবস্থার বা ব্যবস্থার সংস্কার করার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু কিসে মানুষের কল্যাণ ঘটতে পারে সে বিষয়ে নানামুনির নানামত। সুতরাং কোন্ বস্তুর সংস্কার করা প্রয়োজন বা সম্ভব কি পদ্ধতিতে, এবং কতটুকু তা করা যেতে পারে ইত্যাদি, বহুলভাবে নির্ভর করে সংস্কারকের সমসাময়িক পরিবেশের ওপর। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ত্রিশ বছরে বঙ্গদেশে যাঁরা সহমরণ প্রথার উচ্ছেদের জন্য আন্দোলন করেন, তাঁরা ছিলেন সংখ্যালঘু, কিন্তু সরকারী উদ্যোগের ফলে তাঁদের আন্দোলন সফল হয়। আবার সরকারি উদ্যোগও রাতারাতি ঘটে না—সে উদ্যোগের মেজাজ গড়ে উঠতে সময় লাগে।

রামমোহন ছিলেন তাঁর নিজের কালের সংস্কারক, বিংশ শতাব্দীর নন। সুতরাং তাঁর সংস্কার কর্মের প্রকৃতি ও পদ্ধতি, তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী, ব্যক্তিত্ব এবং পরিবেশের দ্বারা প্রভাবিত হয়। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে তাঁর অনুগামীরা যে সব সংস্কার কর্মে প্রবৃত্ত হন, জীবিত থাকলে তার অনেক কিছুকেই হয়ত তিনি সমর্থন করতেন না। রামমোহনের সমসাময়িক, বঙ্গদেশের বিশিষ্ট সমাজপতি রাধাকান্ত দেব নারী শিক্ষার একজন উৎসাহী সমর্থক ছিলেন, কিন্তু তিনিই আবার সমাজে নারী হত্যা বহাল রাখার জন্য বিলাতে প্রিভি-কাউন্সিল পর্যন্ত যান। বিদ্যাসাগর বিধবা বিবাহের প্রবর্তন, এবং বহু বিবাহের নিবর্তনের জন্য হিন্দু সমাজে এক বিপুল আন্দোলন সৃষ্টি করেন, কিন্তু তিনিই আবার সহবাস সম্মতি আইনটিকে সমর্থন করতে অক্ষমতা জানান। এ রকম বহু দৃষ্টান্ত

আছে যে, সংস্কারক হিসাবে খ্যাত ব্যক্তিরা কখন কখন সংস্কার প্রচেষ্টার বিরোধিতা করেন। রামমোহন প্রতিষ্ঠিত আত্মীয় সভায় বাল্য বিবাহ, বহু বিবাহ প্রভৃতির নিন্দা করা হয়, তাঁর লেখায়ও তিনি সেগুলির নিন্দা করেন। কিন্তু সেগুলির নিবর্তনের জন্য তিনি এবং তাঁর সহযোগীরা কোন প্রত্যক্ষ আন্দোলনে অবতীর্ণ হন নি। হয়ত, তা করার তাঁরা সুযোগ পান নি, বা তা সময়োচিত মনে করেন নি, বা সতীদাহ নিবারণ করার ওপর তখন তাঁরা প্রাথমিক গুরুত্ব দেন। তাই বলে সেগুলি সম্বন্ধে তাঁরা নিরুৎসাহী ছিলেন, একথা মনে করা ঠিক নয়। রামমোহন শাস্ত্রের প্রামাণ্য গ্রহণ করেন বলে তাঁকে সংস্কার বিরোধী বলা অর্থহীন। তাঁর আমলে শাস্ত্র যেমন ছিল সব গোঁড়ামি ও রক্ষণশীলতার একটা প্রধান আধার, তেমনি আবার তা ব্যবহার করা হয় সংস্কারের ও সামাজিক পরিবর্তনের অস্ত্র হিসাবে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বঙ্গদেশের পরিবেশ সংস্কারের যতটা অনুকূল ছিল, দ্বিতীয়ার্ধে তার আরও বৃদ্ধি ঘটে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম চল্লিশ বছরে ভারতীয় সমাজের পরিবর্তন যে গতিতে চলে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর তা অনেক বৃদ্ধি পায়। আজকের দিনে সম্পূর্ণ নিরক্ষর, মূঢ় পুত্রও তার 'মা'-কে সহমৃতা হতে প্ররোচিত করেনা, কিন্তু রামমোহনের কালে অতি উচ্চশিক্ষিত, বুদ্ধিমান ব্যক্তিরাও সহমরণ প্রথার উৎসাহী সমর্থক ছিলেন। রামমোহন, 'এটা করেন নি' বা 'ওটা করেন নি,' এই ধরণের অভিযোগ অর্থহীন। তিনি কিছু সংস্কার করেছিলেন, অনেক কিছু করার পরিকল্পনা ও চেষ্টা করেছিলেন, এবং সর্বোপরি, তাঁর চিন্তা ও কার্যকলাপ সামাজিক পরিবর্তনের একটা মেজাজ, মানসতা ও গতীয় সৃষ্টি করে, যা পরবর্তী প্রায় দেড়'শ বছর ধরে ভারতের জাতীয় জীবনকে কোন না কোন ভাবে প্রভাবিত করে। 'বাংলা আজ যা ভাবছে, ভারত তা ভাববে কাল,' গোখলের এই কথাটা ভারতীয় ইতিহাসের কোন পর্যায়ে যদি সত্য হয়ে থাকে, তাহলে আজকের বাঙ্গালী ও ভারতবাসী গর্ব ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করবে রামমোহনের কথা। ভারতের আধুনিক ইতিহাসে তিনিই প্রথম ব্যক্তি, যিনি আগামীকালের ভাবনা, 'আজ' ভাবেন।

বিদ্রোহী ও সংস্কারক রামমোহন উপবীতধারী ব্রাহ্মণ হিসাবেই ইতিহাসের মঞ্চে অবতীর্ণ হন, এবং হয়ত ব্রাহ্মণ বলেই তাঁকে অত বেশী নিন্দা ও বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়। আজকের দিনে উপবীত ধারণ না করেও হিন্দু ব্রাহ্মণ হিসাবে সমাজে পরিচিত হওয়া যায়, কিন্তু রামমোহনের আমলে তা ছিল

অসম্ভব। আবার রামমোহনের কালে এমন কিছু হিন্দুরও আবির্ভাব ঘটে যাঁরা হিন্দুধর্মের ধ্বংস চান। কিন্তু তা ঘটে নি, ঘটা সম্ভবও ছিল না। তাঁরা রামমোহনকে সমালোচনা করেন নরমপন্থী বলে।

ব্রাহ্মণ রামমোহন যে তাঁর বর্ণসংস্কার সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করেন নি, তা অবশ্যই সত্য। কিন্তু অনেকটা যে করেছিলেন, সে কথা রমেশচন্দ্র নিজেই তাঁর প্রবন্ধে উল্লেখ করেন; এবং তার জন্য তাঁর 'অনন্যসাধারণ উদারতার' তারিফ করেন। নিশ্চয় ধরে নিতে হবে যে, যুগের পরিপ্রেক্ষীতে বিচার করেই রমেশচন্দ্র রামমোহনের উদারতাকে 'অনন্যসাধারণ' বলে বর্ণনা করেন, এবং যা বলেন, তা তিনি বিশ্বাসও করেন। তবে, আর জাতিভেদ প্রথার সংস্কার 'রামমোহনের নীতি বিরুদ্ধ বলিয়া গণ্য করিতে হইবে' কেন? রামমোহন যে, একজন 'radical' ছিলেন না, এবং তাঁর সমসাময়িক উগ্রপন্থী যুবকদের কার্য কলাপ যে তিনি সমর্থন করেন নি, এ সব, জানা কথা। কিন্তু তবুও হিন্দু বর্ণাশ্রম ধর্মের পরিপোষকরা তাঁকে 'ধর্ম এবং ব্যবহার বর্জিত' বলে অবজ্ঞা করেন।

রামমোহনের সংস্কার বিরোধিতা প্রমাণ করার জন্য রমেশচন্দ্র বিষয়টি সম্বন্ধে তাঁর বন্ধু William Adam-এর প্রামাণ্য উল্লেখ করেন। Adam-এর একটি উক্তিকে ভাষান্তরিত করে তিনি বলেন 'বর্তমান হিন্দুসমাজের খাদ্যাখাদ্য সম্বন্ধে সমস্ত বিধিনিষেধ তিনি মানিয়া চলিতেন। তিনি শাস্ত্রে ব্রাহ্মণের পক্ষে নিষিদ্ধ কোন খাদ্য আহার করিতেন না, অহিন্দু অন্য জাতির সহিত প্রকাশ্যে একত্র ভোজন করিতেন না যদিও গোপনে প্রায়ই এই নিয়ম লঙ্ঘন করিতেন'(৪২) 'এইবার Adam-এর মূল উক্তিটি উদ্ধৃত করা যেতে পারে: 'All the rules in the present state of Hindu socicty he finds it necessary to observe, relate to eating and drinking. He must not eat of the food forbidden to Brahmins nor with persons of a different religion from the Hindu or of a different caste or tribe from his own. This is the only remnant of the rules of caste to which he still adheres, and even this remnant I have reason to know he frequently but secretly disregards··· Both in marriages and deaths that happen within his domestic circle he rigidly abstains in his own person from every

approach to the idolatrous rites usually practised on such occasions, although he does not prohibit the other members of his family from engaging in them if they think proper'।[৫০৭] পাঠকরাই বিচার করবেন কত নিষ্ঠার সঙ্গে রমেশচন্দ্র Adam-এর বক্তব্যটি তাঁর বাঙালী পাঠকদের পরিবেশন করেন। উক্তিটি মন দিয়ে পড়লে সত্যই কি মনে হয় জাতিভেদ প্রথার সংস্কার 'রামমোহনের নীতিবিরুদ্ধ' ছিল ?

রামমোহনকে আজ আমরা যতই উদারচেতা, সংস্কারবাদী ও যুক্তিনিষ্ঠ আধুনিক মানুষ বলে মনে করি না কেন, ভুলে গেলে চলবে না যে তাঁর সে আধুনিকতা ছিল তাঁর যুগের আধুনিকতা—আজকের যুগের নয়। ব্রাহ্মণের উপবীত একটা প্রতীক—অবশ্যই মর্যাদার প্রতীক। তবে আজকের দিনের মুক্তমনা, বুদ্ধিমান সমীক্ষকের ঐতিহাসিক চেতনায় তা ঘৃণা, অবজ্ঞা, ঔদ্ধত্য ও একটা সংকীর্ণ মানসিকতার প্রতীকও বটে। বর্তমানে অনেক হিন্দু ব্রাহ্মণ জাতিভেদ মানেন না বলে দাবী করেন, কিন্তু তাঁরা তাঁদের উপবীত ও আহার-বিহারের সংস্কার ত্যাগ করেন নি। আপন রুচি অনুযায়ী হিন্দু সংস্কারগুলির প্রতি আসক্ত থেকেও, বর্ণ সংস্কারের যে ব্যাপারগুলিকে তাঁরা দুষ্ট মনে করেন সেগুলিকে তাঁরা নিন্দা করেন, বর্জনও করেন। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে, উদার ব্রাহ্মণদের ওই মনোভাব এবং ব্যবহার হয়ত মহানুভবতার লক্ষণযুক্ত আত্মপ্রবঞ্চনা বলে মনে হতে পারে। কিন্তু আজ থেকে দেড়শ বছর আগে তা প্রকৃত উদারতা, মহদাশয়তা, ও মানবহিতৈষণার লক্ষণ হিসাবে আন্তরিক স্বীকৃতি লাভ করে। সুতরাং, রামমোহনের চিন্তা ও আচরণের মধ্যে যে অসঙ্গতি আজ আমরা লক্ষ্য করি, তাঁর সময়ে, তাঁর দৃষ্টিতে সেটি ধরা পড়েনি—তিনি অবশ্যই মনে করেন যে তাঁর পথ সঠিক ও যুক্তিসঙ্গত। তাই তিনি হিন্দুদের বর্ণসংস্কারকে যেমন নিন্দা করেন, তেমনি আংশিকভাবে তার প্রতি অনুরক্তও থাকেন। তাঁর কালে সেটাই ছিল এক অভূতপূর্ব ব্যাপার, একটা সাংঘাতিক প্রগতিশীলতা।

সংস্কারকের মনও থাকে সংস্কারবিদ্ধ। সুতরাং তাঁর চিন্তা এবং সংস্কারকর্ম স্বভাবতই হয় গণ্ডীবদ্ধ। প্রশ্ন হল তিনি সংস্কারের ক'টা গণ্ডী পার হয়েছেন। কোন সংস্কারকের পক্ষেই যাকে বলে 'deracinated,' তা হওয়া অসম্ভব। ইতিহাসে যাঁরা বিপ্লবী বলে খ্যাত, তাঁদের কাছেও এটা একটা বৃহৎ সমস্যা।

সেইজন্যই অনেক বিখ্যাত বিপ্লবীর বিরুদ্ধেই অভিযোগ ওঠে অবিপ্লবী-সুলভ মানসতা ও প্রবণতার এবং বিপ্লব-বিরোধী কার্যকলাপের। এটা ইতিহাসের দ্বান্দ্বিক চরিত্রটিকে সূচিত করে, এবং এইজন্যই এ ব্যাপারগুলি ইতিহাসের এক কঠিন সমস্যা হয়ে দেখা দেয়।

রামমোহনও ছিলেন একজন ছোটখাটো জমিদার। অন্যান্য সূত্রে আয় ছাড়াও, জমিদারীর আয় থেকেও তাঁর খরচ চলত, এবং সে খরচের পরিমাণ কিছু কম ছিল না। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে অন্যান্য জমিদারদের মত তিনিও উপকৃত হন। কিন্তু তবুও তিনি সে বন্দোবস্তের কঠিন সমালোচনা করেন। তিনি লক্ষ্য করেন জমিদার শ্রেণীর গৃধ্নুতা, দুর্নীতি ও উৎপীড়ন, এবং রায়তদের শোচনীয় দুর্দশা এবং অবস্থার ক্রমাবনতি। কিন্তু, তিনি সে ব্যবস্থার উচ্ছেদ চান না, চান তার সংস্কার। সহজ কথায় নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থ বিসর্জন না দিয়ে সে ব্যবস্থাটিকে দোষমুক্ত করার জন্য সরকারকে প্রয়োচিত করেন; অর্থাৎ, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত যেমন জমিদারদের কাছে তেমনি রায়তদের কাছেও যাতে গ্রহণীয় হয়, সেই চেষ্টাই করেন। সেটাই তাঁর সংস্কারক চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ছিল। তিনি বুঝতে পারেননি যে সমাজে জমিদারদের স্বার্থ এবং রায়তদের স্বার্থ, এ দুটি ব্যাপারের মধ্যে কোন আপোষ হওয়া সম্ভব নয়—ব্যাপার দু'টি সম্পূর্ণ পরস্পরবিরোধী।

তেমনি, হিন্দুদের জাতিভেদ প্রথা যে জাতীয় ঐক্যের পরিপন্থী এবং নানা সামাজিক দুর্নীতির আধার তার জন্য ক্ষুব্ধ হলেও হিন্দুদের বর্ণসংস্কারকে একেবারে বর্জন করার বা বর্ণব্যবস্থাকে ওলটপালট করে দেবার চিন্তা তাঁর মনে আসেনি। তিনি সে গুলোর সংস্কার চান জাতীয় এবং সামাজিক স্বাস্থ্য, ঐক্য ও অগ্রগতির সহায়ক হিসাবে। এছাড়াও, উপবীত ত্যাগ করলে তখনকার দিনে তিনি সমাজে হিন্দু হিসাবে স্বীকৃতি পেতেন না। তাতে তাঁর ঐহিক স্বার্থের হানি ঘটবার যেমন আশঙ্কা ছিল, তেমনি হিন্দুসমাজের প্রতিনিধি ও সংস্কারক হিসাবে সমাজে তাঁর কোন মর্যাদা থাকত না। শুধু তাই নয়, শাস্ত্রজ্ঞ হয়েও, তিনি হিন্দু ব্রাহ্মণ হিসাবে শাস্ত্রালোচনার অধিকার থেকে হয়ত বঞ্চিত হতেন।

আর একটা কথা। খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে রামমোহন যেসব বিধি-নিষেধ পালন করেন, বর্তমান কালের আধুনিক দৃষ্টিসম্পন্ন হিন্দুরা তা' সাধারণভাবে উপেক্ষা করে থাকেন। প্রকৃতপক্ষে, আজকের দিনে সেগুলিকে

আঁকড়ে থাকা মোটেই কার্যকর নয়—বেশ হাস্যকরও বটে। তবুও আজ, রামমোহনের জন্মের দু'শো বছর পরেও ভারতবর্ষের ক'জন হিন্দু জাতিভেদের সংস্কার থেকে নিজেদের মনকে সম্পূর্ণ মুক্ত করতে পেরেছেন বা সাংবিধানিক ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও, হিন্দুসমাজ থেকে জাতিভেদ প্রথা কতটুকু দূর হয়েছে? আজও ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনের মান উন্নয়নের পথে বৃহৎ হিন্দুসমাজের জাতি ও ধর্মসংস্কার একটা প্রচণ্ড বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। রামমোহন সর্বহারা বিপ্লবী ছিলেন না। তিনি ছিলেন উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণ, ধনী, শিক্ষিত, যুক্তিবাদী, সংস্কারবাদী ভদ্রলোক—ভারতের ইতিহাসে এক নতুন ধরণের মানুষ। এক নতুন আলোকে সে ইতিহাস তিনি সমীক্ষণ করেন। সহজ কথায়, দেশবাসীর জীবনের মান উন্নত করাই ছিল তাঁর জীবনের লক্ষ্য ও সংগ্রাম। সে লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য এবং দেশবাসীর সামনে একট ব্যক্তিগত দৃষ্টান্ত উপস্থিত করার জন্য, যে সংস্কার বর্জন করা তাঁর পক্ষে যতটুকু সম্ভব এবং তাঁর কাছে যতটুকু যুক্তিযুক্ত মনে হয়, তাই তিনি করেন। আজকের ঐতিহাসিক সমালোচক তাঁর কার্যকলাপকে সংস্কারবিরোধী বলবেন কিনা, সে চিন্তা তাঁর ছিল না। আজকের ঐতিহাসিক পরীক্ষা করবেন যেমন তাঁর মহত্ত্ব ও কৃতিত্ব, তেমনি তাঁর চিন্তার সীমিততা ও স্ববিরোধিতা, ইতিহাসের অণুবীক্ষণ যন্ত্রে। সে পরীক্ষা কি প্রকৃতই প্রমাণ করে যে তিনি সংস্কারবিরোধী ছিলেন? সংস্কার-বিরোধিতাই যদি রামমোহনের নীতি হয়, তাহলে তাঁর আচার-বিচার যাঁদের প্রাণে আঘাত দেয়, যাঁরা তাঁকে এক মূর্তিমান কালাপাহাড় বলে মনে করেন, বলতে হয়, সেই সব নিষ্ঠাবান, ব্রাহ্মণ, অব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও বিজ্ঞ ব্যক্তিরা প্রচণ্ড মূর্খ ছিলেন।

কোন ঐতিহাসিকই শূন্যমনে গবেষণায় এবং রচনায় প্রবৃত্ত হন না। কাজে নামার আগে তাঁর মনে তাঁর বিষয়টি সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা এবং বক্তব্য থাকে—তিনি একটা কিছু বলতে চান, প্রমাণ করতে চান। সমস্যা হচ্ছে যে, তাঁর ধারণা বা বক্তব্য তথ্যের আলোতে প্রয়োজনমত পরিবর্তিত করার প্রবণতা তাঁর আছে কিনা। এই প্রবণতার ওপর খুবই নির্ভর করে কোন্ তথ্য তিনি গ্রহণ করবেন, কোন্ তথ্য বর্জন করবেন, এবং কোন্ তথ্যকে কিভাবে ব্যবহার করবেন। রামমোহনের কীর্তি সম্বন্ধে রমেশচন্দ্রের ধারণা এবং বক্তব্যটা তাঁর গত কয়েক বছরের রামমোহন সম্বন্ধীয় কিছু রচনায় বিশেষভাবে প্রকটিত।

'The evil that men do lives after them ;
The good is oft interred with their bones.'

রামমোহন শৈব বিবাহের সমর্থক ছিলেন বলে রমেশচন্দ্র ক্ষুব্ধ। তাঁর মতে সে বিবাহ 'would be regarded today as tantamount to concubinage'।[২০৮] মন্তব্যটিতে 'today' শব্দটি যোগ করে, ধরে নিতে হবে, রমেশচন্দ্র বলতে চান যে, এককালে শৈব বিবাহ সিদ্ধ ছিল। তাহলে আর রামমোহনের অপরাধ কি, বা রমেশচন্দ্রেরই বা ক্ষোভের কারণ কি? যাই হক, প্রসঙ্গটি উত্থাপন করে রমেশচন্দ্র ইঙ্গিত করেন যে হিন্দুদের সমাজজীবনকে দূষিত করার জন্য রামমোহন আরও একটি কুপ্রস্তাব করেন। হিন্দুদের কোন্ বিবাহকে রমেশচন্দ্র সিদ্ধ এবং বিশুদ্ধ মনে করেন তা বোঝা কঠিন। প্রাচীন হিন্দুসমাজে বিবাহের বহু পদ্ধতি অনুসৃত হত। প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রকারেরা সেগুলির অধিকাংশকেই সিদ্ধ বলে গণ্য করেন – তবে সেগুলির কয়েকটি ছিল উৎকৃষ্ট পদ্ধতি, কয়েকটি নিকৃষ্ট। বিষয়টি সম্বন্ধে অতীতে বহু মত প্রচলিত ছিল। শোনা যাক মনু কি বলেন: 'আনুপূর্বক্রমে ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য, আসুর ও গান্ধর্ব্ব এই ছয় প্রকার বিবাহ ব্রাহ্মণের পক্ষে ধর্মজনক; ক্ষত্রিয়ের পক্ষে আসুর, গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস ও পৈশাচ এই চারিপ্রকার বিবাহ ধর্ম্মজনক এবং বৈশ্য ও শূদ্রের পক্ষের আসুর, গান্ধর্ব্ব ও পৈশাচ এই তিন প্রকার বিবাহ ধর্ম্মজনক বলিয়া জানিবে' (৩।২৩)। 'এই মানব শাস্ত্রমতে প্রাজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস ও পৈশাচ এই পাঁচ প্রকার বিবাহের মধ্যে প্রাজাপত্য, গান্ধর্ব্ব ও রাক্ষস এই তিন প্রকার বিবাহ, সকল বর্ণের ধর্ম্য, অবশিষ্ট পৈশাচ ও আসুর বিবাহ সকল বর্ণেরই অকর্ত্তব্য' (৩।২৫)। আজকের দিনে হিন্দু সমাজে রাক্ষস পদ্ধতিতে বিবাহিতা পত্নী কি মর্যাদা পাবেন?

ভারতবর্ষ চিরকালই বহু সংস্কৃতির দেশ। চিরকালই, বিশেষভাবে বৃহৎ হিন্দু সমাজের ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনের আচার বিচার, রীতি-নীতিগুলির আঞ্চলিক বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্যই ভারতীয় সংস্কৃতির সবিশেষ বৈশিষ্ট্য। আজও হিন্দু সংস্কারগুলি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন প্রথায় ও পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হয়। হিন্দুদের মধ্যে কতকগুলি ধর্মীয় গোষ্ঠী ও প্রতিষ্ঠান নিজেদের উদ্ভাবিত পদ্ধতিতে বিবাহাদি সংস্কারের অনুষ্ঠান করে থাকেন। এছাড়াও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের, বা উচ্চনীচ নির্বিশেষে বিভিন্ন বর্ণের স্ত্রী পুরুষ নানা পদ্ধতিতে পরস্পরের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। এ সবই সিদ্ধ। সুতরাং এক

গোষ্ঠীর বিবাহ পদ্ধতি অন্য কোনো গোষ্ঠী অনুমোদন না করতে পারেন, কিন্তু তাকে জঘন্য বলা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক, অর্থহীন, ও সঙ্কীর্ণতার পরিচায়ক। তান্ত্রিক আচার অনুযায়ী শিব, দুর্গা, কালী প্রভৃতি জনপ্রিয় দেবদেবীর পূজা যদি সিদ্ধ হয়, তবে তান্ত্রিক মতে শৈব বিবাহ 'concubinage' বলে গণ্য হবে কেন? এবিষয়ে রমেশচন্দ্রের ব্যক্তিগত মতামত সকলের-কাছে গ্রাহ্য নাও হতে পারে।

হিন্দু বিধবার বিবাহ শাস্ত্রানুযায়ী সিদ্ধ, বিদ্যাসাগরের এ যুক্তি অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি জঘন্য বলে নিন্দা করেন। ১৮৭২ সালে যে নতুন বিবাহ আইন পাশ হয় তখন তারও নিন্দা ও বিরোধিতা করার মানুষের অভাব ছিল না। বিধবা বিবাহ অশাস্ত্রীয় ছিল না, ছিল অপ্রচলিত, তাই তা পুনঃ-প্রচলনের জন্য আইন করতে হয়। সে আইন পাশ হবার পূর্বে কোন ব্যক্তি হিন্দু শাস্ত্রীয় অনুশাসন অনুযায়ী, প্রচলিত অনুষ্ঠানের দ্বারা কোন বিধবাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করলে, সে স্ত্রী সাধারণভাবে সমাজে 'concubine' হিসাবে অবজ্ঞাত হতেন, যদিও সে বিবাহের যথার্থতা শাস্ত্রে স্বীকৃত। শৈব বিবাহ রামমোহন উদ্ভাবন করেন নি। সে বিবাহকে সমর্থন করে কোন অশাস্ত্রীয় কাজও তিনি করেন নি। তিনি একটা অপ্রচলিত ব্যবস্থাকে সমাজের সর্বস্তরে চালু করার প্রস্তাব করেন মাত্র। তাঁর সে প্রস্তাবের মূল তাৎপর্য ছিল মানবিক। তাঁর যুক্তি ছিল সহজ—হিন্দু নারীর মর্যাদা, মুক্তি ও কল্যাণের অনুকূল। তিনি বলেন: 'বৈদিক বিবাহের স্ত্রী জন্ম হইবা মাত্রেই পত্নী হইয়া স্থিতি করে এমত্ নহে, বরঞ্চ দেখিতেছি যাহার সহিত কোন সম্বন্ধ কল্য ছিল না সে যদি ব্রহ্মার কথিত মন্ত্রবলে শরীরের অর্দ্ধাঙ্গভাগিনীঅন্ত হয় তবে মহাদেবের প্রোক্ত মন্ত্রের দ্বারা গৃহীতা যে স্ত্রী সে পত্নীরূপে গ্রাহ্য কেন না হয়?'[২০৯] তন্ত্রবাক্যের প্রামাণ্যে তিনি আরও বলেন: 'শৈব বিবাহে বয়স ও জাতি ইহার বিচার নাই কেবল সপিণ্ডা না হয় এবং সভর্তৃকা না হয় তাহাকে শিবের আজ্ঞাবলে শক্তিরূপে গ্রহণ করিবেক'।[২১০] শৈব বিবাহে সম্মতি দিয়ে সরকার যদি একটা আইন তখন পাশ করতেন, তাহলে সে বিবাহও অবশ্যই সিদ্ধ হত। সংস্কারক হিসাবে নাম কেনার বা একটু নতুন কিছু করার জন্য রামমোহন বা বিদ্যাসাগর হিন্দু বিবাহের সংস্কারে প্রবৃত্ত হন নি। তাঁদের লক্ষ্য ছিল অবহেলিত এবং নির্যাতিত নারী জাতির দুর্দশা লাঘব করা, এবং সামাজিক মর্যাদা লাভের তাদের সহজ অধিকারকে প্রতিষ্ঠা করা। তাতে যদি বর্তমানে রমেশচন্দ্রের আপত্তি থাকে ত বলার কিছু নেই।

রমেশচন্দ্র তাঁর প্রবন্ধে ইঙ্গিত করেন যে রামমোহনের দেশপ্রেম ছিল ভুয়া। এক জায়গায় তিনি বলেন '১৮২৩ খ্রীঃ মুদ্রাযন্ত্র আইন (Press ordinance) এবং ১৮২৭ খ্রীঃ জুরী আইন (Jury Act) পাশ হওয়ায় রামমোহন তাহার যে তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, সফল না হইলেও ভারতের রাজনীতিক ইতিহাসে ইহা যে মূল্যবান অবদান তা অনস্বীকার্য' (৪৪)। এরপরই লেখেন 'কিন্তু উনিশ শতকের নবজাগরণে যে রাজনীতিক স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল—যাহা হিন্দু কলেজের শিক্ষক ডিরোজিও ও ছাত্র কাশীপ্রসাদ ঘোষ কবিতায় রামমোহনের জীবিতকালে এবং হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের কবিতায় উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল—তাহার কোন আভাস রামমোহনের জীবনে ও কর্মে পাই না।' রমেশচন্দ্র আরও বলেন যে রামমোহনের মতে 'জাতীয় স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা……একটা পাগলামি' মাত্র। তিনি ব্যঙ্গ করেন 'দক্ষিণ আমেরিকায় স্পেন দেশের উপনিবেশগুলির স্বাধীনতায়' (৪৫) রামমোহনের আনন্দকে। এ ছাড়াও তিনি ইঙ্গিত দেন যে রামমোহন ছিলেন ইংরাজ শাসনের একজন স্তাবক।

রমেশচন্দ্রের কথাগুলির সারবত্তা আলোচনা করা দরকার। বিশেষ করে কথাগুলো যখন বেশ ঘোরাল—যথা, ব্রিটিশ শাসনের কিছু অপচারের বিরুদ্ধে যে 'তীব্র প্রতিবাদ ভারতের রাজনীতিক ইতিহাসে…মূল্যবান অবদান', তা উনিশ শতকের ভারতীয় নবজাগরণের পক্ষে মূল্যহীন; অর্থাৎ, রামমোহনের রাজনৈতিক কার্যকলাপ মূল্যবান হলেও, তা ভারতীয় নবজাগরণের প্রেরণার একটা প্রতিবিম্ব বলে মনে করা ঠিক নয়; দুটি ব্যাপারের মধ্যে কোন যোগসূত্র নেই। আরও, দেশের রাজনীতিক স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা যদি দেশপ্রেমের একটা লক্ষণ বলে ধরা হয়, তাহলে, রামমোহনের জীবনে ও কর্মে সে লক্ষণের কোন পরিচয় মেলে না—ইত্যাদি।

'রাজনীতিক' বা 'জাতীয় স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা', দেশপ্রেম প্রভৃতি শব্দগুলির যে অর্থ অভিধানে মেলে, আর যে অর্থ ইতিহাস নির্ধারণ করে দেয়, তাদের মধ্যে বহুৎ ফারাক আছে। ঐতিহাসিকের বিবেচ্য আভিধানিক অর্থগুলি নয়, ঐতিহাসিক অর্থগুলি। যে কোন বস্তুর বা ব্যাপারের—ঈশ্বর শুদ্ধ,—সত্যটির পরিচয় তার মধ্যে মেলে না, মেলে তার ইতিহাসের মধ্যে। গত দু'শ পঞ্চাশ

বছরে ভারতবাসীর দেশপ্রেমের বিন্যাসটির চরিত্রের রহস্য কোন অভিধানে মিলবে না, মিলবে ওই সময়ের ইতিহাসে। ব্যাপারটির একটু ঐতিহাসিক ভূমিকা দরকার। তবে তার আগে আর একটা কথা। এটা একটা মোটা সত্য যে ইংরাজরা ভারতকে শৃঙ্খলিত করে। ওই সঙ্গে এও বলা যায় যে ইংরাজরা ভারতকে মুক্ত করে। পরস্পর বিরোধী ওই দুটো ব্যাপারের মধ্যেই, গত দু'শ বছরের ইঙ্গ-ভারতীয় ঐতিহাসিক সম্পর্কটির রহস্য নিহিত আছে। একথা বলা হয় যে 'By the middle of the eighteenth century the Company began to build up its territorial power in India. The internal wars which racked India in the eighteenth century after the decline of the Mogul Empire represented a period of inner confusion (comparable in some respects to the Wars of the Roses in England or the Thirty Years War in Germany) necessary for the break-up of the old order and preparing the way, in the normal course of evolution, for the rise of bourgeois power on the basis of the advancing merchant, shipping and manufacturing interests in Indian society. The invasion, however, during this critical period of the representatives of the more highly developed European bourgeoisie, with their superior technical and military equipment and social-political cohesion, thwarted this normal course of evolution, and led to the outcome that the bourgeois rule which supervened in India on the break-up of the old order was not Indian bourgeois rule, growing up within the shell of the old order, but foreign bourgeois rule, forcibly superimposing itself on the old society and smashing the germs of the rising Indian bourgeois class'।[২১১] ভারতবর্ষের বৃহৎ আয়তন, সাংস্কৃতিক বৈচিত্র ও ভিন্নতা, রাজনৈতিক বাঁধুনির চিরকালের অভাব, মোগল যুগের সামাজিক গঠন প্রভৃতি, আমার মনে হয়, ওই ধরণের সিদ্ধান্ত ও সামান্তীকরণের প্রতিপাদক নয়। সে অবস্থাটাকে ভারতীয় ইতিহাসের একটা 'tragedy' মনে করা যেতে পারে, কিন্তু যদি তা না ঘটত তাহলে 'Indian development' কি হত তা সবটাই অনুমান-নির্ভর। আর,

ইংরাজদের ভারতাগমনটা যদি একটা ঐতিহাসিক আপতন হয়ে থাকে, তাহলেও সেটার বাস্তবতাকে অস্বীকার করা যায় না। সুতরাং, সেই ব্যাপারটির আলোচনা ও বিশ্লেষণ করাই ঐতিহাসিকের দৃষ্ট লক্ষ্য।

উনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গদেশীয় জীবনের ঐতিহাসিক চলচ্চিত্রটির প্রকৃত বৈশিষ্ট্য হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব প্রধানত সেখানে ইংরাজদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠার আলোকে। ভারতবর্ষে ব্রিটিশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ঐতিহাসিক ভূমিকার সহজ রূপটির প্রথম প্রতিফলন ঘটে বঙ্গদেশে। সেখানেই ঘটে ভারতের আধুনিক ইতিহাসের সৃষ্টি—ইঙ্গ-ভারতীয় যৌথ উদ্যোগে। নবাব মুর্শিদকুলী বা শুজাউদ্দিন বা আলীবর্দী—এঁরা সকলেই শাসক হিসাবে নিজেদের কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে যান। কিন্তু সে কৃতিত্ব মূলত সীমিত ছিল একটা জরাগ্রস্ত, মুমূর্ষু ব্যবস্থাকে কোন রকমে বাঁচিয়ে রাখার প্রাণপণ চেষ্টার মধ্যে। বঙ্গদেশীয় জীবনে কোন নতুন সঞ্জীবনী নিয়ন্দিত করতে, বা কোন গতীয় সৃষ্টি করতে তাঁরা ব্যর্থ হন। তাঁরা অনেক কৌশল ও কলহ, অনেক হৈচৈ ও হানাহানি করেন, কিন্তু কিছু গড়তে পারেন না। যাঁরা গড়েন তাঁরা কাজ করেন নিঃশব্দে। সে গঠন-প্রক্রিয়া ভাল কি মন্দ তা অবান্তর প্রশ্ন। আসল কথা, সেই ভগ্নদশার মধ্যে যে একটা নতুন কিছু গড়ে উঠছে তা স্পষ্টই উপলব্ধি করা যায়—ইতিহাসের রায় যুগপৎ ঘোষণা করে একটা মৃত্যু এবং একটা জন্মকে, সূচীত করে একটা 'tragedy'-কে এবং একটা প্রত্যাশাকে। অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়া থেকেই বৈষ্ণবদাস শেঠ, গোবিন্দরাম মিত্র, অক্রূর দত্ত, গোকুল ঘোষাল, শোভারাম বসাক প্রভৃতি উদ্যোগী পুরুষেরা বঙ্গদেশে ইংরাজদের উপস্থিতির পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেন। প্রভূত বুদ্ধিমান এবং উদ্‌যুক্ত, তাঁদের প্রতিভার প্রস্ফুরণের প্রধান সহায় হয় ব্রিটিশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী। তাঁদের অনেকেই দেশে নবাবী শাসনের সুদিন ও দুর্দিন প্রত্যক্ষ করেন। কিন্তু দেশের রাজনৈতিক দুর্দশায় তাঁরা মোটেই বিচলিত হন না, বরং মনেপ্রাণে তাঁরা নবাবী দুঃশাসনের উচ্ছেদই কামনা করেন। তাঁরা জানতেন যে তাঁদের ভবিষ্যৎ নবাবদের হাতে মোটেই নিরাপদ নয়—ধনোৎপাদনকারী বিদেশী বণিকরাই তাঁদের বৈভবের উৎসমুখ। তাই, তাঁদের ভাগ্যের গাঁটছড়া তাঁরা বিদেশী ইংরাজদের সঙ্গেই বাঁধেন। আধুনিক ভারতের আবাদকরণে তাঁরাই প্রথমযুগে ছিলেন ইংরাজদের প্রধান সহযোগী। তখন থেকেই শুরু হয় ইঙ্গ-ভারতীয় উপনিবেশিক 'symbiosis'টি।

অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে সুবা বাংলায় ইংরাজ কোম্পানীর রাজনৈতিক সাফল্য আধুনিক ভারতীয় ইতিহাসের প্রধান অনুঘটক হয়ে দেখা দেয়। ১৭৬৫ সালের ঐতিহাসিক বন্দোবস্তের পর থেকে বঙ্গদেশীয় পরিবর্তন কোন দামামা ধ্বনিতে ঘোষিত হয়নি। এক নিঃশব্দ ব্যস্ততায় তা দেশের জীবনকে আলোড়িত করতে থাকে। সে ব্যস্ততায় ইতিমধ্যে, পূর্বগামীদের সঙ্গে যোগ দেন বারাণসী ঘোষ, দর্পনারায়ণ ঠাকুর, মদন দত্ত, হিদারাম বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নারায়ণ ঘোষাল, প্রভৃতি ধনোৎপাদনকারীরা। এঁরা ছাড়াও, উদ্ভব হয় আর এক শ্রেণীর নতুন বাঙালীর—নবকৃষ্ণ দেব, গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ, কৃষ্ণকান্ত নন্দী প্রভৃতি, যাঁরা ঠিক ব্যবসা বাণিজ্য নয়, কোম্পানীর রাজনীতির ও রাজস্ব শাসনের সহায়ক হিসাবে প্রভূত বিত্ত, খ্যাতি, প্রতিপত্তির অধিকারী হন। এঁদের সকলেরই ঐহিক বৃদ্ধি ও সমৃদ্ধি নির্ভর করে কোম্পানীর সাফল্যের ওপর। তাঁরা উপলব্ধি করেন যে তাঁরা মুক্ত। দেশের পরিবর্তনের এই ইঙ্গ-বঙ্গীয় যৌথ উদ্যোগের আগ্রাসী অগ্নি সমগ্র উনবিংশ শতাব্দী ধরে ক্রমশ সারা দেশটাকে উত্তপ্ত করে তোলে। এঁরা সকলেই অষ্টাদশ শতাব্দীর মানুষ—সৃষ্টি করেন উনবিংশ শতাব্দীর সম্ভাবনাকে।

মনে রাখা দরকার, প্রথমত, যে বঙ্গদেশীয় এই পরিবর্তনের পরিবাহক ছিল সেখানকার হিন্দু সমাজ—মুসলমানরা নয়। মুসলমান রাজশক্তিকে পরাজিত করেই ইংরাজ বঙ্গদেশে তাদের প্রভুত্ব স্থাপন করে। মুসলমানদের পরাজয়ে ঘটে হিন্দুদের মুক্তি। ভাগ্য বিপর্যয়ের গ্লানি, ক্ষতি, ও হতাশার নিষ্ফল ক্ষোভে মুসলমানরা যখন ক্রমে নিস্তেজ ও স্বঅন্তরাশ্রিত হয়ে পড়ে, হিন্দুরা তখন নবলব্ধ মুক্তির আবেগে উদ্দীপ্ত হয়ে বেশ উগ্রতার সঙ্গে নিজেদের সংসার নতুন করে সাজাতে তৎপর হয়। এই মুক্তির আবেগেই দেশীয় প্রতিভার যে ব্যাপক উৎসারণ ঘটে, তাই-ই ভারতীয় ইতিহাসে নবজাগরণ নামে বর্ণিত হয়ে থাকে। ভারতীয় নবজাগরণ ভারতীয় হিন্দুদেরই কীর্তি।

দ্বিতীয়ত, এই পরিবর্তন ঘটে বঙ্গদেশের কলকাতা শহরে। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যঙ্গ করে কলকাতা শহরকে বর্ণনা করেন 'কমলালয়' নামে। কলকাতার অধিবাসীদের ধনৈষণা বা বাবুয়ানা, বিলাসিতা বা ব্যাভিচার— এসব এ প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় নয়। তবে প্রাচীন ভারতভূমিতে আধুনিক নাগরিক সভ্যতার ও সংস্কৃতির গোড়াপত্তন হয় কলকাতা শহরে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষপাদ থেকে বঙ্গদেশের রাজধানী, ইংরাজ কোম্পানীর প্রধান ঘাঁটি

কলকাতা শহর দ্রুত ভারতবর্ষ তথা এশিয়ার প্রধান রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্নায়ুকেন্দ্রে পরিণত হয়। ভারতে কর্মরত ইংরাজদের একটা বৃহৎ অংশ বাস করতেন কলকাতা শহরে। তাছাড়াও ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশ থেকেও ভাগ্যান্বেষীরা এসে জুটতেন এই সোনার কলকাতায় ধনার্জনের আশায়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় শহর কলকাতা উনবিংশ শতাব্দীতেই শুধু ভারতের মহানগরী নয়, প্রায় এক বিশ্বনগরীতে পরিণত হয়।

ধনী 'অখণ্ড দোর্দণ্ড প্রতাপান্বিত অনবরত পণ্ডিত সেবিত' বাঙ্গালী ভদ্রলোকদের লীলাক্ষেত্র ছিল কলকাতা শহর। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে নিমাইচরণ মল্লিক, রামদুলাল দে, মতিলাল শীল, রাধাকান্ত দেব, রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রভৃতি 'অসাধারণ ভাগ্যবান' ব্যবসায়ী ও জমিদারেরা এ শহরের বিশিষ্ট অধিবাসী ছিলেন। এঁদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন রাজপাদোপজীবি, কিন্তু সকলেই ছিলেন রাজপাদলেহী। এঁদের আশা ও ধান্দা, চাল ও মেজাজ ছিল অন্যরকম—ভারতের ইতিহাসে এক নতুন ধরণের মানুষ ছিলেন এঁরা। অর্থই ছিল কলকাতার নাগরিক ব্যবহারের পরিনির্ণায়ক, এবং প্রতিযোগিতাই ছিল প্রাণের লক্ষণ। ধনীরা এখানে ছুটোপাটি করতেন যেমন অর্থোপার্জনের জন্য, তেমনি, সে অর্থ ব্যয় বা অপব্যয় করে সামাজিক প্রাধান্য ও প্রতিপত্তি অর্জনের জন্য। নবাবদের আমলে ধনী ব্যক্তিরা ভয়ে তাঁদের ধন-সম্পদ গোপন করে রাখতেন, ইংরেজদের আমলে তা চুটিয়ে জাহির করতেন। কোম্পানী বঙ্গদেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করে। কার্যত যাই হকনা কেন, নীতিগত ভাবে সে আইনের শাসন ছিল সমদৃষ্টি-সম্পন্ন। আইনের দ্বার সকলের জন্যই খোলা ছিল, সুবিচার সকলেই আশা করতে পারতেন। একজন সামান্য ব্যক্তির অভিযোগেও রাধাকান্ত দেবের মত ধনী, মর্যাদা সম্পন্ন, প্রভাবশালী এবং সরকারের বশংবদ ব্যক্তিকে আদালতে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়। একজন ইংরাজ ব্যবসায়ে বিশ্বাসভঙ্গ করার জন্য কলকাতায় 'Rothschild' মতিলাল শীল তাঁকে শাসান: 'you owe me for your ship Christopher Rawson Rs. 65,000 and for Ceylon 25,000. Should the money be not in my hands before tomorrow 12 o'clock I shall have the vessel seized. I shall have her sold at auction for 40 or 45000... and tomorrow I shall have you locked in jail. I shall destroy

your credit for ever. I shall be disposed to sacrifice 40,000 rupees on your account, but I shall have my vengeance'।[৫১২] এটা মুক্তির মেজাজ। Locke-এর দেশের মানুষ এদেশে স্বখাত সলিলে পড়ে। মোট কথা, কলকাতা শহরের অধিবাসী এই সব ধনী ও প্রতিপত্তিশালী হিন্দুরা সেখানে মুক্তির মুক্তবায়ু সেবন করেন। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য, নাগরিক অধিকার লাভের জন্য, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা অর্জনের জন্য—এক কথায় মুক্তির জন্য, তাঁরা সকলেই কৃতজ্ঞ হন কোম্পানীর কর্তৃপক্ষের কাছে; আচারে বিচারে, কথায় বার্তায় তাঁরা অনুক্ষণ জ্ঞাপন করেন ইংরাজ শাসনের প্রতি তাঁদের আনুগত্য। ইংরাজরাও তাঁদের সঙ্গে মিলিত হতেন সামাজিক উৎসবে, তাঁদের সমাদর করতেন, সমাজের ওপর তাঁদের কর্তৃত্ব স্বীকার করতেন, তাঁদের সরকারী খেতাবে অলংকৃত করতেন, তাঁদের মেজাজকে সমীহ করে চলতেন, প্রত্যক্ষ ভাবে সমাজ সংস্কারে তাঁদের প্রচেষ্টাকে উৎসাহ যোগাতেন ও নানা বিষয়ে তাঁদের পরামর্শ নিতেন। এই ভাবেই কলকাতা শহর হয়ে দাঁড়ায় ভারতের জাতীয় পরিবর্তনের 'epicentre'।

এর ফলে কলকাতার নাগরিক জীবনের দুটি বৈশিষ্ট্য ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ হয়ে দেখা দেয়। প্রথমটি হচ্ছে যে, যে সনাতন ধর্ম ও বর্ণসংস্কারের এবং লোকাচারের ভ্রূকুটি দেশের বিপুলাংশে হিন্দু জনসাধারণের জীবনকে পাষাণের মত স্থাণু, অসাড় করে রেখেছিল, কলকাতা শহরে তার রোষ ধীরে ধীরে উপেক্ষিত হতে থাকে। অন্যভাবে বলা যায় যে, হিন্দুদের ধর্ম ও সংস্কার লোকাচার ও দেশাচার প্রভৃতি যুগ যুগ ধরে পক্ক হয়ে যে নীরেট সাংস্কৃতিক পিষ্টকটি তৈরী হয়েছিল, ধনৈষণার আস্রবণে তার দ্রবণ ও স্খলন শুরু হয়। ট্রেনের কামরায় বা চলচ্চিত্র প্রেক্ষাগৃহে যেমন বর্ণসংস্কার রক্ষা করা অসম্ভব, প্রায় তেমনি, কলকাতা শহরে সংস্কারের বা লোকাচারের হুকুম তামিল করা, বা আঁকড়ে থাকা ক্রমশ কঠিন হয়ে পড়ে। কলকাতার ধনীরা প্রায় সকলেই ছিলেন শূদ্র। কিন্তু টাকার জোরে তাঁরাই হন সমাজের বিধাতা। ১৮২৯ সালে ১৩ই জুন 'বঙ্গদূত' পত্রিকা মন্তব্য করেন যে কলকাতা ও গৌড় রাজ্যের সর্বত্র ধনবৃদ্ধি হেতু 'যেসকল লোক পূর্ব্বে কোনো পদেই গণ্য ছিল না এক্ষণে তাহারা উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট উভয়ের মধ্যে বিশিষ্টরূপে খ্যাত হইয়াছে এবং দিন দিন দীনের দীর্ঘতা হ্রস্বতাকে পাইয়া তাহারদিগের বাস্তব দিন প্রকাশ

পাইতেছে'। 'অনেক য়োরোপীয় মহাশয়েরদিগের সমাগম' হওয়ায় 'এদেশে অবাধে বাণিজ্য ব্যবসায় চলিতেছে'। ফলে যেমন ধনবৃদ্ধি ঘটে তেমনি অর্থও সচল হয়ে ওঠে। 'ফলিতার্থ এ প্রকার এদেশের অবস্থান্তর হওয়াতে যেসকল উপকারোপযোগি ফলোৎপত্তির সম্ভাবনা তন্মধ্যে অর্থ চলাচল এক প্রধান ফল দৃষ্ট হইতেছে যেহেতুক ধন আর সারমৃত্তিকা ইহা রাশীকৃত হইলে কোন ফলোদয় হয়না কিন্তু বিস্তীর্ণ হইলেই ফলোৎপত্তির নিমিত্ত হয়'।[২১৩] সচল অর্থ অচল সমাজজীবনকে গলিয়ে দেয়। দেখা যায় সেখানে ব্রাহ্মণরা করেন শূদ্রের দাসত্ব। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' আক্ষেপ করে লেখেন: 'ইহা কি ব্রাহ্মণদিগের সামান্ত লজ্জার বিষয় যে যে শূদ্রেরা পূর্ব্বে তাঁহারদিগের আজ্ঞা কারি দাস ছিল, এইক্ষণে তাঁহারা সেই শূদ্রদিগের আজ্ঞানুবর্ত্তি হইয়াছেন—ধন সেবা জন্ত তাঁহারদিগের সেবাতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন? যাঁহারা ব্রাহ্মণত্ব ও পণ্ডিতত্ব লইয়া দম্ভ করেন, অনাহূত, অনাদৃত, তিরস্কৃত হইলেও ধনিদিগের দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করা তাঁহারদিগের প্রাতঃকৃত্য হইয়াছে, এবং ধনিদিগের উপাসনা আন্তরিক ধর্মানুষ্ঠান হইয়াছে। কি জানি তাঁহারা অনুষ্ঠানের ত্রুটি দেখেন, এনিমিত্তে কপালে দীর্ঘ রেখা, হস্তেতে কোষাপাত্র, এবং তদুপরি গঙ্গাস্নানের প্রত্যক্ষ চিহ্ন স্বরূপ সিক্ত বস্ত্র খণ্ড পরিপাটী রূপে সংস্থাপন পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে আশীর্ব্বাদকরত উপস্থিত হয়েন। অনেক মহোপাধ্যায় পণ্ডিত কিঞ্চিৎ ধন প্রাপ্ত হইলে দাতার মনোরম্য যে কোন অভিপ্রায়, তাহাকে শাস্ত্র সিদ্ধ বলিয়া প্রায়বক্তা করেন, এবং কত অশাস্ত্রীয় ব্যবস্থা স্বহস্তেতেও লিখিয়া প্রদান করেন। এবম্প্রকার অযোগ্য আচরণ প্রযুক্ত ক্রমে তাঁহারা সংসারে অধোগামি হইতেছেন, তদ্বিপরীতে অনেক শূদ্র জ্ঞান ও যোগ্যতা দ্বারা উচ্চ পদে আরোহন করিতেছেন। ইহা অপেক্ষা তাঁহারদিগের অধিক অপমানের বিষয় আর কি আছে যে ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কোন কোন সভা হইলে শূদ্রেরা তাহার অধিপতি হয়েন'?[২১৪] কার্যত কলকাতার ধনিক-গোষ্ঠী এক নতুন ব্রাহ্মণশ্রেণীতে পরিণত হন। আর শূদ্রপাদোপজীবি মহোপাধ্যায় পণ্ডিতরা বেতনবৃত্তি দ্বারা জীবনধারণ করেন। এই সব ব্রাহ্মণদের চরিত্রের আরও পরিচয় আছে। রামমোহনের ব্যবহারে এঁদেরই প্রাণে আঘাত লাগে। Hyde East সাহেবের বাড়ীতে গিয়ে এঁরা কি বাসনা ব্যক্ত করেন তা আমরা আগেই দেখেছি।

তবে নতুন ব্রাহ্মণশ্রেণী অবশ্যই অধার্মিক ছিলেন না। বরং শাস্ত্র, ব্রাহ্মণ এবং ধর্মকে রক্ষা ও পালন করার পবিত্র দায়িত্ব পালনে তাঁরা বিশেষভাবে

তৎপর হন। প্রধানত রামমোহনের ব্রাহ্মসভা এবং হিন্দু কলেজের Derozio-র তরুণ ছাত্রদের হিন্দুধর্ম-বিরোধী উগ্রতার মোকাবেলা করার জন্ম এবং 'সধর্ম ও সদাচার ও সদ্ব্যবহারাদি রক্ষার্থ' সমাজের বিশিষ্ট শিষ্টদের একত্রিত করে তাঁরা ১৮৩০ সালের ১৭ই জানুয়ারী কলকাতায় 'ধর্মসভা' নামে একটি সংস্থা স্থাপন করেন। ওই সভার উদ্যোগীদের মধ্যে যে ১২ জনকে নিয়ে সভার একটি বিবেচক সমিতি গঠিত হয়, তার মধ্যে ১ জন ছিলেন কুলীন ব্রাহ্মণ, ১ জন পিরালী ব্রাহ্মণ এবং ১০ জন শূদ্র।[২১৫] ধর্মসভার সভ্যেরা ঘোর রক্ষণশীল হলেও, সাধারণ ভাবে দেশে ইংরাজি শিক্ষা, স্ত্রী শিক্ষা প্রভৃতির প্রসারে তাঁরা বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন। কিন্তু তাঁদের সে সংস্কারোৎসাহের কোন দৃঢ়, সঙ্গতিপূর্ণ, বৌদ্ধিক প্রত্যয়ের ভিত্তি ছিল না। নারী শিক্ষায় এবং নারী হত্যায় তাঁরা সমান উৎসাহী ছিলেন। তাঁদের অনেকেই ছিলেন হুজুগপ্রিয়, আর অনেকের উদ্দেশ্য ছিল 'স্বীয় মণ্ডলী মধ্যে যশ উপার্জন' করা, ও সরকারের প্রিয়তা অর্জন করা। প্রকৃত পক্ষে, সমাজে ব্রাহ্মণদের ওপর মাতব্বরী করে, ব্রাহ্মণ ও সনাতন ধর্মের পোষক ও রক্ষকের ভূমিকা গ্রহণ করে, সমাজোন্নয়নের প্রতি উৎসাহ দেখিয়ে তাঁরা যেমন প্রমাণ করতে চাইতেন তাদের ব্রাহ্মণত্ব ও জাহির করতে চাইতেন তাঁদের ঐশ্বর্য, তেমনি লুকোতে চাইতেন তাঁদের শূদ্রত্ব। এইটাই ছিল তাঁদের মুক্তির বৈশিষ্ট্য।

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যটি হচ্ছে জ্ঞানৈষণা। সেটাও ঘটে 'অনেক য়ুরোপীয় মহাশয়েরদিগের সমাগম'-এর ফলে। কেন ইংরাজি ভাষা এবং পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞান এদেশে প্রবর্তিত হয় তার কিছু ইঙ্গিত আগে দেওয়া হয়েছে। আর বেশী বলার প্রয়োজন নেই। তবে যে, 'Knowledge itself is power,' তার সত্যতা সুপ্রমাণিত হয় আর একবার, বিশাল ভারতভূমিতে। যখনকার কথা বলা হচ্ছে তখন বঙ্গদেশের মানুষ জীবনের সবক্ষেত্রে দেউলিয়া হয়ে আশ্রয় নেয় ধর্মচর্চার অন্ধকূপে—আর সে ধর্মচর্চা পরিণত হয় লোকাচার পালনে। প্রকৃতপক্ষে লোকাচারই তখন ঈশ্বর—মানুষের জীবনকে তা আঁকড়ে ধরে ছিল, যেমন বৃদ্ধ বট আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে থাকে প্রাচীন দেবালয়কে। ঘোর পৌত্তলিকতা, তেত্রিশ কোটি দেবদেবীতে বিশ্বাস, হাজার রকমের পূজা পার্বন, ব্রত বিধি, আচার অনুষ্ঠান মানুষকে সকাল থেকে সন্ধ্যা, জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বজ্র-শাসনে নিস্তেজ করে রেখেছিল। জীবনের অন্ত কোন ক্ষেত্রে নজর দেবার বিশেষ অবকাশ ছিল না। শিক্ষা, বিদ্যানুশীলন ও সংস্কৃতি-

চর্চায় আলো নিষ্প্রভ। হিন্দু সমাজে শিক্ষিতদের মধ্যে ব্রাহ্মণদের সংখ্যাই ছিল বেশী। কিন্তু সে শিক্ষা ছিল একটা প্রাণহীন প্রক্রিয়া, প্রায় সম্পূর্ণ বাস্তব-মূল্য-বর্জিত। যে শিক্ষা সাধারণত দেওয়া হত তার মূল লক্ষ্য ছিল ভারতের প্রাচীন বিভিন্ন বিস্তার যথার্থতা প্রতিপাদন করা। কোন জীবনজিজ্ঞাসা মনকে নাড়া দিত না। প্রাত্যহিক জীবনে বুদ্ধি, যুক্তি প্রয়োগের প্রয়োজন বোধ করা হত না। ডাকাত কালীপূজা করত মায়ের দয়ায় গৃহস্থের সর্বনাশ করার জন্য, আর গৃহস্থ কালীপূজা করত মায়ের আশীর্বাদে নির্বিঘ্নে জীবন-যাপন করার জন্য। সমাজে মানুষের চেয়ে ধর্মের মূল্য ছিল বেশী। তাই ধর্মের অনুশাসনে বহু প্রক্রিয়ায় আত্মনির্যাতন, শিশুবিবাহ বহুবিবাহ, শিশুহত্যা, নারীহত্যা করা হত উৎসবের সঙ্গে, মহাসমারোহে, ঈশ্বরকে তুষ্ট করার জন্য। একটা নিষ্করুণ বীভৎসতায়, পাশবিকতায়, নির্বুদ্ধিতায় ও আত্মপ্রবঞ্চনায় ব্যসন পেয়ে বসেছিল মানুষকে। এই ভয়ানক অবস্থার পরিবর্তন করার জন্যই রাম-মোহন অবতীর্ণ হন তাঁর সংগ্রামে। আর সে অবস্থাতে অধৈর্য্য হয়েই পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের নেশায় উন্মত্ত হিন্দু কলেজের কিছু তরুণ হুঙ্কার দেয়—'down with Hinduism', Voltaire-এর কথা 'écrasez l'infâme'-এর প্রতিধ্বনি।

সন্দেহ নেই যে উচ্চাকাঙ্ক্ষী, সুযোগ-সন্ধানী বাঙালীদের অধিকাংশের কাছে তখন 'English means rupees' বা, ইংরাজী ছিল 'money-making knowledge'। কিন্তু এতেও সন্দেহ নেই যে পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা দেশে একটা বৌদ্ধিক ও নৈতিক বিপ্লব ঘটায়। অনেকের দৃষ্টিতেই দেশের ভবিষ্যতের একটা নতুন দিগন্ত উদ্ভাসিত হয়—মানুষের মুক্তি ঘটে। ইংলণ্ড থেকে আমদানী করা একটাকা দামের বই 'Age of Reason', অতি চাহিদার ফলে যে কিছুদিনের মধ্যে পাঁচ টাকায় বিক্রী হয়, তা একটা নতুন বৌদ্ধিক ঝোঁককে প্রতীত করে। একজন বিশিষ্ট ইংরাজ রাজপুরুষ উল্লেখ করেন: 'The steam boats, passing up and down the Ganges, are boarded by native boys, begging, not for money, but for books.' পাদটিকা: 'Some gentlemen coming to calcutta, were astonished at the eagerness with which they were pressed for books by a troop of boys, who boarded the steamer from an obscure place called Comercolly. A Plato was lying on the table, and one of the party asked a boy whether that

would serve his purpose. "Oh yes", he exclaimed, "give me any book ; all I want is a book" '।[২১৬] ইংরাজী বই পড়ে ওই সব ছেলেরা যে শুধু ইংরাজী ভাষা এবং পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানে বুৎপত্তি লাভ করে তা নয়, তাদের মধ্যে সৃষ্টি হয় এক নতুন মানসিকতা। নতুন জ্ঞান শুধু মাত্র তাদের বৌদ্ধিক শক্তি যোগায়নি নৈতিক প্রত্যয় ও সাহসও যুগিয়ে ছিল। আত্মীয় সভা বা Academic Association, গৌড়ীয় সভা বা Society for the Acquisition of General knowledge—এই সব সভা সমিতিগুলি, এবং 'সম্বাদ কৌমুদী,' 'Parthenon', 'Enquirer,' 'জ্ঞানান্বেষণ,' 'Reformer,' 'Bengal Spectator' প্রভৃতি পত্র পত্রিকাগুলি এক নতুন মেজাজকে ঘোষিত করে। হিন্দু কলেজের ছাত্র কৈলাসচন্দ্র দত্ত একটা প্রবন্ধে লেখেন: 'The people of India and particularly those of the metropolis, had been subject for the last fifty years to every species of subaltern oppression. The dagger and the bowl were dealt out with a merciless hand and neither age, nor sex nor condition could repress the rage of the British barbarians.'।[২১৭] কৈলাস দত্তের চিত্তের এ মুক্তি ও উত্তেজনা কোম্পানীর শাসন প্রতিষ্ঠার ফলশ্রুতি। পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞানের আলো তখন বঙ্গদেশের কিছু মানুষের কাছে শাসক ইংরাজদের শক্তি ও দুর্বলতা, দুটিই প্রকাশ করে দেয়।

ইংরাজ কোম্পানীর শাসনে ভারতবাসীর যে মুক্তি ঘটে অন্যান্যদের মত রামমোহনও তা গভীরভাবে উপলব্ধি করেন তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে। মুক্তির এষণাই হয় তাঁর চিন্তা ও কর্মের মৌল প্রেরণা। কিন্তু সে মুক্তি চান তিনি শুধুমাত্র নিজের জন্য নয়, সমগ্র দেশবাসীর জন্য। সে মুক্তির অর্থ আধ্যাত্মিক মোক্ষলাভ নয়। সে মুক্তি মানুষ লাভ করতে পারে তার জাগতিক জীবনের সুখ, শান্তি, স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বাতন্ত্র্যের মধ্য দিয়ে, মানুষকে ভালবেসে। যে সব উদ্যোগী বাঙালীদের কথা আগে বলা হয়েছে, তাঁদের সঙ্গে রামমোহনের একটা মৌল পার্থক্য ছিল। তাঁরা তাঁদের স্বাধীনতা ব্যবহার করেন প্রধানত নিজেদের সুখ, ঐশ্বর্য, শক্তি, খ্যাতি প্রভৃতির বৃদ্ধির জন্য। রামমোহন তা ব্যবহার করেন যেমন তাঁর ঐহিক স্বার্থের সমৃদ্ধির জন্য, তেমনি তাঁর ব্যক্তিগত চরিত্রের উৎকর্ষ সাধনের জন্য, এবং দেশবাসীর অভ্যুদয়ের কাজে। রামমোহনের জন্ম হয় ইতিহাসের এক যুগসন্ধিক্ষণে। ইতিহাসের তিনটি বৃহৎ বিপ্লবের তিনি সাক্ষী

ছিলেন—আমেরিকার বিপ্লব, ফরাসী বিপ্লব ও ইংলণ্ডের শিল্প বিপ্লব। ইয়োরোপের ইতিহাসে যাকে বলে 'Age of Reason', তিনি সেই কালের মানুষ। তাঁর সংবেদনশীল মন, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, চিন্তাশীলতা ও সন্ধানী চিত্তবৃত্তি তাঁর মধ্যে যে দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীর সৃষ্টি করে তা ঘনিষ্টভাবে সম্পৃক্ত ছিল ফরাসী 'Enlightenment'-এর সঙ্গে। প্রকৃতপক্ষে, ভারতবর্ষে তিনি ছিলেন অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী চিন্তানায়কদের বৌদ্ধিক বংশধর এবং প্রতিভূ। 'The essential articles of the religion of the Enlightenment may be stated thus : (1) man is not natively depraved ; (2) The end of life is life itself, the good life on earth instead of the beatific life after death ; (3) man is capable, guided solely by the light of reason and experience, of perfecting the good life on earth ; and (4) the first and essential condition of the good life on earth is the freeing of men's minds from the bonds of ignorance and superstition, and of their bodies from the arbitrary oppression of the constituted social authorities'।[২১৮] এই চিন্তাধারারই প্রথম ভারতীয় পরিবাহক ছিলেন রামমোহন। আর একজন বিদেশী চিন্তানায়ক যিনি বিশেষ ভাবে রামমোহনের চিত্তকে প্রভাবিত করেন, তিনি হচ্ছেন সপ্তদশ শতাব্দীর ইংরাজ দার্শনিক, John Locke। রামমোহনের মূল বক্তব্য ছিল যে, মানুষের সহজ যুক্তিপ্রবণতা ও বিচারবুদ্ধিই তার মনুষ্যত্বের বৈশিষ্ট্য। যে পরিমাণে মানুষ তার নিজের বুদ্ধি ও যুক্তির দ্বারা তার জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করবে, সেই পরিমাণেই সে মুক্ত। যুক্তি ও বুদ্ধির দ্বারা মানুষ যেমন বাহ্য জগতের প্রক্রিয়াগুলিকে হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম, তেমনি সক্ষম তার চিত্তবৃত্তিগুলিকে নিয়ন্ত্রণ ও শাসন করতে—শুধু তাই নয়, সে গুলিকে সর্বোদয়ের কাজে নিয়োজিত করতে। দেখা যায় যে ধর্ম চর্চার নাম করে 'শত-শত কষ্টকর ও নিরর্থক বিধি নিষেধ লেজুড়ের মত লাগিয়ে দে'য়া হয়েছে, আর এ'গুলোই সমাজের উন্নতি না করে অনিষ্টের কারণ হয়েছে, এবং সামাজিক উন্নতি না করে সাধারণ লোকেদের উদ্‌ভ্রান্ত ও বিপর্য্যস্ত করেছে'।[২১৯] আবার 'প্রতিদিনই দেখা যাচ্ছে শত শত লোক কোন বিশেষ সম্মান লাভের জন্ত জন্ত, কিম্বা সামান্ত প্রাপ্তির আশায়, কতরকম অনশন উপবাস, একটা হাত অনড় করে' রাখা, শরীর পুড়িয়ে ফেলা প্রভৃতি নানারকম দৈহিক নির্যাতন ও কষ্টভোগ করে' থাকে'।[২২০] একদল ধর্মীয় 'প্রতারক...ইচ্ছামত নানা

মতবাদ, ধর্মমত ও বিশ্বাস প্রভৃতি বানিয়ে প্রচার করে, লোককে কষ্ট দেয়, ও তা'দের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে'।[২২১] যা যুক্তিগ্রাহ্য নয় রামমোহন তা গ্রহণ করতে নারাজ ছিলেন: 'ধর্ম নেতারা তা'দের চেলাদের সন্তোষের জন্ত এমন ব্যাখ্যা করেন, যেন ধর্ম ও বিশ্বাসের ব্যাপারে যুক্তি তর্কের কোন স্থান নেই, এবং ধর্মের ব্যাপারে শুধু বিশ্বাস ও ঈশ্বরের কৃপাই একমাত্র নির্ভর। যে বিষয়ের কোন প্রমাণ নাই, যা'যুক্তি বিরুদ্ধ, তা' একজন যুক্তিবাদী কি করে গ্রহণ বা স্বীকার করতে পারেন'?[২২২]

ভণ্ড ধর্মগুরুদের দ্বারা প্ররোচিত হয়ে, নির্বিচারে, অন্ধের মত ধর্মীয় ও সামাজিক দুষ্টাচারগুলি পালন করে, যুগে যুগে মানুষ যেন ইচ্ছা করেই নিজেকে নাবালক করে রেখেছে। প্রয়োজন তার সাবালক হওয়া, নিজেই নিজের অভিভাবক হওয়া। রামমোহনের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, যে সমাজ 'self-directing power of personality'-র ওপর নির্ভরশীল, সে সমাজই শান্তি, নিরাপত্তা ও প্রগতির পরিবাহক হতে পারে। রামমোহন ছিলেন শঙ্করাচার্যের দার্শনিক অনুবর্তী। কিন্তু তিনি মনে করেন যে মোক্ষলাভের জন্ত মানুষের অনাশ্রমী হবার প্রয়োজন নেই, আশ্রমী জীবনেই মানুষ—স্বাধীন, সাবালক, কুসংস্কারমুক্ত মানুষ, তার অস্তিত্বের পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারে।

আর একটা কথা: রামমোহন মনে করেন যে মানুষে মানুষে কোন মৌল প্রভেদ নেই। 'মানুষ হিসাবে তারা মূলতঃ একই বৃক্ষের ভিন্ন ভিন্ন শাখা মাত্র'।[২২৩] তাই, শুধু দেশের মানুষকে ভালবাসা ও সেবা করা নয়, পৃথিবীর সব মানুষকে তা করাই হচ্ছে প্রকৃত ধর্মের লক্ষণ: 'সর্বশক্তিমান একমাত্র ঈশ্বরে বিশ্বাসই প্রত্যেক ধর্মের মূলসূত্র। জাতি বর্ণ ও ধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষের হৃদয় পরস্পরের প্রতি প্রীতি ও ভালবাসা দিয়ে জয় করাই প্রকৃতির সৃষ্টিকর্তা একমাত্র ঈশ্বরের নিকট গ্রহনীয় বিশুদ্ধ পূজা'।[২২৪] ওই একই বিশ্বাস ছিল একত্ববাদী খৃষ্টানদেরও: 'In the love of truth, and in the spirt of Jesus, we unite for the worship of God and the service of man'।

ব্যক্তিগত জীবনে রামমোহন স্বাধীনভাবে চিন্তা করেন, নিজের মতামত প্রকাশ করেন, অর্থোপার্জন করেন, নিজের নাগরিক অধিকার ব্যবহার করেন এবং স্বপ্রণোদিত হয়ে সমাজকে সংস্কার করতে, দোষ মুক্ত করতে ও সেবা করতে উদ্যোগী হন। তিনি গভীর ভাবে উপলব্ধি করেন যে তিনি নিজেই

নিজের অভিভাবক, তিনি মুক্ত। তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু Adam লেখেন : 'I would say that I was never more thoroughly, deeply and constantly impressed than when in the presence of Rammohun Roy....that I was in the presence of a man of natural and inherent genius, of powerful understanding, and of determined will, a will determined with singular energy and uncontrollable self-direction to lofty and generous purposes. He seemed to feel to think, to speak, to act, as if he could not but do all this and that he must and could do it only in and from and through himself. and that the application of any external influence, distinct from his own strong will, would be the annihilation of his being and identity. He would be free, or not be at all. He must breathe an atmosphere of freedom, and not finding one ready-made to his hand, he made one for himself. He felt with the old English poet, My MIND TO ME A KINGDOM IS, and from this free domain he unweariedly directed his attacks against those systems of spiritual social and political oppression of which by the necessity of circumstances he was part and parcel, either as actor or sufferer, as priest or victim : ...Love of freedom was perhaps the strongest passion of his soul—freedom not of the body merely, but of the mind—freedom not of action merely but of thought'।[২২৫]

মুক্তির চিন্তা বাল্যকাল থেকেই রামমোহনের চিত্তকে চঞ্চল করে তোলে—শুরু হয় তাঁর সংঘাত পরিবার ও পরিবেশের সঙ্গে। মুক্তি যুদ্ধে তাঁর প্রথম সাফল্য ঘটে যখন তিনি নিজেকে পরিবারের প্রভাব ও মায়া থেকে মুক্ত করেন। রামমোহন তাঁর সংক্ষিপ্ত আত্মজীবনীতে লেখেন যে ইংরাজদের সঙ্গে পরিচিত হবার পূর্বে তিনি পোষণ করতেন 'a feeling of great aversion to the establishment of the British Power in India'। তার পরই লেখেন যে ২০ বছর বয়সে 'I first saw and began to associate with Europeans, and soon after made myself tolerably acquainted with their laws and form of Government. Finding them generally more intelligent, more steady and moderate in their conduct, I gave up my prejudice against them and became inclined in their favour, feeling persuaded that their rule though a foreign

yoke, would lead more speedily and surely to the amelioration of the native inhabitants'।[২২৬] ইংরাজ জাতির উদ্যোগ, কর্মশক্তি, শৃঙ্খলা, নির্ভীকতা, উদার দৃষ্টিভঙ্গী, রাজনৈতিক সংগঠন, আইনানুবর্তিতা, সততা, স্বাধীনতা-প্রিয়তা প্রভৃতি তাঁকে গভীর ভাবে আকৃষ্ট করে। তাঁর মনে কোন সন্দেহ থাকে না যে ইংরাজরা ভারতবাসীর চেয়ে উন্নত সভ্যতার অধিকারী, এবং একটি উন্নতিশীল জাতি। তিনি ইংরাজদের দেখেন ভারতবর্ষের ত্রাতা হিসাবে। প্রধান কথা যে, তাঁর বিশ্বাস জন্মায় যে ভারতবর্ষে ইংরাজদের প্রতিষ্ঠা ভারতবাসীর পক্ষে কল্যাণকর হবে। অর্থাৎ, ইংরাজদের আগমন ভারতবাসীর কাছে একটা সুযোগ, একটা আশীর্বাদ হিসাবে দেখা দেয়। অনেকটা Bentinck-এর মত, তিনিও বিশ্বাস করেন যে ইংরাজদের উচ্ছেদ ঘটলে, ভারত আবার নিমজ্জিত হবে এক নিদারুণ অরাজকতার মহাপঙ্কে। পূর্ববর্তী মুসলমান শাসনের তিনি তীব্র সমালোচক ছিলেন, কিন্তু মুসলমানদের বা তাদের ধর্মের প্রতি তাঁর কোন বিরূপতা ছিল না। মুসলমান শাসনের অবসানে তিনি খুশী হন, কিন্তু তার পরিবর্তে তিনি রাজপুত বা শিখ বা মারাঠাদের শাসনের প্রবর্তন মোটেই চান না। মোগল শাসনের পতনের পর দেশের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব যাদের হাতে যায়, সেই দেশীয় রাজন্যবর্গ, রামমোহনের দৃষ্টিতে ছিলেন, 'a number of......rebellious nobility'। তাছাড়া, ভারতবর্ষে 'the notion of patriotism has never made its way'।[২২৭] তিনি কি বলতে চান তা স্পষ্ট। রামমোহনের সমসাময়িক, ভারতের শেষ প্রকৃত স্বাধীন নরপতি পাঞ্জাবের মহারাজা রঞ্জিত সিং ছিলেন দেশের একাংশের অধিপতি, বহু গুণান্বিত মানুষ —বীর যোদ্ধা, বিচক্ষণ নেতা, রাজনৈতিক সংগঠক, ও সুশাসক। কিন্তু জাতীয় স্বাধীনতার আকাঙ্খা বলতে যা বোঝায় তা তাঁর চরিত্রে ও কর্মে সম্পূর্ণ অবিদ্যমান। তিনি ছিলেন আঞ্চলিক নেতা, জাতীয় নয়—জাতীয় নেতা হবার চেষ্টাও তিনি করেন নি। ১৮০৯ সালে কোম্পানীর সঙ্গে তিনি যে চুক্তি করেন তা অনেকটা প্রবাদের পণ্ডিতদের অর্ধেক ত্যাগ করার মত। ইংরাজদের রাজনৈতিক ও সামরিক কার্যকলাপের আগ্রাসী চরিত্রটি যে তিনি উপলব্ধি করেন নি তাও নয়। তবুও তাঁর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী ছিল সংকীর্ণ—সমসাময়িক দেশীয় রাজন্যবর্গের রাজনৈতিক সংকীর্ণতার তিনি ছিলেন প্রতীক। তিনি স্বাধীন শিখরাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন, শিখ জাতীয়তা-

বাদকে শক্তিশালী ও সংহত করেন, কিন্তু সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদকে নয়। ১৮৩১ সালে Bentinck-কে যে চিঠিখানি তিনি লেখেন, তার চাটুকারিতা আজ ভারতবাসীর মনে তাঁর প্রতি অভক্তি সৃষ্টি করবে।[২২৮] তাঁর শাসনের প্রশংসা করেও রামমোহন মন্তব্য করেন: 'The idea of constitutional government being entirely foreign to his mind, he has necessarily followed the same system of arbitrary rule which has been for ages prevailing in the country'।[২২৯] অর্থাৎ, যতই সুশাসক তিনি হন না কেন, তাঁর শাসন আইনের শাসন ছিল না। আর একটা কথা। রণজিৎ সিং-এর বহু স্ত্রী ও রক্ষিতা ছিলেন। তাঁর চিতায় তাঁর চার রাণী এবং সাতজন রক্ষিতা আত্মাহুতি দেন। চিতায় অগ্নিদান করেন পুত্র খড়ক সিং। রণজিৎ সিং যদি ইংরাজদের বিতাড়িত করে সারা ভারতের অধীশ্বর হতেন, তাহলে দেশে যেমন জাতীয় ঐক্য, 'constitutional government' বা মানুষের নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত হত না, তেমনি হত না সতীদাহ বা অন্যান্য নিষ্ঠুর ও বর্বর প্রথার উচ্ছেদ। কথাটা শুধু রণজিৎ সিং সম্বন্ধেই নয়, অন্য রাজা, মহারাজা, নবাব, বাদশা সকলের সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। আরও একটা কথা। প্রায় চল্লিশ বছরের অক্লান্ত তৎপরতায় রণজিৎ সিং যে শিখরাজ্য গড়ে তোলেন, তা তাঁর মৃত্যুর পর দশ বছরও টেঁকেনি—তাসের ঘরের মত ধরাশায়ী হয়। ইংরাজদের বিরোধিতা করা মানেই রাজনৈতিক জাতীয়তা বোধের বা 'জাতীয় স্বাধীনতার আকাঙ্খার' পরিচয় দেওয়া নয়। ১৮৫৭ সালের যে মহা বিদ্রোহ ইংরাজদের শক্তির ভিত্তিকে কাঁপিয়ে দেয়, তার ব্যর্থতা প্রসঙ্গে রমেশচন্দ্র ১৯৫৭ সালে লেখেন: 'The failure of the outbreak may also be attributed to the fact that neither the leaders, nor the sepoys and the masses were inspired by any high ideal. The lofty sentiments of patriotism and nationalism, with which they are credited, do not appear to have any basis in fact. As a matter of fact, such ideas were not yet familiar to Indian minds'।[২৩০] তাঁর এ রায় রমেশচন্দ্র পরবর্তী কালেও পরিবর্তন করার প্রয়োজন বোধ করেন নি। ভারতীয় রাজনৈতিক নবজাগরণের আবাদ যাঁরা করেন সেই উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের বিশিষ্ট বাঙালী নেতারা কেউ ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহকে সমর্থন করেননি, বরং তার ব্যর্থতায় তাঁরা খুশী

হন। রমেশচন্দ্রের নিশ্চয় জানা আছে যে ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে বাংলার নবাবের পরাজয়ে আনন্দিত হয়ে শোভাবাজারে নবকৃষ্ণ দেব বিপুল সমারোহে বিজয়োৎসব পালন করেন ; এবং তার ঠিক ১০০ বছর বাদে সিপাহী বিদ্রোহের ব্যর্থতায় আনন্দিত হয়ে নবকৃষ্ণ দেবের পৌত্র, বঙ্গদেশের অভিজাত শিরোমণি রাধাকান্ত দেব আরও বেশী সমারোহে এক বিজয়োৎসবের অনুষ্ঠান করেন। মনে রাখতে হবে যে এই ঘটনাটি ১০০ বছরের ইঙ্গ-বঙ্গীয় রাজনৈতিক সম্পর্কের প্রতীক। ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে এ ঘটনা নিন্দনীয় নয়। এটাই ছিল বাস্তব পরিস্থিতি। ভারতের রাজনৈতিক ঐক্য এবং জাতীয় জীবনের আধুনিকীকরণ, এই দুটি বস্তু সর্বভারতীয় জাতীয়তা বোধের ভিত্তি। এবং ওই দুটিই ইংরাজ শাসনের অবদান।

Derozio, কাশীপ্রসাদ ও কৈলাসচন্দ্রের কবিতায় ও কথায় রাজনীতিক স্বাধীনতার আকাঙ্খার যে পরিচয় পাই, তার প্রকৃতি কি ছিল—তাঁরা প্রকৃত কি চান, এসব ব্যাপারের ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ করা দরকার। অবশ্যই তাঁদের চিন্তায় একটা জাতীয় চেতনার ইঙ্গিত স্পষ্ট। কিন্তু সে চেতনার বাস্তবমূল্য সমসাময়িক রাজনৈতিক পরিস্থিতির আলোতেই বিচার করা দরকার। সে বিচারে এখানে প্রবৃত্ত হব না। রমেশচন্দ্র ১৮৫৭ সালের ঘটনা প্রসঙ্গে বলেন যে 'patriotism and nationalism' প্রভৃতি 'ideas were not yet familiar to Indian minds'। সুতরাং, ঐতিহাসিক বাস্তবতার অর্থাৎ, ভারতের তৎকালীন জাতীয় অবস্থা ও প্রয়োজনের প্রকৃতির আলোতে বিচার করলে রামমোহনের রায়ের সঙ্গে একমত হতে হয়—'this fiery love of independence a chimera'। এর মানে হিন্দু কলেজের শিক্ষক ও ছাত্রদের স্বপ্ন, আকাঙ্খা বা ক্রোধকে অনাদর বা অবজ্ঞা করা অবশ্যই নয়। তবে এটাও ঠিক যে হিন্দুকলেজের অনেক 'fiery' যুবক পরবর্তী জীবনে ব্রিটিশ শক্তির সেবক এবং স্তাবক হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন।

ভারতে ইংরাজদের অভ্যুদয়ের ফলে যে পরিবর্তন প্রক্রিয়া শুরু হয়, রামমোহন শুধুমাত্র তার দর্শক ছিলেন না, তাতে তিনি একটি বৃহৎ সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন। কেউ তাঁকে ডাকে নি। তাঁকে ডাকে তাঁর দেশ ; সে ডাকে সাড়া দিতে তাঁকে প্ররোচিত করে তাঁর বুদ্ধি, তাঁর অন্তর্দৃষ্টি, তাঁর মানবতা—স্বপ্রণোদিত হয়ে তিনি গ্রহণ করেন এক বৃহৎ ব্রত। ভারতবর্ষে তখন যে বৃহৎ ঐতিহাসিক পরিবর্তন ঘটতে থাকে, সেটা একটা বিশ্ব ঐতিহাসিক

প্রক্রিয়ার একটা অংশ। কোন ইংরাজের ব্যক্তিগত ইচ্ছাতে তা ঘটেনি; কোন ভারতবাসীর অনিচ্ছা তাকে রোধ করতে পারেনি। পাশ্চাত্য সভ্যতা-সংস্কৃতির আগ্রাসী অগ্নির উত্তাপ ভারতীয় জীবনে এক নতুন প্রাণ সঞ্চার করে। ইতিহাস এক নতুন খাতে প্রবাহিত হয়। সে পরিবর্তনের রূপটি তখনকার মত রামমোহন যত স্পষ্ট উপলব্ধি করেন, তাঁর সমসাময়িক কোন ভারতীয় তা করতে পারেন নি। তাই তিনি ভেবে চিন্তেই ইতিহাসের নতুন ধারাকে সবুজ সংকেত দেন।

রামমোহনের দৃষ্টি ছিল সমগ্র দেশের দিকে, শুধু বঙ্গদেশের দিকে নয়। তিনি সমগ্র দেশের ইতিহাস ও সংস্কৃতির সঙ্গে, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের অবস্থা ও সমস্যার সঙ্গে মোটামুটি পরিচিত ছিলেন। তাঁর সময়ে তিনি যত সংখ্যক দেশবাসীর সঙ্গে তাঁদের ভাষায় আলাপ আলোচনা করতে পারতেন, তা খুব কম ভারতবাসীই পারতেন। দিল্লীর বাদশা, তাঁর প্রতিভূ হিসাবে কাজ করার জন্য রামমোহনকেই যোগ্যতম ব্যক্তি বলে মনে করেন। রামমোহনও যা বলেন তা সমগ্র দেশবাসীর উদ্দেশেই বলেন। দেশবাসীর যোগ্যতায় তার গভীর আস্থা ছিল। ভারতবাসী সম্বন্ধে একটা প্রশ্নের উত্তরে তিনি জবাব দেন: 'They have the same capability of improvement as any other civilized people'।[২৩১] তিনি অঙ্গুলি নির্দেশ করেন সারা দেশের মানুষগুলোর দিকে। রামমোহনের দৃষ্টি ছিল জাতীয়, আঞ্চলিক নয়।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ভারতে ব্রিটিশ উপনিবেশিক শাসনের স্ববিরোধটি পরিস্ফুট হয় নি—সেটার তখন ভ্রূণাবস্থা। রামমোহন, Derozio, কাশীপ্রসাদ, বা হিন্দু কলেজের ইতিহাসের যে ছাত্ররা জনৈক বিদেশী মহিলার আমেরিকা সম্বন্ধে প্রশ্নের উত্তরে বলে 'They were formerly a Colony of England, but that on being taxed excessively, they had taken upon them the governing of themselves, as...we shall one day do',[২৩২]—তাঁরা সকলেই সেই ক্রমবর্ধমান স্ববিরোধটির প্রাথমিক লক্ষণ হয়ে দেখা দেন: 'our Rulers are preparing a scourge for their own backs।[২৩৩] হিন্দু কলেজের যে ছাত্ররা 'the ruin of caste' চায়, তারা যে অনতিবিলম্বে 'the ruin of British interests'-ও চাইবে এমন আশঙ্কা ইংরাজ কর্তৃপক্ষের তখন বেশ জন্মায়। রামমোহন স্বদেশের বর্তমান

এবং ভবিষ্যৎ স্বার্থের কথা চিন্তা করেই ইংরাজ শাসক ও শাসনের সঙ্গে সহযোগিতা করেন। সঙ্গে সঙ্গে যখনই তিনি মনে করেন যে ইংরাজ শাসকরা এদেশে কোন ভুল ত্রুটি বা অবিচার অন্যায় করছে, নিঃশঙ্কচিত্তে তিনি তার সমালোচনা ও প্রতিবাদ করেন। তাঁর অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় পেতে ইংরাজদের দেরী হয়নি। তাঁরা অনেকেই তাঁর গুণমুগ্ধ ছিলেন, আবার তাঁর সম্বন্ধে অনেকের একটা আশঙ্কাও ছিল।

কোম্পানীর সরকারের প্রতি রামমোহনের আকর্ষণের প্রধান কারণ ছিল যে বিদেশী হলেও সে সরকার ভারতে আইনের শাসন প্রবর্তন করে—যা পূর্বে ছিল না। এবং আইনের শাসন আছে বলেই দেশের উদ্যোগী পুরুষেরা অবাধে খোলা বাজারে লেনদেন করে অর্থোপার্জন করতে পারে; তাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি সুরক্ষিত থাকে; তারা নাগরিক অধিকার ভোগ করে; শাসনতন্ত্রের জোর জুলুম থেকে মুক্ত বোধ করে; এবং স্বাধীনভাবে তাদের মতামত প্রকাশ করতে পারে—এমন কি সরকারের সমালোচনাও করতে পারে। এই আইনের শাসন এবং ব্যক্তি-স্বাধীনতা, এবং ভারতের সর্বাঙ্গীন উন্নতির সম্ভাব্যতা—এদুটি ব্যাপার, রামমোহনের মতে আবশ্যিক সম্পর্কে যুক্ত: 'A proof of the Natives of India being more and more attached to the British Rule in proportion as they experience from it the blessings of just and liberal treatment, is, that the Inhabitants of Calcutta, who enjoy in many respects very superior privileges to those of their fellow-subjects in other parts of the country, are known to be in like measure more warmly devoted to the existing Government; nor is it at all wonderful they should in loyalty be not at all inferior to British-born Subjects, since they feel assured of the possession of the same civil and religious liberty, which is enjoyed in England, without being subjected to such heavy taxation as presses upon the people there'।[২৩৪] এ ছাড়াও রামমোহন মনে করেন যে 'higher and better educated classes of Europeans'...'educated persons of character and capital', এদেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করলে, উভয় দেশের বন্ধন দৃঢ় হবে, সম্পর্ক হবে ঘনিষ্ঠ, এবং উভয়েই লাভবান হবে—এ হচ্ছে কোম্পানীর

একচেটিয়ানার বিরুদ্ধে Adam Smith এবং Bentham-এর দাওয়াই। কোম্পানীর মালিকরা তাঁর এ মতের সমর্থক ছিলেন কি না, সে আলোচনা এখানে অবান্তর। তবে রামমোহন একথা বলতে চাননি যে ইঙ্গ-ভারতীয় সম্পর্ক চিরকাল রাজা-প্রজার সম্পর্ক হয়েই থাকবে। তিনি স্পষ্টই ইঙ্গিত করেন যে শিক্ষিত, সমৃদ্ধ, উন্নতিশীল ভারত এবং ইংলণ্ড একযোগে ক্রমশ গড়ে তুলবে একটা অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক, সমমর্যাদার ভিত্তিতে। আর, সুদূর ভবিষ্যতে তাদের সে সম্পর্ক যদি বিচ্ছিন্ন হয়ও বটে, তবুও তাদের আদান প্রদান থাকবে অক্ষুণ্ণ : 'Some apprehend,...that if the population of India were raised to wealth, intelligence, and public spirit, by accession and by the example of numerous respectable European settlers, the mixed community so formed would revolt (as the United States of America formerly did) against the power of Great Britain, and would ultimately establish independence. In reference to this, however, it must be observed that the Americans were driven to rebellion by misgovernment, otherwise they would not have revolted and separated themselves from England. Canada is a standing proof that an anxiety to effect a separation from the mother country is not the natural wish of a people, even tolerably well-ruled. The mixed community of India, in like manner, so long as they are treated liberally, and governed in an enlightened manner, will feel no disposition to cut off its connection with England, which may be preserved with so much mutual benefit to both countries. Yet, as before observed, if events should occur to effect a separation, (which may arise from many accidental causes, about which it is vain to speculate or make predictions), still a friendly and highly advantageous commercial intercourse may be kept up between two free and Christian countries, united as they will then be by resemblance of language, religion, and manners'।[৯৩৫] এই 'separation' কথাটা নিয়ে Macaulay এবং Trevelyan যা বলেন তা আমরা আগেই শুনেছি। Trevelyan-এর কথা আরও দুচারটে শোনা যাক : '...The change will...be peaceably and gradually effected : there

will be no struggle, no mutual exasperation ; the natives will have independence, after first learning how to make a good use of it : we shall exchange profitable subject for still more profitable allies...If this course be adopted, there will, properly speaking, be no separation. A precarious and temporary relation will almost imperceptibly pass into another far more durable and beneficial.'।[২৩৬] রামমোহন, Macaulay, Trevelyan প্রভৃতিদের ইঙ্গ-ভারতীয় ভাবনার সমধর্মিতা স্পষ্ট। তবে শাসিত রামমোহন জোর দেন 'principle'-এর ওপর এবং শাসক Macaulay ও Trevelyan জোর দেন 'expediency'-র ওপর। রামমোহন নিঃসন্দিগ্ধ ছিলেন যে 'the amelioration of the native inhabitants' মাত্র ইংরাজ শাসনের মাধ্যমেই সম্ভব। তার জন্য ইংরাজ নীলকরদের সামান্য উৎপীড়ন ভারতবাসীর উপেক্ষা করা উচিত। ১৮২৯ সালে কলকাতায় একটি বক্তৃতাতে তিনি বলেন : 'There may be some partial injury done by the indigo planters ; but, on the whole, they have performed more good to the generality of the natives of this country than any other class of Europeans, whether in or out of the service'।[২৩৭] তিনি নিজেকেও বোঝান, এবং তাঁর ভারতীয় শ্রোতা-দেরও বোঝাতে চান যে ভবিষ্যতের মুখ চেয়ে বর্তমানের দুঃখকে উপেক্ষা কর।

যে ভারতীয় ঐক্য ও আধুনিকীকরণ ইংলণ্ডের দান, তাই কালক্রমে হয়ে দাঁড়ায় তাদের কাল। সে ঐক্য এবং আধুনিকীকরণের প্রথম ভারতীয় প্রবক্তা ছিলেন রামমোহন। দেশের চিন্তাই তাঁর জীবনের প্রধান চিন্তা ছিল। দেশের ভবিষ্যতের কথাই তিনি নিরন্তর ভাবেন। কিন্তু যে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তিনি নিশ্চিত ছিলেন, ইতিহাস তাকে বানচাল করে দেয়। একটা বৃহৎ পরিবর্তন প্রক্রিয়ার ঘূর্ণাবর্তে জড়িয়ে গিয়েছিলেন বলে তিনি দেখতে পান না যে উপনিবেশিক শাসনে ওই 'just and liberal treatment'-এর একটা সীমা আছে। প্রকৃত পক্ষে Munro বা Elphinstone, Metcalfe বা Bentinck, Macaulay বা Trevelyan—সবাই উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের শাসক ; তাঁদের উদার হওয়ার যে সীমা ইতিহাস নির্ধারণ করে দেয় সেটা তাঁরাও দেখতে পান নি। এমনই 'good' নীলকর সাহেবেরা এবং

তাঁদের পোষক ইংরাজ শাসকরা করেন যে রামমোহনের ও Macaulay-র বক্তৃতার ৩০ বছরের মধ্যেই প্রকাশিত হয় দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটক, এবং ঘটে এক সাংঘাতিক নীল বিদ্রোহ।

বন্ধন ও বিচ্ছেদের স্বপ্ন রামমোহন ও Macaulay উভয়েই দেখেন। Macaulay-র বক্তৃতা আগেই শুনেছি। আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা তাঁর কথাগুলির যে ব্যাখ্যাই করুন না কেন, তাঁদের কারোর আশাই পূর্ণ হয়নি। সেটা ইতিহাসের একটা ক্রূর হাসি। ইতিহাসের যে 'accidental causes' সম্বন্ধে 'speculate' করতে রামমোহন ছিলেন নারাজ, বা যে 'accidents' ছিল Macaulayর কাছে 'unforeseen', তা বছর তিরিশের মধ্যেই তাঁদের 'most profound schemes of policy'কে প্রকৃতই 'derange' করে দেয়। রামমোহনের মৃত্যুর এবং Macaulay-র ভারত ত্যাগের ২৫ বছরের মধ্যেই, আগেই বলেছি, এদেশে ইংরাজদের শত্রুরা বন্ধুতে পরিণত হয়, এবং বন্ধুরা শত্রুতে পরিণত হতে শুরু করে। রামমোহন এবং Macaulay-র পরিকল্পনা অনুযায়ী ইংরাজ শাসনের আওতায় ভারতবাসী যে সভ্য বা উন্নত হয়নি তা নয়, তবে তারা যতই তা হয়, ততই যেমন তারা বিগড়ে যায়, তেমনি ইংরাজ শাসকদের ভারতীয় বন্ধন বিচ্ছিন্ন করার অনিচ্ছা বৃদ্ধি পায়। Macaulay-র বক্তৃতার পর ৪০ বছরও কাটেনি। ভারতের প্রধান শাসন Mayo লেখেন: 'We are determined as long as the sun shines in heaven to hold India. Our national character, our commerce, demand it, and we have, one way or another, 250 millions of English capital fixed in this country'।[২৩৮]

রামমোহন যা চেয়েছিলেন তা ঘটেনি। এককালে যাঁদের তিনি ভারতের ত্রাতা বলে স্বাগত জানান আর এককালে, তাঁর এক বিশিষ্ট ভক্ত তাঁদের দস্যু বলে বর্ণনা করেন। এর মানে এই নয় যে রামমোহনের দেশপ্রেম ছিল ভুয়া বা তিনি জাতীয় স্বাধীনতা চান নি। আজকের দিনের উগ্র জাতীয়তাবাদীরা রামমোহনের দেশপ্রেম সম্বন্ধে যে ক্ষোভ প্রকাশ করেন, সেটাও একটা ঐতিহাসিক সমস্যা। মুস্কিল বোধ হয় এই যে—Croce যা বলেছেন, 'All history is contemporary history'।

তবুও রামমোহন বা Macaulay-র ঐতিহাসিক অন্তর্দৃষ্টি ও আশা একেবারে ব্যর্থ হয় নি। তাঁদের মানসপুত্রেরা আশা ছাড়েন নি। শতাব্দীর শেষভাগে

ভারতীয় জাতীয়তাবাদের একজন বিশিষ্ট প্রবক্তা, দাদাভাই নওরোজী বলেন:
'True British rule will vastly benefit both Britain and India. My whole object in all my writings is to impress upon the British people that instead of a disastrous explosion of the British Indian Empire, as must be the result of the present dishonourable un-British system of government, there is a great and glorious future for Britain and India to an extent unconceivable at present, if the British people will awaken to their duty, will be true to their British instincts of fair play and justice, and will insist upon the "faithful and conscientious fulfilment" of all their great and solemn promises and pledges'।[২৩৯] কথাগুলি রামমোহনের বক্তব্যের প্রতিধ্বনি মনে হতে পারে; এবং সেগুলি বলা হয় Bentinck বা Macaulay-র কালে নয়, Mayo, Fitzjames Stephen, John Strachey প্রভৃতিদের কালে। দাদাভাই নওরোজীর রাজনীতির মধ্যে রমেশচন্দ্র জাতীয় স্বাধীনতার বা রাজনীতিক স্বাধীনতার আকাঙ্খার আভাস পান কি?

কে প্রকৃত দেশপ্রেমিক, এটা একটা, আগেই বলেছি, ঐতিহাসিক প্রশ্ন, অভিধানে তার মানে খুঁজতে যাওয়া ব্যর্থ। বিংশ শতাব্দীর সত্তরের দশকে যাঁদের রাজনীতিক কর্মসূচীর একটি অঙ্গ হল অতীতের জাতীয় নেতাদের মুণ্ডচ্ছেদ করা, তাঁদের কার্যকলাপ সমর্থন না করলেও, তাঁরা দেশপ্রেমিক নন বা তাঁদের রাজনৈতিক স্বাধীনতার আকাঙ্খা নেই, একথা অনেকেই স্বীকার করেন না। গান্ধীজি মনে করতেন যে সুভাষচন্দ্র স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রকৃত নেতৃত্বের যোগ্য নন, আবার সুভাষচন্দ্র মনে করেন যে গান্ধীজির দেশসেবা যতই মহৎ হক না কেন 'India's salvation will not be achieved under his leadership'।[২৪০] গান্ধীজি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের একজন অনুগত প্রজা হিসাবেই তাঁর স্বাধীনতা আন্দোলন পরিচালনা করেন। বাল গঙ্গাধর তিলক, যাঁর 'love of national independence' ছিল খুবই 'fiery', ১৯১৪ সালের ২৭এ আগষ্ট বন্দী অবস্থা থেকে মুক্তি প্রার্থনা করে যে চিঠিখানি সরকারকে লেখেন, সেটি পড়লে মনে হতে পারে যে স্বয়ং ভাইসরয় সেটির খসড়া করে তাঁকে দিয়ে সই করিয়ে নেন। ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ শাসকেরা যে সব ভারতীয় নেতাদের হাতে দেশের স্বাধীনতা তুলে দেন, তাঁদের পূর্বপুরুষেরা রামমোহনের কাছ

থেকেই জাতীয়তাবাদের পাঠ গ্রহণ করেন। তফাৎ এই যে 'British instincts of fair play and justice' সম্বন্ধে উত্তর পুরুষদের ক্রমশই মোহমুক্তি ঘটে; এবং সহযোগিতার পথ পরিহার করে তাঁরা অসহযোগিতার পথ গ্রহণ করেন। যে 'fiery love of independence' বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে প্রকাশিত হয়, উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে তা 'chimera'-ই ছিল। ১৮৩২ সালের ব্রিটিশ সংস্কার আইন প্রসঙ্গে রামমোহনের কথা 'As I publicly avowed that in the event of the Reform Bill being defeated I would renounce my connection with this country',[২৪১], ১৯৩২ সালের রাজনৈতিক পটে একেবারে বেমানান বটে—কিন্তু ঐতিহাসিকেরা জানেন যে সেটাই হচ্ছে ইতিহাসের বৈচিত্র।

রমেশচন্দ্র আমার চেয়ে অনেক ভাল জানেন যে ইংরাজ শাসনের প্রতিষ্ঠা ভারতীয়দের পক্ষে কতটা দুর্ভাগ্যের কারণ হয়েছিল, এবং সে শাসনে ভারতের উন্নতি হয় কিনা। এ বিষয়ে তাঁর মতামত তিনি হাজার হাজার পৃষ্ঠায় ব্যক্ত করেন। কাশীপ্রসাদ তার 'রাজনীতিক স্বাধীনতার আকাঙ্খা' ইংরাজী ভাষাতেই প্রকাশ করেন। ইংরাজীতে কবিতা লিখেই মধুসূদন তাঁর সাহিত্য জীবন শুরু করেন। 'বন্দেমাতরম' মন্ত্রের উদ্গাতা বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সাহিত্যিক জীবনের প্রারম্ভে ইংরাজীতে একটি উপন্যাস রচনা করেন। ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের পিতৃপুরুষরা সাধারণত ইংরাজীতেই তাঁদের মনের কথা ব্যক্ত করতেন। আজও স্বাধীনতা লাভের বত্রিশ বছর বাদে ইংরাজী ভাষাকে ভারতীয় জাতীয় ঐক্যের একটি ভিত্তি প্রস্তর মনে করার মানুষের অভাব নেই। আর রমেশচন্দ্র নিজেও তাঁর বিপুল পরিমাণ ঐতিহাসিক রচনার পনেরো আনাই লেখেন ইংরাজী ভাষাতে। ভারতবাসীর ইংরাজী জ্ঞান ইংরাজদের বিস্ময় সৃষ্টি করে।

ইংরাজ শাসনের প্রভাব সম্বন্ধে, দেখা যাক, রমেশচন্দ্রের নিজের মত কি। তিনি লেখেন: 'To put it in a concrete form, the most important result of the impact of Western culture on India was the replacement of blind faith in current traditions, beliefs, and conventions—characteristic of the Medieval Age— by a spirit of rationalism which seeks to inquire and argue before accepting anything. The revolt of the mind against the tyranny of dogma and traditional authorities, beliefs and customs, is the first

requisite for freedom of thought and conscience which lies at the root of progress in social, religious and political spheres of life'।[২৪২] এবিষয়ে রামমোহনের ভূমিকা সম্বন্ধে রমেশচন্দ্রের অভিমত পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। ওই একই প্রসঙ্গে রমেশচন্দ্র আরও লেখেন : 'If we analyze the progress of Indian people during the nineteenth century, it will appear that there was hardly any aspect of life and society which was not deeply affected by the impact. Side by side with the rise of new religious sects, we find a profound change in the orthodox Hindu religion. There was a persistent demand for the removal of social abuses and the introduction of social reforms on modern lines. The ideals and method of education underwent a revolutionary change Equally revolutionary was the change brought into the domain of literature, and modern Indian literatures in spoken languages in different localities had their birth. The periodical literature was an innovation with far-reaching consequences. The printing press made an epoch-making change in the spread of education among the people. All these factors combined to generate among the Indians a strong sense of patriotism and nationalism which had hitherto been lacking'।[২৪৩] এর পরও কি রমেশচন্দ্র বলতে পারেন যে 'ভারতের পক্ষে……ইংরাজদের অধীন থাকা' (৪৫) শুধুমাত্র তার দুর্ভাগ্যেরই কারণ হয়ে দেখা দেয়, বা সে পরাধীনতা 'ভারতে নব জাগরণের উপযোগী নহে' (৪৫)?

আগেই বলেছি ইংরাজদের ভারত অধিকার ঘটে একটা ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার ফলে, কারোর ব্যক্তিগত ইচ্ছায় নয়। আধুনিক ইতিহাসের পাঠকরা জানেন যে সে প্রক্রিয়া যেমন ইংরাজদের বিশাল কৃতিত্বকে সূচিত করে, তেমনি সূচিত করে ভারতীয়দের নিদারুণ ব্যর্থতাকে—খৃষ্টান ঈশ্বরের হাতে ভারতীয় ঈশ্বর ঈশ্বরীদের শোচনীয় পরাজয় ঘটে, যেমন সোমনাথ শিব সুলতান মামুদ বা সুলতান আলাউদ্দিনকে প্রতিরোধ করতে ব্যর্থ হন। ঐতিহাসিক জানেন কোথায় ছিল ইংরাজদের শক্তি এবং ভারতীয়দের দুর্বলতার উৎস ; এবং কিভাবে ভারতীয়েরা নিজেদের ইংরাজ শক্তির অধীনতা পাশে আবদ্ধ করে। ইংরাজদের ভারত জয় একটা যৌথ উদ্যোগে সম্পন্ন হয়—সে উদ্যোগে ইংরাজও

ভারতবাসী প্রায় সমান অংশীদার ছিলেন। রামমোহন ইংরাজদের ভারতে আসতে আমন্ত্রণ জানাননি। নিজাম বা পেশোয়া বা রণজিৎ সিং-এর দেশপ্রেমও তাঁর চিত্তে সঞ্চারিত হয় নি। তিনি তাঁর কালে সংঘটিত একটা ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াকে লক্ষ্য করেন গভীর ভাবে। সে প্রক্রিয়া শুধুমাত্র ভারতীয় নয়, বিশ্ব-ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া। সেটির সঠিকত্ব সম্বন্ধে তাঁর বৌদ্ধিক প্রত্যয় জন্মায়, এবং সেটি যে তাঁর দেশের উন্নতির অনুকূল এসম্বন্ধেও তাঁর কোন সন্দেহ থাকে না। আজকের দিনের হিন্দু বা অন্য রং-এর জাতীয়তাবাদী দেশপ্রেমিকেরা তাঁর ঐতিহাসিক ভূমিকার তাৎপর্য্য ও প্রকৃত চরিত্র বুঝতে অক্ষম হতে পারেন, কিন্তু নিরাসক্ত ঐতিহাসিকেরা হবেন না।

সম্প্রতি একজন বিশিষ্ট ইংরাজ ঐতিহাসিক লেখেন : 'Westernization was the only solution, and if this meant not only learning from and imitating the foreigners but accepting their alliance against the local forces of traditionalism, i.e their domination, then the price had to be paid. It is a mistake to see such passionate 'modernizers' in the light of later nationalist movements simply as traitors and agents of foreign imperialism'।[২৪৪]

রামমোহনের জন্ম এবং মৃত্যু ঘটে যে কালে, বিশ্ব-ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে সেটাকে বলা যায় বিপ্লবের যুগ। বৌদ্ধিক দৃষ্টিতে সেটা ছিল 'rationalism, এবং 'liberalism'-এর যুগ। সে যুগেই আধুনিক গণতান্ত্রিক, শিল্পকেন্দ্রিক, পুঁজিবাদী সভ্যতার আবাদ করা হয়—আর প্রকৃত আধুনিক সভ্যত'-সংস্কৃতির যৌবনোদ্গম ঘটে। সে যুগেই বিপুল গণতান্ত্রিক সংস্কার ও শিল্পোন্নয়নের ফলে ইংলণ্ড হয়ে ওঠে পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী, শক্তিশালী, উদ্ধত ও সম্প্রসারণশীল দেশ। সে যুগের মানুষ রামমোহনের জীবনদর্শনের বাস্তবতা সে যুগেই প্রকটিত হয়—তারপর তা ক্রমশ তাঁর দেশেই একটা প্রেরণাদায়ক ভাবদৃষ্টিতে পরিণত হয়। সে যুগটা যে স্বাভাবিক ঐতিহাসিক প্রচোদনায় ও প্রক্রিয়ায় বেশ দ্রুত একটা ঘোর জাতীয় শক্তি সাধনার এবং আগ্রাসনের যুগে পরিণত হতে পারে, তা রামমোহনের দৃষ্টিতে ধরা পড়েনি। তিনি যখন আন্তর্জাতিক মৈত্রী, ঐক্য ও সমঝোওতার বাণী প্রচার করেন, যখন উৎপীড়িত, পদানত মানুষের মুক্তিতে উদ্দীপনা বোধ করেন, তখন প্রকৃতপক্ষে, সে আন্তর্জাতিকতার বাতি নিবু নিবু। রামমোহনের আন্তর্জাতিক ভাবনা মহৎ ছিল বটে, কিন্তু

তার ভবিষ্যৎ ছিল অন্ধকার। পশ্চাৎদৃষ্টির দ্বারা আজ সেটাই আমরা উপলব্ধি করি।

তাঁর প্রবন্ধে নয়, অন্যত্র রমেশচন্দ্র দেখাতে চেষ্টা করেন যে, যে গভীর জাতীয়তা বোধ উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ভারতবাসীকে উদ্বুদ্ধ করে, যা ভারতীয় নবজাগরণের প্রধান লক্ষণ হয়ে দেখা দেয়, তার মূল উপাদান ও প্রেরণা হচ্ছে, যাকে বলে 'neo-Hinduism'। রমেশচন্দ্রের যুক্তির ধারাটি দুর্বোধ্য নয় মোটেই—ভারতীয় হিন্দু জাতির যে তেত্রিশ কোটি অবসন্ন দেবদেবী কয়েক হাজার ম্লেচ্ছ ইংরাজকে এক সময় প্রতিহত করতে ব্যর্থ হন, হিন্দু রামমোহন তঁদের বর্জন করে উপনিষদের 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' ঈশ্বরে আস্থাবান হন। দেখা যায় যে উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে সেই দেব দেবীরাই আবার জেগে উঠে ভারতবাসী হিন্দুদের এক নতুন ইংরাজ বিরোধী জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ করেন: 'The feeling of Hindu nationalism was further strengthened by the rise of neo-Hinduism, generally known as Revivalism...It was a swing back to Hinduism—not the Vedic Hinduism and monotheism of Rammohan. but the Hinduism with all its subsequent developments (দ্বিসহস্রাধিক দুর্গাপূজা পর্যন্ত!) which were repudiated by him and his followers'।[২৪৫] এখন, যেহেতু রামমোহন কোটি কোটি পৌরাণিক দেবদেবীদের নিন্দুক ছিলেন, সেইজন্য তাঁকে যেমন ভারতীয় নবযুগের উদ্বোধক বলা ভুল হবে, তেমনি ভুল হবে একথা মনে করা যে তাঁর 'vedantic monotheism' ভারতবাসীকে জাতীয়তা বোধে বা দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করে। বরং, মনে হতে পারে যে খৃষ্টান একেশ্বরবাদের সঙ্গে সমধর্মিতার কারণে রামমোহনের ধর্মমত সরাসরি জাতীয়তা বিরোধী হয়ে দাঁড়ায়। রামমোহনের 'justification for supporting India's long subservience to British rule, or condemning the worship of images by the Hindus ......could not serve as an inspiration for, far less contribute in any way to, the dawning of the New Age or National Resurgence in Bengal in the nineteenth century based on the glory of the past and hope for the future, and marked by a sturdy spirit of Hindu nationalism'।[২৪৬]

রমেশচন্দ্রের জাতীয়তাবাদের প্রকৃতি উপলব্ধি করা কঠিন নয়। তাঁর মতামতগুলির যথার্থতা আলোচনা করা অবশ্য এখানে সম্ভব নয়। তবে তাঁর

ভেঙেই আমাদের যাচটা একটু ভেজে নেওয়া যেতে পারে। বিংশ শতাব্দীর ষাট-এর দশকে রামমোহনের রাজনীতি এবং দেশপ্রেম সম্বন্ধে রমেশচন্দ্র কি মনে করেন তার দু-একটি নমুনা পূর্বে দেওয়া হয়েছে। আরও কয়েকটি এখানে দেওয়া হল। এক জায়গায় রমেশচন্দ্র বলেন: 'True nationalism is based on patriotism and love of liberty in general. These ideas were developed in India by the impact of Western culture. The first manifestation of it is seen in Rammohan Roy's passionate love of liberty which "made him take interest in, and deeply sympathise with all political movements all over the world that had for their object the advancement of popular freedom." '।[২৪৭] ওই একই গ্রন্থে রমেশচন্দ্র লেখেন: 'The activities of Rammohan and the five leading citizens of Calcutta in connection with the Press Ordinance of 1823 constitute a notable landmark in the history of India's struggle for freedom'.[২৪৮] আরও লেখেন: 'The most outstanding effect of the impact of Western culture upon India was the growth of modern political concepts such as nationalism, nationality. patriotism and political rights. As in many other fields, so in demand for political rights also, Raja Rammohan Roy took a leading part and set an example to others'।[২৪৯] এবং আরও লেখেন: 'Rammohan was the first Indian to voice the grievances of his country before the British authorities. He may justly be regarded as the pioneer of organized political movement in India, and the method followed by him marks the beginning of what came to be known in later days as constitutional agitation।[২৫০] রামমোহনের রাজনৈতিক ভূমিকা সম্বন্ধে আর একটি উক্তি—যেটি রমেশচন্দ্রের নিজের নয়, তবে যেটিকে তিনি বলেন 'justly estimated by the Englishman,' এখানে উল্লেখযোগ্য: "A Round Table conference in London to discuss India's future, with Indians taking a full share in the discussions, would have been a preposterous and incredible suggestion to Englishmen of the Company's days. It might never have come about had the great Ram Mohan Roy not taken the lead, and three Tagores. a Ghose, and a Banerji, not joined with him in starting the process that led to it'।[২৫১]

রমেশচন্দ্র একমুখে দু'কথা বলেন। রামমোহনের ভক্তরা যা বলেন তা হতে পারে 'সর্বৈব মিথ্যা' (৪০), তবে রমেশচন্দ্রের উপরোক্ত মন্তব্যগুলি পড়ার পর একথা মনে করা কি অসঙ্গত যে সাম্প্রতিককালে তাঁরা সে ভক্তির পাঠ রমেশচন্দ্রের কাছেই গ্রহণ করেন? আমরা রামমোহন-ভক্তদের ভক্ত নই, এবং মনে করি সমগ্র ভাবে ভারতীয় ইতিহাসে রামমোহনের ভূমিকার একটা মূল্যায়ণ নতুন করে হওয়া একান্ত প্রয়োজন। তবে বিংশ শতাব্দীর সত্তরের দশকে রামমোহনের সংস্কার কর্ম এবং রাজনৈতিক ভূমিকার মূল্যায়ণে ইতিহাসাচার্য রমেশচন্দ্র যে ভূমিকা গ্রহণ করেন তা যে ঐতিহাসিক তাৎপর্য্যে টস্‌টসে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

রামমোহনের কথা ছেড়ে দেওয়া যাক। Derozio ও কাশীপ্রসাদ ঘোষ, রামগোপাল ঘোষ ও হরিশ মুখুজ্যে, বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র, শিবনাথ শাস্ত্রী ও আনন্দমোহন বসু, দাদাভাই নওরোজী ও সুরেন্দ্র নাথ, বিবেকানন্দ ও অরবিন্দ প্রভৃতি ব্যক্তিরা ছাড়াও, যেসব ভারতবাসী 'বিলিতি ধরণে হাসতেন ও ফরাসী ধরণে কাশতেন' তাঁরা, এবং ক্ষুদিরাম, ভগৎ সিং প্রভৃতিরা, এবং ১৯৪৭ সালের আগষ্ট মাসের ১৪ তারিখের মধ্যরাত্রে যাঁরা 'new creatures'-এ পরিণত হন, তাঁরাও, সকলেই দেশপ্রেমিক ছিলেন। দেশপ্রেমের রঙ্গশালায় যা তাঁদের স্থান নির্ধারণ করে দেয়, তা হচ্ছে ইতিহাস। তবে সংস্কার, দেশপ্রেম, জাতীয় স্বাধীনতার আকাঙ্খা প্রভৃতি ব্যাপারে ইতিহাসাচার্যের 'approach'টা খুবই সূক্ষ্ম, আধিবিদ্যক—'universale ante rem'।

রামমোহন সংস্কারক পদবাচ্য হতে পারেন কিনা তা আলোচনা করার পর রমেশচন্দ্র তাঁর প্রবন্ধের উপসংহারে আলোচনা করেন রামমোহন মনুষ্য পদবাচ্য কিনা। প্রথমেই বলি, আমরা রমেশচন্দ্রের মন্তব্য পড়ে কিছুটা হতভম্ব হয়ে যাই—বুঝতেই পারিনা ওই ধরণের মন্তব্য করার কারণ কি, এবং রামমোহনের ঐতিহাসিক ভূমিকার আলোচনায় যে মন্তব্যের প্রাসঙ্গিকতাই বা কি। একজন ঐতিহাসিক পুরুষের কীর্তি নানাভাবে অতিরঞ্জিত হতে পারে—হয়ও বটে। সেটা অবশ্যই সমালোচনার বস্তু। কিন্তু তাঁর বুদ্ধি ছিল নিকৃষ্ট স্তরের, তিনি জন্তু জানোয়ারের সামিল ছিলেন, এসব কথা বলার বাসনা একজন প্রবীণ, উচ্চশিক্ষিত, বিজ্ঞ এবং বিশেষ মর্যাদার অধিকারী ব্যক্তির মনে উদয় হয় কি করে? এটা কোন্ ধরণের রুচিবোধ?

যাই হোক, এই ধরণের মন্তব্য, আমরা দেখি, তিনি দুজায়গায় করেন—তাঁর আলোচ্য প্রবন্ধে এবং কয়েক বছর আগে প্রকাশিত একটি গ্রন্থে।[৫৫২] এ বিষয়ে তিনি প্রমাণ সংগ্রহ করেন রামমোহনের সমসাময়িক তিনজন সাহেবের কয়েকটি উক্তি থেকে। তাঁর প্রবন্ধে তিনি আলোচনাটি সারেন উনিশপংক্তির একটি অনুচ্ছেদে। প্রথমে বলেন: 'রামমোহনের প্রতি বিলাতে যে মর্যাদা ও সম্মান দেখান হইয়াছিল বলিয়া তাঁহার ভক্তদের ধারণা—তাহা বেশ কিছু অতিরঞ্জিত এরূপ মনে করিবার সঙ্গত কারণ আছে' (৪৫)। অতিরঞ্জনকারী কারা এবং কি ও কতটুকু অতিরঞ্জন করা হয়েছিল সে বিষয়ে রমেশচন্দ্র অবশ্য কিছু বলেন নি। তবে অতিরঞ্জনের প্রমাণ হিসাবে তিনি কোম্পানীর সেক্রেটারী (Peter Auber) সাহেবের রামমোহন সম্বন্ধে একটি উক্তি উদ্ধৃত করেন। সেক্রেটারী সাহেব বলেন: 'Rammohan Roy is a staunch reformer—he is made much of by the party. I really think he is a mild wellmeaning man of extraordinary *requirements for a Hindu but not of much strength of mind' (৪৫)। সাহেবের আর একটি উক্তি রমেশচন্দ্র অন্যত্র উদ্ধৃত করেন—উদ্দেশ্য একই: 'Rammohan Roy is one of the lions if not the lion of the day. It is astounding what attracts John Bull, whose admiration is divided between the Prince as Rammohan Roy is called and Paganini the celebrated violin player।'[৫৫৩] Peter Auber-এর প্রথম উক্তিটির একটি বাংলা অনুবাদও রমেশচন্দ্র তাঁর প্রবন্ধে সংযোজিত করেন। তিনি বলেন: 'সংস্কারক রামমোহন সম্বন্ধে (বিলাতে) অনেক বাড়াবাড়ি করা হইতেছে। আমার বিশ্বাস তিনি হিন্দুদের মানদণ্ডে বিচার করিলে বেশ ভাল এবং অসাধারণ শক্তি সম্পন্ন বলিয়া বিবেচিত হইবার যোগ্য কিন্তু খুব মানসিক শক্তি সম্পন্ন নহেন' (৪৫)। বলে রাখি, যে সূত্র থেকে রমেশচন্দ্র Auber-এর চিঠি দুটি সংগ্রহ করেন, তার সঙ্গে আমার পরিচয় নেই। তবে সম্প্রতি প্রকাশিত অন্য একটি সূত্র গ্রন্থে আমি চিঠি দুটোর সন্ধান পাই। সেখানে দ্বিতীয় চিঠিটির বয়ান যা আছে তা রমেশচন্দ্রের উদ্ধৃতির সঙ্গে প্রায় মিলে যায়। কিন্তু প্রথম চিঠিটির বয়ানে একটা বিশেষ পার্থক্য লক্ষিত হয়। আমি আমার সূত্র থেকে চিঠিটা আংশিক ভাবে উদ্ধৃত করছি: 'Ram Mohan Roy, who I have had some long conversation with, is a staunch reformer

* Acquirement !

—he is made much of by the [utilitarian] party. I really think he is a mild, well meaning man of extraordinarily fine presence for a Hindu but not of much strength of mind.।[৪৪৪] 'utilitarian' শব্দটি সংযোজিত করেন সূত্রটির সম্পাদক, C. H. Philips. আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয় কোন বয়ানটি সঠিক। এই অবস্থায়, রমেশচন্দ্র যা উদ্ধৃত করেন সেটিরই আলোচনা আমি এখানে করব। প্রথম উক্তিটির রমেশচন্দ্র-কৃত বাংলা অনুবাদটি পাঠকরা লক্ষ্য করবেন। পরে সেটি সম্বন্ধে দুচার কথা বলব। এখন, Auber-এর ইংরাজী এবং রমেশচন্দ্রের বাংলা পড়লে সহজেই বোঝা যায় যে, যে অতিরঞ্জনের কথা রমেশচন্দ্র বলেন, তা করেন রামমোহনের বিলাতী ভক্তেরা, দেশীয় ভক্তেরা নয়। বিলাতে তখন কোন ভারতীয় বা বাঙালী 'party' ছিল না। Philips বলেন সে 'party' হচ্ছে 'utilitarian'রা। তাঁরা যাঁরাই হন না কেন, রামমোহনের তাঁরা যে গুণমুগ্ধ ছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই, এবং Auber যে সে 'party'র একজন ছিলেন না সেটাও ঠিক। হয়ত রমেশচন্দ্র বলতে চান যে সে 'party' বিলাতে রামমোহনকে নিয়ে যে বাড়াবাড়ি করেন, পরবর্তীকালে তাঁর দেশীয় ভক্তেরা তা সোৎসাহে উল্লেখ করেন, এবং তার উপর কিছু রংও চড়িয়ে দেন।

আসল কথা হচ্ছে Auber-এর জবানীতে রমেশচন্দ্র দেখাতে চান রামমোহন প্রকৃত কি দরের মানুষ (বা অমানুষ) ছিলেন, এবং বিলাতে তাঁকে 'যে মর্যাদা ও সম্মান দেখান হয়েছিল' তিনি তার যোগ্য ছিলেন না। রমেশচন্দ্র-উদ্ধৃত Auber-এর সংক্ষিপ্ত উক্তির মধ্যে, 'he is a mild wellmeaning man of extraordinary requirements for a Hindu' এই অংশটির অর্থ বোধগম্য হলেও 'not of much strength of mind' বলতে তিনি প্রকৃত কি বোঝাতে চান তা আমার কাছে স্পষ্ট নয়। যাই হক, এটা পরিষ্কার যে Auber রামমোহনকে একজন 'man' বলেই মনে করেন—একজন শান্ত, ধীর প্রকৃতির, সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত এবং অসাধারণ গুণসম্পন্ন 'man'। রমেশচন্দ্র অবশ্য মনে করেন যে Auber-এর 'for a Hindu' 'কথাটি বিশেষ অর্থব্যঞ্জক'। এবং সেই বিশেষ অর্থব্যঞ্জনার প্রত্যায়ক হিসাবে রমেশচন্দ্র—মনে হয় এক মহান আবিষ্কারের উদ্দীপনায়, ঝাঁপিয়ে পড়েন Auber-এর পূর্ববর্তী দুজন সাহেবের বাঙালী ও হিন্দুদের সম্বন্ধে দুটি মন্তব্যের ওপর। প্রথমটি হল, রমেশচন্দ্রের ভাষায়, "১৭৯২ খ্রীঃ চার্লস গ্র্যান্ট……লিখিয়াছিলেন যে ইউরোপের সর্বাপেক্ষা অনুন্নত সম্প্রদায়

অপেক্ষাও বাঙালীরা নিকৃষ্ট', এবং দ্বিতীয়টি, '১৮১৩ খ্রীঃ ভারতের বড়লাট লর্ড হেস্টিংস তাঁহার রোজনামচায় (diary) লিখিয়াছেন, "হিন্দুরা জন্তু জানোয়ারের সামিল (the Hindoo appears a being nearly limited to mere animal functions)" '(৪৫)। Grant, Hastings এবং Auber-এর এই উক্তিগুলি রমেশচন্দ্রের যুক্তি অনুযায়ী সাজালে ব্যাপারটা দাঁড়ায় এই রকম : 'ইউরোপের সবচেয়ে অনুন্নত সম্প্রদায় অপেক্ষাও বাঙালীরা নিকৃষ্ট,' এবং 'হিন্দুরা জন্তু জানোয়ারের সামিল' ; এখন রামমোহন ছিলেন একজন বাঙালী হিন্দু, সুতরাং তিনিও ছিলেন অতি নিকৃষ্ট জীব, 'জন্তু জানোয়ারের সামিল।' তফাৎটা (Auber-এর কথার রমেশচন্দ্র-কৃত ব্যাখ্যা অনুযায়ী) হচ্ছে যে তিনি ছিলেন 'অসাধারণ শক্তি সম্পন্ন' জন্তু—অর্থাৎ ঠিক নেড়ীকুত্তা নন, Alsatian কুকুর, বা, পাতি বাঁদর নন, শিম্পাঞ্জী। এরপর অবশ্যই রামমোহনের বুদ্ধিশুদ্ধি সম্বন্ধে তাঁর ভক্তদের 'খুব উচ্ছ্বসিত হইবার কারণ নাই'। অর্থাৎ, রমেশচন্দ্রের মতে রামমোহন যে অসাধারণ প্রতিভা সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন, সেটা প্রচলিত ধারণা মাত্র—তাঁর ভক্তদের উচ্ছাস ; প্রকৃত সত্য হচ্ছে যে তিনি ছিলেন জন্তু জানোয়ারের সামিল। আমরা জানি না, Auber যখন 'for a Hindu' কথাটি বলেন, তখন ঠিক Grant বা Hastings-এর কথা মনে করেই বলেন কিনা। তবে 'বাঙালী' এবং 'হিন্দু' সম্বন্ধে রমেশচন্দ্র যে Grant এবং Hastings-এর সঙ্গে একমত তাতে কোন সন্দেহ নেই—না হলে, অত বড় বড় সাহেবদের কথা এবং প্রমাণ তিনি উল্লেখ করবেন কেন? বিচিত্র এই যে রমেশচন্দ্র নিজেও রামমোহনের মত বাঙালী এবং হিন্দু (একেশ্বরবাদী নন) হলেও Grant এবং Hastings-এর মতগুলি তিনি অভ্রান্ত মনে করেন। এরপর ধরা যেতে পারে যে পাণিনি বা কালিদাস, আর্য্যভট্ট বা শঙ্কর, বিদ্যাসাগর বা বঙ্কিমচন্দ্র, দয়ানন্দ বা বিবেকানন্দ, সকলেই ওই যুক্তি অনুযায়ী, ছিলেন জন্তু জানোয়ারের সামিল। অবশ্য মনে হয়, রমেশচন্দ্র ঠিক তা বলতে চাননি। তাঁর বক্তব্য হচ্ছে যে শুধুমাত্র রামমোহনের সমসাময়িক হিন্দুরাই ছিলেন জন্তু জানোয়ারের সামিল, অর্থাৎ, বলা যেতে পারে যে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রামদুলাল দে, রামকমল সেন, রাধাকান্ত দেব, দ্বারকানাথ ঠাকুর, Derozio-র ছাত্ররা প্রভৃতি সকলেই ছিলেন জন্তু জানোয়ারের সামিল। 'Social relations between Englishman and Indians' নামে রমেশচন্দ্রের রচনাটির সঙ্গে যাঁরা পরিচিত তাঁরা তাঁর আলোচ্য প্রবন্ধটি পড়লে হয়ত বিভ্রান্ত বোধ করতে পারেন (দ্রষ্টব্যঃ সূত্র ৩ (ঘ) পৃঃ ৩৩৭-৩৮০)।

প্রশ্ন হল, বাঙ্গালী এবং হিন্দুদের চরিত্র সম্বন্ধে বিলাতী দুএকটি মতকে রমেশচন্দ্র অভ্রান্ত বলে ধরে নিলেন কেন? তিনিত ভারতীয় ঐতিহাসিকদের গুরু—প্রায় সত্তর বছর অক্লান্তভাবে ঐতিহাসিক গবেষণা করেছেন তিনি। ইতিহাস রচনার পদ্ধতি ও প্রণালী সম্বন্ধে তাঁর চেয়ে জ্ঞানী ব্যক্তি ভারতবর্ষে কেন, পৃথিবীতেই হয়ত নেই। তিনি কি বোঝেন না যে 'opinion' ও 'fact', 'testimony' ও 'evidence', এগুলির মধ্যে বৃহৎ পার্থক্য আছে? ভারতবাসীদের চরিত্র সম্বন্ধে—বিশেষ করে রামমোহনের চরিত্র ও প্রতিভা সম্বন্ধে আর কোন ইয়োরোপীয় মতামতের সঙ্গে কি তাঁর পরিচয় নেই? তিনি ত পরম সত্যবাদী, তিনি কি মনে করেন সত্যনিষ্ঠ ঐতিহাসিকেরা ওই পদ্ধতিতেই সত্য উদ্‌ঘাটন করেন? Hastings ছিলেন রামমোহনের সমসাময়িক; রামমোহনকে তিনি ভালভাবেই জানতেন—অন্তত তাঁর কার্যকলাপের কথা। তিনি অনেক বিশিষ্ট বাঙ্গালী হিন্দুকেও ব্যক্তিগত ভাবে চিনতেন, এবং তাঁদের সংস্কার কর্মের উৎসাহী সমর্থক ছিলেন। ১৮১৩ সালে হিন্দুদের সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্যটির প্রকৃতি ও মূল্য বিচার করতে কি রমেশচন্দ্র অক্ষম? তিনিত বিশ্ব ইতিহাস রচনার আন্তর্জাতিক উদ্যোগে এক বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেন—তিনি কি কখনও উপলব্ধি করেন নি যে পৃথিবীর একজাতি বা গোষ্ঠী সম্বন্ধে আর একজাতির বা গোষ্ঠীর মতামত বহুলভাবে নির্ভর করে তাদের ঐতিহাসিক পরিস্থিতি ও পারস্পরিক সম্পর্কের ওপর? তিনি কি জানেন না যে ইতিহাসে সাধারণভাবে বিজয়ী জাতিরা বিজিত জাতিদের নিকৃষ্ট প্রমাণ করার চেষ্টা করে এসেছে? এ সম্বন্ধে তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাই বা কি? তিনি কি অবগত নন যে আজও, এই মুহূর্তে পৃথিবীর অনেক তথাকথিত সভ্য সাদা মানুষের সংকীর্ণতা, আত্মম্ভরিতা এবং নির্মম ঔদ্ধত্যের বিষাক্ত নিঃশ্বাসে পৃথিবীর বাতাস দূষিত হচ্ছে? তিনি কি দেখতে পান না যে পূর্ব-বর্তীকালে কেন, আজও, বিংশ শতাব্দীর শেষপাদে তাঁর দেশবাসী লক্ষ লক্ষ বাঙ্গালী, আর কোটি কোটি হিন্দু তাঁর চারপাশে পোকামাকড়ের মত মাটি কামড়ে নড়ে চড়ে বেড়াচ্ছে? একথা কেউ অস্বীকার করবে না যে অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীতে, শুধু বাঙ্গালী কেন, ভারতের সব অঞ্চলের হিন্দুদের জীবন নানারকম বীভৎস বর্বরতায় আচ্ছন্ন ছিল। কিন্তু বাঙ্গালী এবং হিন্দুদের চরিত্র সম্বন্ধে যে উদ্ধত ও বস্তাপচা মন্তব্য ও সামান্যীকরণ Grant এবং Hastings করেন, তা কি আজ কোন সৎ, স্থিতধী ঐতিহাসিকের কাছে গ্রাহ্য? রমেশচন্দ্রের

ঐতিহাসিক চিত্তে বিলাতী মতামতগুলি সত্য রূপে প্রতীত হয়—যথায় প্রয়োজন হয়, তাই তিনি সেগুলিকে আঁকড়ে ধরেন। এবং সত্যানুসন্ধায়ী ঐতিহাসিকের চিত্তে যখন সেগুলি সত্য হয়ে প্রতিভাত, তখন সেগুলি সত্য না হয়ে পারে না। হে ঐতিহাসিক, 'সেই সত্য যা রচিবে তুমি, ঘটে যা তা সব সত্য নয়'। Berkeley-র ভূত এখনও পৃথিবীতে বিচরণ করছে।

Peter Auber বিদগ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। ভারতবর্ষের ইতিহাস, কোম্পানীর শাসন ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয়ের ওপর তিনি কয়েক খণ্ড গ্রন্থ রচনা করেন। বিলাতে, রামমোহনের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল: 'Shortly after his (রামমোহনের) arrival I had frequent intercourse with him।'[২৫৫] রামমোহন লণ্ডন পৌঁছান ১৮৩১ সালের এপ্রিল মাসের শেষের দিকে। ৬ই মে'র এক চিঠিতে Auber, Bentinck-কে লেখেন: 'Ram-Mohan Roy has not been well. I have left my card and been favoured with you Lordship's letter. I meet him tomorrow at the chairman's for dinner and he has intimated his intention of calling on me soon. He is quite a lion at the west end of the town'।[২৫৬] কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ রামমোহনের ওপর বিশেষ প্রসন্ন ছিলেন না। প্রথমে তাঁরা লণ্ডনে তাঁকে আমল দিতে নারাজ ছিলেন—একেবারে কাজের ব্যাপারে ছাড়া। কিন্তু 'the people of England in their own spontaneous way' রামমোহনকে সম্বর্ধনা জানালে, 'The very same men who had treated him with scorn in India now eagerly courted his acquaintance. The change of attitude was conspicuously signalized on the 6th of July, 1831, when a dinner was given to the distinguished stranger by the East India Company'।[২৫৭] ৭ই জুলাই Auber লেখেন: 'Ram Mohan Roy dined with the court of directors at a formal dinner. Lord Caledon, Sir M. Macdonald and some of the other members of the board together with Sir J. Malcolm were present. Ram Mohan Roy begged to propose the board of commissioners and then the East India Company when he really expressed himself very well, and alluded in pointed terms of gratitude to your Lord, ship's

administration, thanking the Company for having appointed your Lordship to reign over them. He is full, indeed overflowing in favour of reform and enters into the question with the zeal of the most zealous supporter of the bill. I have had a good deal of intercourse with him.'।[২৫৮] (আরও দেখুন একই সূত্রে)। Auber রামমোহনের ভক্ত ছিলেন না—তাঁর সম্বন্ধে তাঁর মোটেই কোন অত্যুচ্চ ধারণা ছিল না। তিনি মনে করেন বিলাতের 'utilitarian' রা এবং 'unitarian'রা অতি প্রশংসা ও খাতির করে তাঁর মাথা ঘুরিয়ে দেন। তবে রামমোহন যে খুবই যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন তা তিনি উপলব্ধি করেন। যাই হক Auber সাহেব বা তাঁর মন্তব্য আমাদের সমস্যা নয়; সমস্যা হচ্ছে সে মন্তব্যের কি অর্থ এবং তাৎপর্য্য রমেশচন্দ্র ব্যাখ্যা করেন তাই নিয়ে। Auber বলেন যে রামমোহন একজন 'staunch reformer' ছিলেন। রমেশচন্দ্র তাঁর বাংলা অনুবাদে 'staunch' শব্দটিকে উপেক্ষা করেন। কেন করেন তা বোঝা কঠিন নয়। যে ব্যক্তি সংস্কার বিরোধী, তিনি আবার 'staunch' সংস্কারক কি করে হতে পারেন? তাই রমেশচন্দ্র 'staunch reformer' শব্দটিতে একটু জল মিশিয়ে পাতলা করে, সেটিকে শুধু 'সংস্কারক' এই ভাষায় পরিবেশন করেন। তারপর, রমেশচন্দ্র তাঁর বাংলা অনুবাদের এক জায়গায় বলেন যে রামমোহনকে 'হিন্দুদের মানদণ্ডে বিচার করিলে বেশ ভাল এবং অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন বলিয়া' মনে করা যেতে পারে, কিন্তু তিনি 'খুব মানসিক শক্তিসম্পন্ন নহেন।' প্রশ্ন হল, ওই 'অসাধারণ শক্তি'-টাই বা কি, আর 'খুব মানসিক শক্তি'-টাই বা কি? মানসিক কথাটার অর্থ যখন 'মন সম্বন্ধীয়', তখন 'মানসিক শক্তি' বলতে রমেশচন্দ্র, মনে হওয়া উচিত, বৌদ্ধিক ও নৈতিক শক্তি এবং ইচ্ছাশক্তি বা দৃঢ়চিত্ততা, ইত্যাদিকেই বোঝান। সেগুলো সবই, রমেশচন্দ্র প্রমাণ যোগে দেখান যে রামমোহনের না থাকারই, বা, খুব কম থাকারই কথা। আবার, রামমোহনের 'অসাধারণ শক্তি' অবশ্যই তাঁর মানসিক শক্তির পরিচায়ক নয়। তাহলে সেই 'অসাধারণ শক্তি'-টা কি? রামমোহনের কালে সাহেব সুবোরা বাঙালী হিন্দুদের দুর্বল জাতি বলে মনে করতেন। তবে রামমোহন বাঙালী হিন্দু হওয়া সত্ত্বেও দীর্ঘদেহী, বলিষ্ঠ মানুষ হিসাবে দেশী-বিদেশীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। হয়ত রমেশচন্দ্র বলতে চান যে সেটাই ছিল রামমোহনের 'অসাধারণ শক্তি'-র নিদর্শন। তখনকার দিনে বাঙালী

ভদ্র বাবুরা কেউ কেউ—হয়ত তাঁদের দুর্নাম ঘোচাবার জন্য, কুস্তি লড়তেন। রামমোহনও ছিলেন একজন বাঙালী ভদ্র বাবু। কিন্তু স্বদেশে বা বিদেশে কুস্তিগীর হিসাবে তিনি কোন 'মর্যাদা ও সম্মান' পান বলে আমাদের জানা নেই। তবে ভারতীয়, হিন্দু হিসাবে সে যুগের ইংলণ্ডে তিনি বিশেষ কৌতূহলের বস্তু হন। হয়ত রমেশচন্দ্র ইঙ্গিত করতে চান যে জন্তু জানোয়ারের খেলা দেখে বিস্মিত দর্শকরা যেমন প্রবল উত্তেজনায় চেঁচিয়ে ওঠেন ও হাততালি দেন, তেমনি জন্তু জানোয়ারের সামিল রামমোহনের চালচলন দেখে বিলেতের লোকেরা ওই রকম হৈচৈ করতে থাকে। (এই প্রসঙ্গে ২৮৪ নং ঘ সূত্র দেখুন)। Grant বা Hastings হিন্দুদের যে বর্ণনা দেন তার আলোতে প্রত্যক্ষ করলে রামমোহন ভক্তদের রামমোহন-চরিত্র সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত হবার অবশ্যই কোন কারণ নেই, তবে রমেশচন্দ্রের উল্লসিত বোধ করার কারণ যে আছে তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

Peter Auber বাঙালী এবং হিন্দুদের চরিত্র সম্বন্ধে Grant এবং Hastings-এর মতানুবর্তী ছিলেন, এটা আবিষ্কার করে রমেশচন্দ্র তাঁর বৌদ্ধিক উদ্ভাবনী শক্তির এক বিশেষ উৎকর্ষের পরিচয় দেন। কিন্তু Grant এবং Hastings-এর কথাগুলি কি 'scurrilous abuses' নয়? দেখা যাক হিন্দুদের সম্বন্ধে অন্য কোন মত সাহেবরা পোষণ করতেন কিনা। এটা সর্বজনবিদিত যে Grant-এর সমসাময়িক William Jones হিন্দু সভ্যতা-সংস্কৃতির একজন বিশিষ্ট গুণগ্রাহী ছিলেন, এবং হিন্দুদের তিনি একটা প্রকৃত সভ্য জাতি বলে মনে করতেন, যদিও তাদের ঘোর দুর্বলতাগুলি তাঁর অজানা ছিল না। Grant-এর সমসাময়িক জনৈক অনামা ইংরাজের একটি উক্তি এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে: 'In the course of a long residence in India, I have had numerous occasions of contemplating the Hindoo character; have mixed much in their society; have been present at their festivals; have endeavoured to conciliate their affections; and I believe, not without effect: and I must do them the justice to declare, that I have never met with a people, exhibiting more suavity of manners, or more mildness of character; or a happier race of beings, when left to the undisturbed performance of their rites of their

religion. And it may be truly said that if Arcadian happiness ever had existence, it must have been rivalled in Hindostan'।[২৫৯] এটি অবশ্যই অতিশয়োক্তি। ভারতবর্ষ এক স্বর্গরাজ্য, এবং এখানকার অধিবাসীরা এক একজন দেবদূত, একথা দেশী বা বিদেশী যেই-ই বলুন না কেন, ঐতিহাসিকের কাছে গ্রাহ্য নয়। তবে এরকম দৃষ্টিভঙ্গী-সম্পন্ন সাহেবও তখন ছিলেন। Grant-এর আর একজন সমসাময়িক সাহেব, Thomas Munro-র, বিষয়টি সম্বন্ধে একটি খেদোক্তি রমেশচন্দ্র নিজেই তাঁর একটি গ্রন্থে উল্লেখ করেন।[২৬০] Thomas Munro ১৭৮০ সালে ভারতে আসেন, ১৮২০ সালে মাদ্রাজের গভর্ণর হন, এবং একজন বিশিষ্ট ইংরাজ প্রশাসক হিসাবে খ্যাতিলাভ করেন। Grant এবং Hastings-এর আরও একজন সমসাময়িক, John Malcolm—ভারতে আসেন ১৭৮৩ সালে, বোম্বাইয়ের গভর্ণর নিযুক্ত হন ১৮২৪ সালে, এবং ভারত ত্যাগ করেন ১৮৩০ সালে। তিনি একবার লেখেন: 'I can recollect (and I do it with shame) the period when I thought I was very superior to those with whom my duty made me associate; but as my knowledge of them, and of myself, improved, the distance between us gradually lessened. I have seen and heard much of our boasted advantages over them; but can not think, that if all the ranks of the different communities of Europe and India are comparatively viewed, there is just ground for any very arrogant feeling on the part of the inhabitants of the former: nor can I join in that commonplace opinion which condemns in a sweeping way the Natives of the country as men taking the best of them, not only unworthy of trust, and devoid of principles, but of too limited intelligence and reach of thought, to allow of Europeans with large and liberal minds and education, having rationl or satisfactory intercourse with them'।[২৬১] আর একজন বিশিষ্ট ইংরাজ, Bishop, Reginald Heber, ১৮২৩ সালে কলকাতায় আসেন। তিনি কলকাতায় বাঙ্গালী হিন্দু সমাজের অনেকের সঙ্গে ভালভাবেই পরিচিত হন—রামমোহনের সঙ্গেও। তিনি

তাঁদের সম্বন্ধে লেখেন : 'Of the people, so far as their natural character is concerned, I have been led to form, on the whole, a very favourable opinion. They have, unhappily, many of the vices arising from slavery, from an unsettled state of society, and immoral and erroneous systems of religion. But they are men of high and gallant courage, courteous, intelligent, and most eager after knowledge and improvement, with a remarkable aptitude for the abstract sciences, geometry, astronomy, &c. and for the imitative arts, painting and sculpture. They are sober, industrious, dutiful to their parents, and affectionate to their children, of tempers almost uniformly gentle and patient, and more easily affected by kindness and attention to their wants and feelings than almost any men whom I have met with.'।[২৬২] হিন্দু কলেজের প্রধান শিক্ষক,—যিনি ১৮৪২ সালে কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ হিসাবে নিযুক্ত হন, এক প্রসঙ্গে লেখেন : 'Many of those who have had experience in the colleges and schools established by the Indian Government, are ready to acknowledge that in quickness of apprehension, in retentiveness of memory, in a happy talent for learning languages, and for mastering the truths of science, Hindoo students are not a whit behind English students of the same age. Indeed, it is very generally admitted that, up to a certain age, young Hindoos are, if anything, quicker and more intelligent than Europeans. In the common concerns of life the natives of India exhibit no deficiency of intellect. In all matters of business, in everything affecting their own interests, they display great practical acuteness. As bankers and shopkeepers they are not only clear headed, but they have the spirit of patient perseverence in a high degree while a Hindoo lawyer......is one of the subtlest of living mortals'।[২৬৩] যাঁদের কথা বলা হল, তাঁরা কেউ-ই হিন্দু বা বাঙালীদের অন্ধ প্রশংসক নন। এবং তাঁরা, বিদ্যা, বুদ্ধি, বিজ্ঞতা, অভিজ্ঞতায় Grant বা Hastings-এর চেয়ে নিকৃষ্ট মানুষ ছিলেন, একথা মনে করার কোন কারণ নেই। এ রকম দৃষ্টান্ত আরও দেওয়া যেতে পারে।

রমেশচন্দ্র তাঁর একটি গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে 'Dwarkanath Tagore... ......a very distinguished man of his age observed in a speech in 1836, that "twenty years ago the Company treated the Indians as slaves" ।'২৬৪ মনে রাখা দরকার যে 'that pre-eminently English babu, Dwarkanath Tagore' কোম্পানীর একজন বংশবদ ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু কোম্পানীর ওই ব্যবহারে নিশ্চয় তিনি খুশী হন নি। রমেশচন্দ্র কি খুশী? মনেত হয় না। তবে ভারতবাসী সম্বন্ধে কতকগুলি বাছাই করা বিলাতী মতামতের ওপর তাঁর অত শ্রদ্ধা কেন? আবার Bentinck-এর কথায় আসা যাক। Bentinck যে ভারতের প্রথম সংস্কারবাদী গভর্ণর-জেনারেল ছিলেন তা নয়। তবে তিনিই প্রথম গভর্ণর-জেনারেল, যাঁর কর্মসূচী মোটামুটি একটা ভাবতাত্ত্বিক প্রত্যয়ের দ্বারা প্রণোদিত হয়। সংস্কার কর্মে একটা নিছক সুবিধাবাদী পথ অনুসরণ করার পক্ষপাতী তিনি ছিলেন না। ভারতবাসীদের সম্বন্ধে তাঁর নিজের মনোভাব যেমন স্পষ্ট ছিল, তেমনি সাধারণভাবে ভারতীয় ইংরাজ শাসকদের মনোভাব কি এবং তা কেন, তাও তাঁর মনে স্পষ্ট ছিল। পূর্বোক্ত, Evangelical, Charles Grant-এর পুত্র, Charles Grantকে একটি চিঠিতে তিনি লেখেন: 'is it not owing to the monstrous absurdity of committing the government of 60 millions of people to less than 400 strangers, and to the still more monstrous rapacity of seizing for the benefit of this incapable few all the honours and emoluments of the administration, to the exclusion of the native and natural agency of the country?............the exclusion of the natives from a participation in the government, which I do so much condemn, was, I perfectly well know, most honestly determined by a belief in the utter worthlessness of the native character and of their unfitness for all charges of trust. Happily this prejudice, the growth of our conceit, tho' still entertained by most of the other servants, is giving way rapidly to more liberal and enlightened principles on the part of the younger part of the service......'২৬৫। ওই একই ব্যক্তিকে, একদিন বাদে Bentinck আবার লেখেন: 'In reference to my letter of yesterday respecting native agency, I am very much pleased with your bill

making native gentlemen justices of the peace. It will elevate them in their own esteem and in that of the society at large. But I conclude you were well aware that this would be disapproved by the almost unanimous feeling of the European aristocracy, who still treat the native of the highest character and caste as an inferior and subordinate creature. You have now said to them "They are as good as you" and you have said wisely and justly।'২৬৬ সমস্যাটি Bentinck ঠিকই ধরেন, এবং অঙ্গুলি নির্দেশ করেন তাঁর দেশবাসীর 'prejudice' এবং 'conceit'-এর আসল কারণের দিকে। এই সম্বন্ধে কোম্পানীর একজন ভারতীয় কর্মচারীর অভিজ্ঞতার কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। Derozio-র ছাত্র হরচন্দ্র ঘোষ 'used to speak with his official superior and conduct his correspondence in English and to observe English etiquette To civilians of those days this was intolerable, and one Scotchman, a District Judge, otherwise a good and pious man, who highly respected Babu Harachandra's ability and character, frankly told him,—"Harachandra, I like you personally and have a great respect for your talents but I do not like your English education. As conquerors of this country we cannot persuade ourselves to admit natives to our Society on terms of equality. I may be rude in thus speaking my mind to you, but depend upon it, this is more or less the feeling of Europeans in this country" '২৬৭। জজ-সাহেব সৎলোক ছিলেন, তাই খোলাখুলি হরচন্দ্রকে তাঁর মনের কথাটা জানিয়ে দেন—কোন কাপট্য বা ভণ্ডামীর তিনি আশ্রয় নেন না। তবে ওই ভণ্ডামী ছিল সাধারণভাবে ইংরাজদের, বিশেষ করে ভারত হিতৈষী ইংরাজ Evangelical পাদ্রীদের আচরণের একটি মূল উপাদান। একটা দৃষ্টান্ত উল্লেখযোগ্য। বাঙালী পাদ্রী লালবিহারী দে উনবিংশ শতাব্দীর একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। পাদ্রী Alexander Duff-এর তিনি বিশেষ ঘনিষ্ঠ এবং প্রিয়পাত্র ছিলেন। তিনি কলকাতার স্কটল্যাণ্ডীয় Mission Council-এর একজন সভ্য মনোনীত হবার দাবী জানান Mission-এর প্রধান, Duff সাহেবকে। সে দাবী Duff সাহেবের খুবই অপছন্দ ছিল, যদিও লালবিহারী দে কোন অযৌক্তিক দাবী করেন নি। বিষয়টি প্রসঙ্গে লালবিহারী দে লেখেন: "I, when

I was asked my views in my turn, said that Presbytarian parity certainly regarded parity in ecclesiastical matters only, but that, in the peculiar constitution of our mission, every ordained native missionary was as much entitled to a seat in the Mission Council as every ordained European missionary; that it was not a little singular that, while every young missionary, immediately on coming from Scotland, was admitted into the Mission Council, the ordained native missionaries, who were older and more experienced, were excluded; that this distinction appeared to be an invidious one; and that the distinction made between the European and native missionary was contrary, not only to the principle of Presbytarian parity, but to the essence and spirit of Christianity itself. Duff and Ewart were, of ccurse indignant'।[২৩৮] শেষ পর্যন্ত লালবিহারী অবশ্যই Mission Council-এ প্রবেশ করতে ব্যর্থ হন। পাপিষ্ঠ হিন্দু লালবিহারী দে খৃষ্টান হয়ে পুণ্যাত্মা লালবিহারী দে-তে পরিণত হলেও, পুণ্যপ্রাণ সাহেব Alexander Duff-এর কাছে তিনি ছিলেন 'Native'—নিকৃষ্ট ভারতবাসী, বাঙালী, সুতরাং তিনি যতই যোগ্য বা অভিজ্ঞ হন না কেন, সাহেবী মর্যাদার অনধিকারী। প্রচারক পাদ্রী সাহেবরা ভারতে কি অসুবিধায় পড়তে পারেন, তা শতাব্দীর একেবারে গোড়াতেই গভর্ণর-জেনারেল Lord Wellesley উপলব্ধি করেন: 'Lord Wellesley said that he was personally favourable to the conversion of the heathen; but inquired whether it would be safe to circulate the Bible, which taught the doctrine of Christian equality, without the safeguard of a commentary'।[২৩৯]

ভারতে এবং বিলাতে অনেক ইংরাজের কাছে রামমোহন এক বিষম সমস্যা হয়ে দেখা দেন। তিনি তাদের শাস্ত্র, তাদের জ্ঞান বিজ্ঞান, রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যাগুলি তাদের সঙ্গে সমান দক্ষতার সঙ্গে আলোচনা করেন—এটা অনেকের যেমন অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করে, তেমনি অনেকের কাছে আবার খুবই অসহ্য ঠেকে। রামমোহনের এক বিশিষ্ট ইংরাজ বন্ধু বঙ্গদেশের দুটি গোষ্ঠীর—Wilson সাহেবের 'Hindu bigot', (ধর্মসভা) এবং Mangles সাহেবের 'Christian bigots',—কথা উল্লেখ করে Bentinck-কে লেখেন যে

'Both of those parties abhor Ram Mohan Roy and his sect (which I rejoice to say gains ground daily among the rising and educated generation)। তিনি সেখানেই তৃতীয় আর একটি গোষ্ঠীর কথাও লেখেন—প্রাচ্যবিদ্যায় পারদর্শী কিন্তু ঘোর জাতিবিদ্বেষী 'conservers'-দের কথা। তাঁদের কাছে, 'R. M. Roy, who is the sort of impersonation of the Indian march of intellect, is peculiarly hateful. They cannot endure the thought of the black sadhu coming in contact with the white [man], pretending to equality, often evincing superiority, mortifying and hateful. Does your Lordship know that R.M.R. once called out a civil servant for some personal indignity, and made him apologise?'[২৭০] আজকের দিনে, রমেশচন্দ্রের কাছেও রামমোহন এক বিষম সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছেন—কেন তিনি অত বিদ্যাবুদ্ধি ও প্রতিভার অধিকারী হন। ব্যাপারটা যখন রমেশচন্দ্র নিজের বুদ্ধিবলে অপ্রমাণ করতে অক্ষম হন তখন ধার করেন তিনি বিলাতের সাহেবদের বুদ্ধি। সাহেবরা যখন বলেন যে বাঙ্গালী হিন্দুমাত্রই জন্তু জানোয়ারের সামিল, তখন তাকে অসত্য বলে কার সাধ্য। সুতরাং রমেশচন্দ্রেরই জিৎ।

রামমোহনের সমসাময়িক বাঙ্গালী হিন্দুরা প্রকৃতই কোন স্তরের জীব ছিল সে সম্বন্ধে আরও দুচারটে প্রমাণ উল্লেখযোগ্য। বাঙ্গালী হিন্দুদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত Joshua Marshman এক প্রসঙ্গে মন্তব্য করেন: 'It is indeed but justice to the character of the Hindoo youth to say that in general there is among them no deficiency of a mental kind.'।[২৭১] ১৮৩১ সালে কলকাতার সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি হিন্দু কলেজের দুজন প্রাক্তন ছাত্রের সঙ্গে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা করার পর Bentinckকে লেখেন: 'I feel that I can not by letter, nor could I by word of mouth, put your Lordship adequately in possession of the impression this conversation made on my mind. There was an apparant manliness of character, a strict regard to truth and honesty accompanied with a modest but decided maintenance of their own views and principles unawed and uninfluenced by names and authority, that I

think would have induced those who are most sceptical as to improving the moral and intellectual condition of the natives to hesitate before they came to any sweeping conclusion.'।[২৭২] কলকাতার নবপ্রতিষ্ঠিত Medical College-এর রসায়ন বিভাগের ছাত্রদের উত্তরপত্র পরীক্ষা করে James Princep মন্তব্য করেন : "In the first place, I may remark generally, that all the essays are extremely creditable. Indeed, the extent and accuracy of the information on the simple subject selected to test the abilities of the pupils has far surpassed my expectation ; and I do not think that in Europe any class of chemical pupils would be found capable of passing a better examination for the time they have attended lectures, nor indeed, that an equal number of boys would be found so nearly on a par in their acquirements" ।[২৭৩] বিলাতে চিকিৎসা শাস্ত্র পাঠরত কলকাতার কয়েকজন ছাত্র সম্বন্ধে দ্বারকানাথ ঠাকুরের ভাগিনেয়, নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিলাত থেকে গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে একটি চিঠিতে (১৯মে, ১৮৪৬) লেখেন : 'The medical boys who came with us has (sic) beaten down six hundred European students in the University of London. One of them got the First Medal (gold) in Comparative Anatomy. His name is Soorjee Kumar Chakerburty and another got two silver medals in two different branches, I think in Chemistry and Botany. The people here are quite astonished by seeing that people coming from 6,000 miles distinguished themselves over the native boys here'. ।[২৭৪] Derozio-র প্রিয় ছাত্ররা সকলেই বাঙালী এবং হিন্দু ছিলেন। হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ James Kerr, তাঁর একজন ছাত্র, গোপাল লাল রায় সম্বন্ধে লেখেন : 'It is impossible to witness the movements of his searching mind on these occasions, without feeling profoundly that the Asiatic intellect in its best specimens, differs little from the European !'[২৭৫] যে সব মানুষগুলোর কথা বলা হল, রমেশচন্দ্র কি মনে করেন, তাঁরা জন্তু জানোয়ারের সামিল ছিলেন, বা ইয়োরোপের সর্বাপেক্ষা অনুন্নত সম্প্রদায়ের চেয়ে নিকৃষ্ট-

ছিলেন? আজও ভারতবাসীরা খুব অনগ্রসর, দরিদ্রজাতি; ভারতবর্ষের কোটি কোটি মানুষ আজও অজ্ঞতা, মূঢ়তা বহু বীভৎস কুসংস্কারের অন্ধকারে মগ্ন। কিন্তু এটা কোন কালেই ভারতবাসীদের একমাত্র পরিচয় ছিল না। যে কালে Grant ও Hastings বা আরও অনেক ইংরাজ পদানত বাঙ্গালী, হিন্দুদের নিকৃষ্ট জীব বলে ঢালাও রায় দেন, সে কালের একজন সুর্যকুমার বা গোপাল লাল এর কৃতিত্বের জন্য আজকের বাঙ্গালীরা যদি কিছু উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন, তাতে রমেশচন্দ্রের আপত্তি করার কি কারণ? রামমোহনকে বিসর্জন দিতে গিয়ে তিনি যে ঢাকীশুদ্ধ বিসর্জন দেন, সেটা রমেশচন্দ্র হয়ত ঠিক বুঝতে পারেন নি। ভারতবিজয়ী সাহেবরা হিন্দু, বাঙ্গালীদের জন্তু জানোয়ার বলে প্রচার করতেন নিজেদের আর্য প্রমাণ করার জন্য। বিশ্ববিজয়ী পশ্চিম ইয়োরোপীয় জাতিগুলির সে অভ্যাস বিংশ শতাব্দীর তৃতীয়-চতুর্থ দশক থেকে এক নগ্ন বর্বরতার আকার নিয়ে দেখা দেয়। রমেশচন্দ্র সত্তরের দশকে দেড়শ-দুশো বছর আগেকার সাহেবদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে প্রচার করেন যে রামমোহন ছিলেন নিকৃষ্ট জীব। এককালে মুসলমান মোল্লারা এবং খৃষ্টান বাঙ্গালীরা হিন্দু দেবদেবীদের সম্বন্ধে 'scurrilous abuses'-এ লিপ্ত হলে রমেশচন্দ্র ক্ষুব্ধ হন, কিন্তু বঙ্গদেশের মানুষগুলিকে Hastings যখন জন্তু জানোয়ার বলে বর্ণনা করেন, তখন তা প্রকৃত সত্য হিসাবে তিনি লুফে নেন—সে বর্ণনা যে রামমোহন সম্বন্ধে তাঁর ব্যক্তিগত ধারণার প্রত্যায়ক।

অবশ্যই Auber একজন বিচক্ষণ এবং বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু তিনি কি এমন সাহেব মহাপুরুষ ছিলেন যে রামমোহন সম্বন্ধীয় তাঁর কয়েকটি কথা রমেশচন্দ্রের কাছে 'বিশেষ অর্থব্যঞ্জক' ঠেকে? —এবং সে কথাগুলিকে দুমড়ে, মুচড়ে তিনি মহোল্লাসে প্রমাণ করতে চান যে রামমোহনের বিদ্যাবুদ্ধি, স্বভাব-চরিত্র সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত হবার কারণ নেই? আর Grant এবং Moira-র আপ্তবচন উদ্ধৃত করে রমেশচন্দ্র যে মহান সত্যটিকে উদ্ঘাটন করেন তা হচ্ছে যে পৃথিবীতে ঋষিতুল্য ব্যক্তিদের আবির্ভাব শুধু বাংলাদেশে নয়, বিলাতেও কিছু কিছু ঘটে।

তুলনা রমেশচন্দ্র অনেক করেছেন—ঋষিতুল্য বাঙ্গালীদের সঙ্গে তুলনা করে দেখিয়েছেন যে রামমোহন ছিলেন দুর্নীতিপরায়ণ, অর্থগৃধ্নু, ভোগবিলাসী; তুলনা করে দেখিয়েছেন যে তাঁর দেশপ্রেম ছিল ভুয়া, দেখিয়েছেন যে সংস্কারক হিসাবে তাঁর পরিচয়টা প্রকৃতপক্ষে একটা বিরাট ধাপ্পা, দেখিয়েছেন যে তিনি

ছিলেন এক নিকৃষ্ট জীব। যাই হক, রামমোহনের প্রকৃত পরিচয় মেলে তাঁর চিন্তা, কর্ম ও রচনাগুলির মধ্যে। কি ভারতবাসী, কি সাহেব, অনেকেই তাঁকে পছন্দ করতেন না—না করা কিছুই অস্বাভাবিক ছিল না। তাঁর দেশবাসী—যাঁদের মুখে ভাষা ছিল, তাঁরা অনেকেই তীব্র ভাষায় তাঁর নিন্দা করেন। আবার সাহেবরাও তাঁর সমালোচনা করেন। একজন বিশিষ্ট পাদ্রীসাহেবের কয়েকটি কথা এখানে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। তিনি লেখেন: 'Rammohan Roy teaches us nothing new, when he says that the present worship of the Hindoos differs widely from the primitive religion of their ancestors. This is a fact pretty generally known at present. At the same time, the prevailing worship of India is so deeply rooted, that it would require other powers, and other means, than those possessed by that Brahmin, to bring back the bulk of the nation to the much less unreasonable worship of their first ancestors........... from what I have seen of the writing of that reformer Brahmin, I apprehend that his talents have been much over-rated, and the unqualified encomiums bestowed upon him from several quarters very little deserved; but when I observed him, at an entertainment he recently gave to the Spaniards living in Calcutta, presuming to give a decided opinion on the late revolution in Spain, and emphatically boasting in an elaborate speech, published with an equal emphasis in most of the public papers at that presidency, the advantages of religious and political freedom, (a word, the meaning of which, I apprehend, he does not understand,) he sank still lower in my estimation. In fact, to see a Brahmin decorated with the treble cord, that indubitable badge of the most oppressive and most degrading despotism, turn the apostle of freedom, is so shocking an anomaly, that persons acquainted with the subject will find it difficult to reconcile themselves to such a contradiction'।[২৭] বৃদ্ধ 'Trinitarian, Roman Catholic' পাদ্রীসাহেব দু একটা কথা ঠিকই বলেন, তবে রামমোহন সম্বন্ধে তাঁর মনোভাব বোধগম্য। তাঁর একটা বিশেষ সমস্যা ছিল। তিনি নিজে হিন্দুদের বলতেন অসভ্য, বর্বর, দুষ্ট ইত্যাদি, কিন্তু

ওই কথাগুলো যখন তাঁর প্রটেষ্ট্যাণ্ট সহকর্মীরা বলেন, তখন তিনি হিন্দুদের পক্ষ অবলম্বন করে প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে ইয়োরোপের প্রটেষ্ট্যাণ্ট খৃষ্টানদের চেয়ে ভারতীয় হিন্দুরা বেশী বর্বর ছিল না। ৩২ বছর ভারতে অক্লান্ত পরিশ্রম করেও 'Everywhere the seeds sown by him have fallen upon a naked rock, and have instantly dried away'।[২১৭] সুতরাং তাঁর 'chauvinism' যে একটু বেশী তীব্র হয়ে প্রকাশ পাবে তা স্বাভাবিক। পাদ্রীসাহেবরা ছিলেন প্রচারক। তাঁরা এদেশে প্রচার করতেন খৃষ্ট ধর্মের মাহাত্ম্য, আর নিজেদের দেশে প্রচার করতেন ভারতবাসীর মূঢ়তা, বর্বরতা প্রভৃতি। এ প্রচার না করলে যেমন তাঁদের নিজেদের পরিশ্রমের এবং ব্রিটিশ উপনিবেশিক শাসনের যথার্থতা প্রমাণ হত না, তেমনি তাঁদের খরচের টাকা উঠত না। বিলাতের মানুষেরা সাধারণ ভাবে তাঁদের কথা বিশ্বাস করত, কেননা তাদের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধিতে ভারতীয় সম্পদের একটা বৃহৎ অবদান ছিল। পাদ্রী সাহেবদের মনোভাব সম্বন্ধে একটা সমসাময়িক মন্তব্য শুনুন—সূত্র ২১৭। এখন রামমোহনের মত হিন্দু যখন তাদের মধ্যে গিয়ে উপস্থিত হন, তখন তাঁকে দেখে তারা স্বাভাবিক ভাবেই বিস্মিত হয়। তবে বিলাতে বহু বুদ্ধিমান, সংযতমনা, চিন্তাশীল মানুষও ছিলেন। তাঁরা, পাদ্রী বা তাঁদের সমগোত্রীয় ব্যক্তিদের প্রচার সত্ত্বেও, একটা সমগ্র জাতিকে অসভ্য, বর্বর প্রভৃতি বলে ঢালাও নিন্দা বা ঘৃণা করতে রাজী হন না।

Bentinck নিজে লেখেন একটি 'warm and eloquent e'loge on that most remarkable man'।[২১৮] রামমোহনের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে, কলকাতাবাসী রামমোহনের অনুরাগী কিছু ইংরাজ, 'the friends of India', টাউন হলে একটি শোক সভার অনুষ্ঠান করেন, এবং—সেই 'truly good and great a man'-এর প্রতি তাঁদের শ্রদ্ধা ও অনুরাগের চিহ্নস্বরূপ, তাঁর স্মৃতি রক্ষার জন্য অর্থসংগ্রহে প্রবৃত্ত হন। তাঁদের মতে, 'to endow a Ram Mohan Roy professorship in the Hindu College……would be a better project perhaps than an obelisk or even a statue.'।[২১৯] প্রসঙ্গত, রামমোহন সম্বন্ধে আর একটি অভিমত দেখুন ওই একই সূত্রে। আর একজন বঙ্গদেশ সম্বন্ধে বিশেষ ওয়াকিবহাল সাহেব, দেশের অবস্থা এবং রামমোহন সম্বন্ধে লেখেন ; 'From these advantages (মুদ্রণ ব্যবস্থার প্রচলন) India has been wholly shut out until the latter end

of the last century; when printing began to be practised at the different presidencies; and Indian, as well as European, works, to be more generally circulated and read. Since this period, the progress of the natives, whose wealth and leisure have enabled them to prosecute mental acquirements, has been such as to excite, not merely admiration, but astonishment. Schools, and literary associations, have been established at the different presidencies, and in other parts, in which natives of all casts (sic) have greedily sought instruction; but what is most surprising is, that there are several natives now in India, whose acquaintance with the English language is so perfect, as to enable them to write it with all the idiomatic eloquence, and grammatical purity, of accomplished scholars. The writings of that extraordinary man, Ram Mohan Ray, are too well known to require encomium from me. His celebrated petition to the king in behalf of a free press for India; his "Precepts of Jesus"; his "Appeals to the Christian Public"; his "Defence of Hindu Theism," "Translation of the Upanishads," and various other tracts, are works that will immortalize the name of Ram Mohan; and leave future generations to wonder, that English writings of so much beauty and excellence should be the production, not of a natural-born Britor, but of an enlightened, self-taught, Indian Brahmin'.।[২৮০] (আরও দেখুন ওই একই সূত্রে)।

বিলাতে যাঁরা রামমোহনকে 'মর্যাদা ও সম্মান দেখান', যাঁরা তাঁকে নিয়ে 'অনেক বাড়াবাড়ি' করেন, তাঁরা কোন শ্রেণীর মানুষ ছিলেন, তাঁদের বিদ্যাবুদ্ধি ও সামাজিক মর্যাদা কত ছিল, তা সুবিদিত—রমেশচন্দ্রের তা না জানার কথা নয়। রামমোহনের সেই বিলাতী ভক্তরা তাঁদের রামমোহনানুরাগের আতিশয্যে রামমোহনের মস্তিষ্কের প্রকৃতি ও গুণ নির্ণয় করার জন্য তাঁর মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই তাঁর মাথার একটা ছাঁচ তুলে নেন। সে ছাঁচটি পরীক্ষা করে তাঁরা রামমোহনের একটি চারিত্রিক দুর্বলতা আবিষ্কার করেন: 'The rajah's complaisance and want of courage to say "no" indicated the strength of Love of Approbation in combination with

Cautiousness.'।[২৮১] Auber বোধ হয়—রমেশচন্দ্রের ব্যাখ্যা অনুযায়ী, রামমোহনের ওই দুর্বলতারই ইঙ্গিত দেন।

যাই হক, বিলাতে রামমোহনকে নিয়ে কারা কত 'বাড়াবাড়ি' করেন তার বিস্তারিত বিবরণ দেবার প্রয়োজন এখানে নেই। তবে তাদের মধ্যে একজনের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি হচ্ছেন Jeremy Bentham। রামমোহন যখন বিলাতে পৌছান তখন তাঁর বয়স ৮৩ বছর। ১৮২৮ সালে একটি চিঠিতে তিনি একটু 'বাড়াবাড়ি' করে রামমোহনকে বর্ণনা করেন 'intensely admired and dearly beloved collaborator in the service of mankind,'[২৮২] ইত্যাদি বলে। Bentham-এর চিন্তা এবং চরিত্রের সঙ্গে যারা পরিচিত তাঁরা জানেন যে তিনি কি ধাতের মানুষ ছিলেন। তবু তিনি ওই চিঠিতেই আরও 'বাড়াবাড়ি' করে বলেন, 'your character is made known to me by our excellent friends, Colonel Young, Colonel Stanhope and Mr. Buckingham. Your works by a book in which I read, a style which but for the name of a Hindoo, I should have ascribed to the pen of a superiorly well-educated and instructed Englishman'।[২৮৩] রামমোহনের লণ্ডন পৌছবার পরই বৃদ্ধ Bentham, আরও আদিখ্যেতা করে, কোন খবর না দিয়েই দেখা করতে যান রামমোহনের সঙ্গে তাঁর হোটেলে: 'Yet strange to say, long after he had retired to rest, the Venerable Bentham who had not for many years called on any one or left his house, I believe, except, to take his habitual walk in the garden found his way to the hotel, and left a characteristic note for him.'।[২৮৪] (আরও দেখুন ওই একই সূত্রে)। বৃদ্ধ কি দেখতে গিয়েছিলেন তা হয়ত রমেশচন্দ্র ভাল বলতে পারেন। বিলাতে বাঙালী, হিন্দু রামমোহন সম্বন্ধে কার কি ধারণা ছিল, সে বিষয়ে আর উচ্ছ্বাস প্রকাশের প্রয়োজন নেই।

ঊনবিংশ শতাব্দীর একেবারে গোড়া থেকে বাংলা দেশে, এক নতুন ভারতের সৌধ যাঁরা নির্মাণ করেন, একখানার পর একখানা ইঁট গেঁথে, ইতিহাস তাঁদের সকলকেই যথোপযুক্ত সম্মান দেবে চিরকাল। কিন্তু তাঁদের মধ্যে, শতাব্দীর প্রথমার্ধে একজন মানুষ ছিলেন, যিনি দাঁড়িয়ে থাকেন সকলের মাথা ছাড়িয়ে, আর আঁকেন আপন মানস পটে নির্মীয়মান নতুন

ভারতের একটা সমগ্র চিত্র, নিজের উপলব্ধির আবেগে। তাঁর নাম রামমোহন রায়। তাঁর আঁকা চিত্রটি অবশ্যই ভারতের ইতিহাসের, ভবিষ্যতের শেষ কথা নয়। সে চিত্রের ওপর অনেক রং চড়েছে, আরও চড়বে। তবে তার প্রকৃত গুরুত্ব নিহিত ছিল তার ঐতিহাসিক ইঙ্গিতটির মধ্যে—যারা মনুষ্যত্ব হারিয়েছিল তারা আবার মানুষ হতে পারে।

রমেশচন্দ্র তাঁর প্রবন্ধের ইতি করেন এই বলে: 'রামমোহনের নিন্দা অথবা লোকের চক্ষে তাঁহাকে খাটো করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে' (৪৫)। প্রবীণ, মহাপ্রাজ্ঞ, সত্যের পূজারী রমেশচন্দ্রের কথাগুলো অসত্য বলে ধরে নেওয়ার স্পর্ধা আমার নেই। তবে হয়ত, সন্দেহপ্রবণ বা অসূয়ক কারোর কারোর মনে উঁকি ঝুঁকি মারতে পারে Voltaire এর কথা—'Words are spoken to conceal thoughts'। গত প্রায় দশবছর ধরে রমেশচন্দ্র রামমোহন প্রসঙ্গে যা বলেন বা লেখেন, তা হচ্ছে তাঁর শ্রোতা এবং পাঠকদের চমকে দেবার ইতিহাস। সে ইতিহাস প্রমাণ করতে চায় যে রামমোহনকে নিয়ে ভারতবাসীর গর্ব করার কিছু নেই, তাঁকে খর্ব করাই উচিত। রামমোহনের কার্যকলাপের জন্য তাঁর দেশবাসীদের একটা প্রভাবশালী গোষ্ঠী তাঁকে সমাজের ও দেশের শত্রু বলে মনে করতেন, এবং তাঁর অপমান এবং ধ্বংস কামনা করেন। খবর আছে যে 'When Baboo. Rammohan Roy left Calcutta, his superstitious enemies indulged in the most extravagant prognostics against him. Some gave out that before he reached England he would meet with some harm, others that the vengeance of the gods would surely kill him ere he could finish his voyage and oppose the endeavours of Mr. Bathie in behalf of the Suttee, whilst some maintained that he would be sent back from England with disgrace. They even went so far as to give out that some of these calamities had actually befallen him'। [২৮৫] সত্যই যদি রামমোহন তখন জাহাজডুবি হয়ে মারা পড়তেন, তাহলে বর্তমানে রমেশচন্দ্রের সমস্যা অনেক কমে যেত। আর যদি তাঁর মত নিকৃষ্ট জীবকে ইংলণ্ড থেকে দূর করে দেওয়া হত, তাহলে ধরে নেওয়া যেতে পারে রমেশচন্দ্র খুবই খুশী হতেন। পৃথিবীতে মহৎ কর্মে ব্রতী হওয়া খুবই কঠিন ব্যাপার; কিন্তু মহত্ত্বকে তারিফ করতে পারাও কম কঠিন নয়। ইতিহাসের অন্য মানুষদের মত রামমোহনের চিন্তা ও কর্ম ঐতিহাসিকেরা আলোচনা ও

সমালোচনা করেছেন, এবং আরও করবেন। সে মূল্যায়ণ যত গভীর, যত ব্যাপক হয় ততই ভাল। এই ভাবেই মহৎ ব্যক্তিদের প্রতি ঐতিহাসিক তাঁর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তবে একটা কথা: উপনিষদে শুনি—

'কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ
কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতি যুক্তঃ'।

কিসের দ্বারা রামমোহন প্রেষিত হন? এ প্রশ্নের জবাব দেবে কে? এটা একটা ক্ষুদ্র প্রশ্ন নয়—মানুষের অমরত্বের এটাই মূল রহস্য। জবাব না দিতে পারলেও ঐতিহাসিক সেটাকে এড়িয়ে যেতে পারেন না। এক যুগের মানুষের চিন্তা ও কর্ম অন্য যুগে পুরোণ হয়ে যায়, তাতে মরচে পড়ে যায়, হারিয়ে ফেলে তা আর বাস্তবতা। তবুও ঐতিহাসিক অন্বেষণ করেন মানুষের মনুষ্যত্বের অদৃষ্ট উৎসটিকে—যেমন সকলকে আলো বিতরণ করার জন্য, তেমনি আপন আত্মার সমৃদ্ধির জন্য। মৃত্যুর কিছু পূর্বে রামমোহন-ভক্ত রবীন্দ্রনাথ তাঁর দেশবাসীর উদ্দেশে লেখেন:—

"নানা দুঃখে চিত্তের বিক্ষেপে
যাহাদের জীবনের ভিত্তি যায় বারংবার কেঁপে।
যারা অন্যমনা, তারা শোনো
আপনারে ভুলো না কখনো।
মৃত্যুঞ্জয় যাহাদের প্রাণ,
সব তুচ্ছতার ঊর্ধ্বে দীপ যারা জ্বালে অনির্বাণ,
তাহাদের মাঝে যেন হয়
তোমাদেরি নিত্য পরিচয়।
তাহাদের খর্ব কর যদি
খর্বতার অপমানে বন্দী হয়ে রবে নিরবধি।
তাদের সম্মানে মান নিয়ো।
বিশ্বে যারা চিরস্মরণীয়।'

রামমোহনের মৃত্যুর বহু বৎসর পরে একজন বিশিষ্ট ইয়োরোপীয় পণ্ডিত তাঁর সম্বন্ধে লেখেন: 'He might part with his old mother in silent love and pity, but towards the rest of the world he wished to appear as what he was. He would not say that he believed in three Gods when he believed in One God only;

he would not call idols symbols of the Godhead; he would not have ritual because it helped the weak; he would not allow Suttee, because it was a time-hallowed custom, springing from the love of a wife for a dead husband. He would have no compromising, no economising, no playing with words, no shifting of responsibility from his own shoulders to others. And therefore, whatever narrow-minded critics may say, I say once more that Ram mohan Roy was an unselfish, an honest, a bold man—a man in the highest sense of the word.'।[২৮৬]

রামমোহন চর্চায়* প্রবৃত্ত হয়ে সাম্প্রতিক কালে রমেশচন্দ্র যা বলেন, তার বেশ কিছুটা ইতিহাস নয়, প্রচারমূলক কুৎসা মাত্র। সেটাও ইতিহাস হয়ে থাকবে। আমরা শুধু রামমোহন-ভক্তের ভাষাতেই বলব:

'তবু যেন হেসে যাই যেমন হেসেছি বারে বারে
পণ্ডিতের মূঢ়তায়……।'

সূত্র ও টীকা

১ On Rammohan Roy—The Asiatic Society 1972, পৃঃ ৪৯। ২ প্রথম-দ্বিতীয় সংখ্যা। বৈশাখ-আশ্বিন, ১৩৮২, পৃঃ ৩১-৪৮ ৩ (ক) Journal of the Asiatic Society, vol XXI, 1955 no. I পৃঃ ৩৯-৫১ : (খ) Glimpses of Bengal in the the nineteenth century. 1960 ; (গ) History of the freedom movement in India vol I, 1962 ; (ঘ) British paramountcy and Indian renaissance, part II, vol X, History and culture of the Indian people, Bharatiya Vidya Bhavan. 1965 ; (ঙ) পূর্বোক্ত ১ ; (চ) The Calcutta Review vol III, no 3, January-March 1972, পৃঃ ২০৯-২২৬ ; (ছ) Renascent India (nineteenth century) Calcutta, 1976। ৪ History of modern Bengal, 1978। ৫ পৃঃ ৩ (ঘ), পৃঃ ৪। ৬ Thucydides—The Peloponesian war। অনুবাদক—Rex Warner. Penguin Books, 1954, পৃঃ ৫-৬। ৭ রাজতরঙ্গিণী, ১।৭। ৮ জিয়াউদ্দীন বারাণীর ইতিহাস দর্শন—গৌতম ভদ্র। ইতিহাস (ক্যালকাটা হিষ্টরিকাল সোসাইটি), নব পর্যায়, দ্বিতীয় খণ্ড, ২য় সংখ্যা, পৃঃ ৯৯-১১১, এবং ৩য় সংখ্যা, পৃঃ ১৬৭-১৭৫। ৯ সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা। ৫ম সংস্করণ জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৭, ১ম খণ্ড। ১০ পৃঃ ১। ১১ পৃঃ ১, পৃঃ ২০। ১২ The Indian Messenger vol XCVI. no. 23, December 7, 1978 পৃঃ ১৫০। ১৩ ভারতের শিল্পবিপ্লব ও রামমোহন—সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৯৬৩, পৃঃ ১। ১৪ The correspondence of Lord William Cavendish Bentinck। ed.—C. H. Philips। 2 vols. Oxford 1977. vol I, Letter 365 Peter Auber to Bentinck, 3 Nov. 1831, পৃঃ ৭০৪। ১৫ পৃঃ ১৪, vol I, Metcalfe's minute on the future government of India. Letter 148, 11 Oct. 1829, পৃঃ ৩১৪। ১৬ The English works of Raja Rammohan Roy. ed.—Kalidas Nag and Debajyoti Burman. Calcutta ; part III. পৃঃ ৩৭-৩৮। ১৭ পৃঃ ১৫। ১৮ পৃঃ ১৬, পৃঃ ৮৩। ১৯ রবীন্দ্র রচনাবলী।

জন্ম-শত বার্ষিক সংস্করণ। ১১ খণ্ড, পৃঃ ৩৮৪। ২০ পূঃ ১, পৃঃ ৪০। ২১ পূঃ ৩ (ছ), পৃঃ ২২৮। ২২ Bengal Past and Present vol. XLVIII; July-Dec, 1934. পৃঃ ৩০। ২৩ পূঃ ২২। vol XLIV; July-Dec 1932, পৃঃ ১৮৪-১৮৫। পূঃ ২২, পৃঃ ৩০-৩১। ২৪ বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা, ১৮০০—১৯০০, বিনয় ঘোষ, ১৯৭০, পৃঃ ২৩৮। ২৫ পূঃ ৯, পৃঃ ৪০। ২৬ পূঃ ৩ (ছ) পৃঃ ২২৯। ২৭ The life and letters of Raja Rammohun Roy by Sophia Dobson Collet, ed.—Dilip Kumar Biswas and Prabhat Chandra Ganguli, Calcutta 1962; appendix VIII, পৃঃ ৪৯৬-৯৭। ২৮ পূঃ ৩ (ক, খ, গ এবং ঘ)। ২৯ পূঃ ১৯ পৃঃ ৩৫৮। ৩০ পূঃ ১৯ পৃঃ ৪৩৭। ৩১ পূঃ ১৯, ৪ খণ্ড পৃঃ ৯৭১-৭২। ৩২ পূঃ ১৯, ১৩ খণ্ড, পৃঃ ৫৫। ৩৩ পূঃ ১৯, ১২ খণ্ড পৃঃ ৯৭৯। ৩৪ বিশ্ববিবেক: সম্পাদনা—অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শঙ্করীপ্রসাদ বসু, শঙ্কর। বাক সাহিত্য। ২য় সংস্করণ ১৯৬৬ পৃঃ ১৮৩। ৩৫ সঞ্চয়িতা, বিশ্বভারতী, ১৩৬৫ বৈশাখ, পৃঃ ৪৮৪। ৩৬ The Renaissance of Hinduism in the 19th and 20th centuries by D. S. Sarma. Benares Hindu University, 1944, পৃঃ ৩১২। ৩৭ পূঃ ৯, পৃঃ ১১। ৩৮ পূঃ ৯, পৃঃ ৭৪-৭৫। ৩৯ পূঃ ৩ (খ), পৃঃ ৫৩। ৪০ পূঃ ৩ (গ), পৃঃ ২৯১ এবং (ঘ) পৃঃ ৯২। ৪১ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (জন্ম শতবর্ষ স্মরণে) ১ম সংস্করণ, ৪ খণ্ড, পৃঃ ৩০৫। ৪২ পূঃ ৪১, ৫ খণ্ড, পৃঃ ২১৩-১৪। ৪৩ পূঃ ৩৪, পৃঃ ১৭২। ৪৪ পূঃ ৩৪, ১৭২-৭৩। ৪৫ পূঃ ৩ (ঘ), পৃঃ ১০০। ৪৬ পূঃ ১, পৃঃ ৪০। ৪৭ পূঃ ১, পৃঃ ৪০। ৪৮ পূঃ ৩ (ছ), পৃঃ ২৪০। ৪৯ পূঃ ৩ (ছ), পৃঃ ২৪১। ৫০ পূঃ ৩ (ঘ), পৃঃ ৯২। ৫১ পূঃ ৫০, পৃঃ ২০। ৫২ পূঃ ৫০, পৃঃ ৩৪। ৫৩ পূঃ ৫০, পৃঃ ৯৪। ৫৪ পূঃ ৫০, পৃঃ ২৮৪। ৫৫ পূঃ ৫০, পৃঃ ২৭১। ৫৬ পূঃ ৩ (খ), পৃঃ ১৯ এবং (গ), পৃঃ ৫৪। ৫৭ পূঃ ৩ (খ), পৃঃ ২১। ৫৮ পূঃ ৫৭, পৃঃ ৫৪। ৫৯ পূঃ ৫৭, পৃঃ ২২-২৩। ৬০ পূঃ ৪। ৬১ পূঃ ১৬, part II, পৃঃ ১০৯-১০। ৬২ পূঃ ৩ (ছ), পৃঃ ২৪৪। ৬৩ পূঃ ৬২, পৃঃ ২৪৫। ৬৪ পূঃ ৪, পৃঃ ৩৩৩। ৬৫ পূঃ ৫৭, পৃঃ ১১-১৬; ৬২, পৃঃ ৯৯-১১৩; ৪, পৃঃ ২৩৫-২৪৪; History of Medieval Bengal, 1974, পৃঃ ১৮৮-২৫৯। ৬৬ পূঃ ৬২, পৃঃ ১২০। ৬৭ পূঃ ৬২, পৃঃ ১২২। ৬৮ পূঃ ৬২, পৃঃ ১২৩; আরও দ্রষ্টব্য: পূঃ ৪। ৬৯ History of Medieval Bengal, 1974, পৃঃ ১০১। ৭০ পূঃ ৬২, পৃঃ ২০৬। ৭১ পূঃ ৬২, পৃঃ ১২২। ৭২ পূঃ ৪, পৃঃ ২৫৫। ৭৩ পূঃ

৬১, পৃঃ ১১৯। ৭৪ পৃঃ ৬১, The Brahmunical Magazine or The Missionaries and the Brahmun etc., preface, পৃঃ ১৩৮। ৭৫ পৃঃ ৭৪, পৃঃ ১৪০। ৭৬ পৃঃ ১৬, part IV, পৃঃ ৮৬। ৭৭ পৃঃ ১৬, part II, Answer of a Hindoo etc, পৃঃ ১৯৩। ৭৮ Narrative of a journey through the upper provinces of India etc. and letters written in India by the late Right Reverend Reginald Heber 2 vols. London 1828. vol II, পৃঃ ৩০২। ৭৯ Memoirs of the Right Rev. Daniel Corrie etc. London, 1847, পৃঃ ৬৪২। ৮০ পৃঃ ১৬, part II, Translation of the Ishopanishad, Introduction, পৃঃ ৫২। ৮১ পৃঃ ৮০, Translation of the Moonduk Opunishad, Introduction। ৮২ পৃঃ ৮০, preface পৃঃ ৪৪। ৮৩ পৃঃ ৮২, পৃঃ ৪৪। ৮৪ Nepalese Buddhist literature by R. L. Mitra. 1888, পৃঃ ২৬১। ৮৫ পৃঃ ৬২। ৮৬ পৃঃ ৮৫। ৮৭ পৃঃ ১৬, part II, A defence of Hindu theism ইত্যাদি, পৃঃ ৯২। ৮৮ রামমোহন রচনাবলী—প্রধান সম্পাদক, অজিতকুমার ঘোষ। ১৯৭৩। ব্রাহ্মণ সেবধি, সংখ্যা—২, পৃঃ ২৪১। ৮৯ পৃঃ ৭৪, The Brahmunical Magazine no 2, পৃঃ ১৫৬। ৯০ পৃঃ ৪২, পৃঃ ৪৫০। ৯১ The age of imperial Kanauj. The history and culture of the Indian people. General editor, R. C. Majumdar. Bharatiya Vidya Bhavan vol IV, 1955, পৃঃ ৬২৬। ৯২ The struggle for empire। পৃঃ ৯১ vol V, 1957, পৃঃ ৪০১। ৯৩ পৃঃ ৪১, ৯ খণ্ড, পৃঃ ২০১। ৯৪ পৃঃ ৬২। ৯৫ পৃঃ ৬২, পৃঃ ২৩২। ৯৬ পৃঃ ৯৫। ৯৭ পৃঃ ৩ (খ ও ছ) এবং ৬৯। ৯৮ পৃঃ ৪। ৯৯ পৃঃ ৮৪, পৃঃ ২৬১। ১০০ পৃঃ ৬৯, পৃঃ ২০৭। ১০১ পৃঃ ৬৯, পৃঃ ২০৩। ১০২ পৃঃ ১০০। ১০৩ দ্রষ্টব্য: Military and political consequences of atomic energy by P. M. S. Blackett, London 1949। ১০৪ পৃঃ ৬২, পৃঃ ২৩২-৩৩। ১০৫ পৃঃ ৬২, পৃঃ ২৪৪-৪৫। ১০৬ Rammohan Roy and modern India by Ramananda Chatterjee. 1972. পৃঃ ৫। ১০৭ পৃঃ ৯, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, পৃঃ ২৮। ১০৮ পৃঃ ৮৭, পৃঃ ৫২। ১০৯ Reform and regeneration in Bengal 1774-1823 by Amitabha Mukherjee, 1968, পৃঃ ২৭৭। ১১০ Essays relative to the habits, character and moral improvement of the Hindoos; essays originally published in 'The Friend of India,' a periodical work conducted

by the Serampore Missionaries, 1823, পৃঃ ৩০। ১১১ পৃঃ ১১০, পৃঃ ৬৬। ১১২ পৃঃ ১৬, ১৩১। ১১৩ পৃঃ ১১২, পৃঃ ১৩৬। ১১৪ সংবাদপত্রে সেকালের কথা—১ম খণ্ড, ১৮১৮-১৮৩০। সম্পাদক, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ৩য় সংস্করণ, পৃঃ ২৮৮। ১১৫ Raja Rammohan Roy and progressive movements in India. A selection from records 1775-1845 by Jatindra Kumar Majumdar, 1941, পৃঃ ১৭৮-৭৯। ১১৬ পৃঃ ১১৫, পৃঃ ১৮৯। ১১৭ পৃঃ ১৪, vol II. Letter 464 পৃঃ ৮৫১। ১১৮ পৃঃ ১৫। আরও, Bentinck বলেন : 'what we have won must be kept by the sword' (1805)। একজন লেখক বলেন : 'More fundamentally, the British, though supreme, were still "strangers in the land." They could expect in an emergency no co-operation from the people : they were "the objects of dislike to the bulk of those classes" who had influence, courage, and vigour. Company officials had little of "the knowledge necessary [to] good government" or of "that community of sentiments and purpose" with the people in the absence of which there could anyhow he no good government. Hence British rule was bad, ineffective, and unpopular. From this opinion,......Bentinck never shifted' (1829)—Lord William Bentinck. The making of a liberal imperialist 1774-1839 by John Rosselli. London 1974. পৃঃ ১২৪ ; পৃঃ ১৮২। Bentinck কোম্পানীর ভারতীয় সামরিক নীতি সম্বন্ধীয় তাঁর সমীক্ষাটিতে কোম্পানীর কয়েকজন উচ্চপদস্থ, অভিজ্ঞ ও বিচক্ষণ প্রশাসকের ভারতীয় সিপাহীদের যোগ্যতা, চরিত্র ও মনোভাব বিষয়ক মতামতগুলি বিশ্লেষণ করে লেখেন : 'The only conclusion that I wish to establish from preceding remarks, which contain indisputable truths, is : that in the native army alone rests our internal danger, and that this danger may involve our complete subversion ; that the fidelity of our native army, though wonderfully great, and deserving of high confidence, cannot be considered exempt from the possibility of seduction ; and that

an adequate European force is the sole security against this, the greatest evil that could befall us'. (পৃঃ ১৪ vol II, Letter 810. Bentinck's minute on military policy. 13 March 1835 । পৃঃ ১৪৫০)। ১১৯ British attitudes towards India 1784-1858 by George D. Bearce. 1961 পৃঃ ১৭। ১২০ পৃঃ ১১৯, পৃঃ ১৮। ১২১ British colonial theories 1590-1850 by Klaus E. Knorr 1968, পৃঃ ২৪৬। ১২২ Observations on the state of society among the Asiatic subjects of Great Britain particularty with respect to their morals etc. by Charles Grant 1792. Report from the Select Committee on the affairs of East India Company. 16 August, 1832. General appendix পৃঃ ৮৯। ১২৩ পৃঃ ১২২, পৃঃ ৮৮। ১২৪ পৃঃ ১২২, পৃঃ ৮০। ১২৫ পৃঃ ১২২, পৃঃ ৬০। ১২৬ British Baptist missionaries in India 1793-1837. The history of Serampore and its mission by E. Daniel Potts. 1967 পৃঃ ১৮৯। ১২৭ Christianity and Government of India by Arthur Mayhew 1929, পৃঃ ৯৬। ১২৮ Christianity in India by John W. Kaye 1859, পৃঃ ৮৫। ১২৯ পৃঃ ১২২, পৃঃ ৩১। ১৩০ পৃঃ ১১৯, পৃঃ ৮২। ১৩১ The English Utilitarians and India by Eric Stokes, 1959 পৃঃ ৩৩-৩৪। ১৩২ Speech 7 May 1789. The concept of empire. Burke to Atlee, 1774-1947, ed. George Bennet. 2nd edition 1962, পৃঃ ৫৭। ১৩৩ Charles Grant and British rule in India by A. T. Embree, 1962, পৃঃ ৮৭-৮৮। পৃঃ ১১৮ Rosselli, পৃঃ ১৮৩। ১৩৪ William Carey by S. Pearce Carey 5th edition, 1924, পৃঃ ২৯৮। ১৩৫ An answer to the Abbe' Dubois by Henry Townley 1824, পৃঃ ১৬০-৬১। ১৩৬ The christian missionaries in Bengal 1793-1838 by K. P. Sen Gupta, 1971, পৃঃ ১৪৩। ১৩৭ পৃঃ ১৯, ৯৭৩, পৃঃ ৩৫৫। ১৩৮ পৃঃ ১৩১, পৃঃ ৫৫। ১৩৯ The age of revolution. Europe 1789-1848 by E. J. Hobsbawm, 1962, পৃঃ ২৩৬। ১৪০ পৃঃ ১৩১, পৃঃ ৫৬। ১৪১ The growth of philosophic radicalism by Elie Hale'vy 1972, পৃঃ ৫১০। ১৪২ The life and correspondence of Charles Lord Metcalfe by John W. Kaye 2 vols. Revised

Salahuddin Ahmed 1965, পৃঃ ৩। ১৮৪ পৃঃ ১১৫, Lord William Bentinck's Minute on Suttee. Nov. 8, 1829. পৃঃ ১৩৯। ১৮৫ পৃঃ ১৮৪ পৃঃ ১৪৮। ১৮৬ পৃঃ ১৮৪, পৃঃ ১৪০। ১৮৭ পৃঃ ১৮৪, পৃঃ ১৪১। ১৮৮ পৃঃ ১৮৪, পৃঃ ১৪৭। ১৮৯ পৃঃ ১১৫, পৃঃ ১৫৫। ১৯০ পৃঃ ১৬৪, পৃঃ ৩৩৯। ১৯১ The history of India : from the earliest period to the close of Lord Dalhousie's administation by John C. Marshman 3 vols, 1867, vol 3, পৃঃ ৫৫। Reformers in India by K. Ingham 1793–1833, 1955, পৃঃ ৪৯। ১৯২ পৃঃ ১১৫, পৃঃ ১৫০। ১৯৩ পৃঃ ১১৫, পৃঃ ১৫১-৫২। ১৯৪ পৃঃ ১১৫, পৃঃ ১৩৮। ১৯৫ পৃঃ ১৮৪, পৃঃ ১৪২। ১৯৬ পৃঃ ১৪, Letter 164. Sati : Regulation XVII, A. D. 1829 of the Bengal code. 4 December 1829, পৃঃ ৩৬০। ১৯৭ পৃঃ ১৪, Letter 165 Bengal Government to the court of directors on sati. 4 Dec. 1829, পৃঃ ৩৬২। ১৯৮ পৃঃ ১৯৬, পৃঃ ৩৬০-৬১। ১৯৯ পৃঃ ১৮৪, পৃঃ ১৪৪। ২০০ পৃঃ ১৪, Letter 159 Sir Charles Metcalfe's minute on sati. 14 Nov. 1829, পৃঃ ৩৪৮। ২০১ পৃঃ ৪, পৃঃ ৩৩১। ২০২ পৃঃ ১৪, Letter 171 James Calder to Capt. Benson 1830, পৃঃ ৩৭৭। ২০৩ পৃঃ ১১৫, পৃঃ ১৮৫-৮৮। ২০৪ Napoleon—for and against by Pieter Geyl. Penguin Books 1965. পৃঃ ১৮। ২০৫ পৃঃ ১১৫, পৃঃ ১৫৭। ২০৬ পৃঃ ১১৫, পৃঃ ১৬০। ২০৭ পৃঃ ২৭, পৃঃ ২১২। ২০৮ পৃঃ ১, পৃঃ ৪২। ২০৯ পৃঃ ৮৮, পৃঃ ২৫৮। ২১০ পৃঃ ৮৮, পৃঃ ২৫৮-৫৯। ২১১ India To-day by R. Palme Dutt 1947, পৃঃ ৮৫। ২১২ The economic history of Bengal 1793-1848 by N. K. Sinha 1970, vol III, পৃঃ ১২২। ২১৩ পৃঃ ১১৪, পৃঃ ৩১৮-১৯। ২১৪ সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজ চিত্র। পাঁচ খণ্ডে প্রকাশিত—বিনয় ঘোষ। ২য় খণ্ড, ১৯৬৩, পৃঃ ৯৮। ২১৫ পৃঃ ১১৪, পৃঃ ৩০১। ২১৬ পৃঃ ১৪৮, পৃঃ ১৬৬-৬৭। ২১৭ Awakening in Bengal in early nineteenth century—selected documents, vol I, ed. Goutam Chattopadhyay 1965, পৃঃ XVI। ২১৮ The heavenly city of the eighteenth-century philosophers by Carl L. Becker 1970, পৃঃ ১০২-৩। ২১৯ তুহ্‌ফত্‌-উল-মুওয়াহ্‌হিদিন—রামমোহন রায়। বাংলা অনুবাদ—জ্যোতিরিন্দ্র নাথ দাস, পৃঃ ৭। ২২০ পৃঃ ২১৯, পৃঃ ২৪।

২২১ পৃ: ২১৯, পৃ: ২৯। ২২২ পৃ: ২১৯, পৃ: ১৪। ২২৩ পৃ: ২১৯, পৃ: ২। ২২৪ পৃ: ২১৯, পৃ: ২৮। ২২৫ A lecture on the life and-labours of Rammohun Roy by William Adam 1977, পৃ: ১৫-১৬। ২২৬ পৃ: ২৭, পৃ: ৪৯৭। ২২৭ পৃ: ১৬, পৃ: ৫। ২২৮ পৃ: ১৪, Letter 308 Maharaja Ranjit Singh to Bentinck 23 April 1831, পৃ: ৬১৮-২০। ২২৯ পৃ: ১৬, পৃ: ৬। ২৩০ The sepoy mutiny and the revolt of 1857, by R. C. Majumder, 1957, পৃ: ২৭৫। ২৩১ পৃ: ১৬, পৃ: ৬৬। ২৩২ পৃ: ৭৯, পৃ: ৪৮৬। ২৩৩ পৃ: ২৩২। ২৩৪ পৃ: ১৬, part IV, পৃ: ৫। ২৩৫ পৃ: ১৬, পৃ: ৮৪-৮৫। ২৩৬ পৃ: ১৪৮, পৃ: ১৯৪-৯৫। ২৩৭ পৃ: ২৩৪, পৃ: ৮৩। ২৩৮ পৃ: ১৫১, পৃ: ২০৬। ২৩৯ Poverty and un-British rule in India by Dadabhai Naoroji 1962, পৃ: VIII। ২৪০ The Indian struggle 1920-1942 by Subhas Ch. Basu 1964 পৃ: ২৯৮। ২৪১ পৃ: ২৩৪, পৃ: ৯১। ২৪২ পৃ: ৩ (ঘ), পৃ: ৮৯। ২৪৩ পৃ: ৩ (ঘ), পৃ: ৯৫-৯৬। ২৪৪ The age of capital 1848-1875 by E. J. Hobsbawm 1976, পৃ: ১৩২। ২৪৫ পৃ: ৩ (ছ), পৃ: ১৯০। ২৪৬ পৃ: ১, পৃ: ৪৮। ২৪৭ পৃ: ৩ (গ), পৃ: ৩২৩। ২৪৮ পৃ: ২৪৭, পৃ: ৩১০। ২৪৯ পৃ: ২৪৭, পৃ: ৩১২। ২৫০ পৃ: ২৪৭, পৃ: ৩১৩। ২৫১ পৃ: ২৪৭, পৃ: ৩১২। ২৫২ ৩ (ছ)। ২৫৩ পৃ: ২৫২, পৃ: ২৪৬-৪৭। ২৫৪ পৃ: ১৪, Letter 328 Peter Auber to Bentinck. 4 June 1831, পৃ: ৬৪৭। ২৫৫ পৃ: ১৪, vol II Letter 628 Peter Auber to Bentinck October 1833, পৃ: ১১১৯। ২৫৬ পৃ: ১৪, Letter 313 Peter Auber to Bentinck 6 May 1831, পৃ: ৬২৬। ২৫৭ পৃ: ২৭, পৃ: ৩১৭। ২৫৮ পৃ: ১৪, Letter 339 Peter Auber to Bentinck. 7 July 1831, পৃ: ৬৫৯। On Wednesday a dinner was given at the city of London Tavern by the honourable The East India Company. About eighty sat down to a very sumptuous entertainment.......

The Chairman of the East India Company presided and the Deputy Chairman filled the opposite Chair. Lord Calidon sat on the right and Rammuhan Roy on the left of the Chair. After the usual loyal toasts were drunk, the Chairman rose to propose the "health of Rammohun Roy". It was, he said, by no means customary to preface a toast with many words at one of their family dinners, but as the present was the

first occasion on which they had been honoured with a visit from the distinguished native of a great country, the connection between which and Great Britain was of such advantage to both, he could not for a moment think of allowing the toast about to be proposed to pass in silence. Those to whom he had the honour of proposing the health of Rammohun Roy, were aware of the virtues of the distinguished Brahmin, of the vast services he had rendered to the Indian community'. । (Selections from English periodicals of 19th century Bengal vol I by Benoy Ghose 1978, পৃঃ ৮২-৮৩)। ২৫৯ Vindication of the Hindoos from the aspersions of Rev. Claudius Buchanan etc. by a Bengal officer part I London 1808. পৃঃ ৫২। ২৬০ পৃঃ ৩ (খ), পৃঃ ৩৬৯। ২৬১ A memoir of Central India etc. by John Malcolm. 2nd edition 2 vols. 1824. vol II appendix XVIII, পৃঃ ৩৮-৩৯। ২৬২ পৃঃ ১৮, পৃঃ ৩৬৯। ২৬৩ The domestic life, character, and customs of the natives of India by James Kerr 1865, পৃঃ ৯-১০। ২৬৪ পৃঃ ৩ (খ), পৃঃ ৩৪১। ২৬৫ পৃঃ ১৪, vol II Letter 540 Bentinck to Charles Grant 21 Dec. 1832, পৃঃ ৯৭০-৭৮। ২৬৬ পৃঃ ১৪, vol II Letter 541 Bentinck to Charles Grant 22 Dec. 1832, পৃঃ ৯৮১। দ্রষ্টব্যঃ পৃঃ ১১৮ Rosselli পৃঃ ২০৬। ২৬৭ The modern history of the Indian chiefs, rajas, zamindars etc. by Lokenath Ghosh part II 1888, পৃঃ ৩৩। ২৬৮ Recollections of Alexander Duff etc. by Rev. Lal Behari Dey, 1879, পৃঃ ২১৩-১৪। ২৬৯ The life and times of Carey, Marshman and Ward etc. by John C. Marshman 2 vols. 1859 vol I, পৃঃ ১৩৩। ২৭০ পৃঃ ১৪, vol II Letter 703 col. J. Young to Bentinck. Calcutta 20 April 1834, পৃঃ ১২৪৪-৪৬। ২৭১ Hints relative to native schools etc. Serampore 1816, পৃঃ ১৩। ২৭২ পৃঃ ১৪, Letter 282 Sir Edward Ryan to Bentinck 13 Jan. 1831, পৃঃ ৫৮৩-৮৪। ২৭৩ পৃঃ ১৪৮, পৃঃ ৩১-৩২। ২৭৪ দ্বারকানাথ ঠাকুর—কিশোরী চাঁদ মিত্র। অনুবাদ—দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ১৯৬২, পৃঃ ২৯৭। ২৭৫ পৃঃ ২৬৩, পৃঃ ১৩৮। ২৭৬ Letters on the state of christianity in India etc. by Abbe' J. A. Dubois 1823, পৃঃ ১৬৫-৬৬। ২৭৭ পৃঃ ২৭৬, পৃঃ VII। 'A brutal disregard of the natives is the crying sin of our community. How often do the ministers of our

churches make this the leading and the pointed object of their sermons? (পৃ: ২৫৮ বিনয় ঘোষ, পৃ: ১২৬)। ২৭৮ পৃ: ১৪, vol II Letter 722 Col. J. Young to Bentinck 11 May, 1834, পৃ: ১২৭৮। ২৭৯ পৃ: ২৭০ পৃ: ১২৪৫-৪৬। 'Whatever difference of opinion may exist in the native community regarding his religious principles, all will admit that he (Rammohan) is one of the ablest men of the age and that no one is more capable of advising measures for the benefit of India.'। (পৃ: ২৫৮ বিনয় ঘোষ, পৃ: ১৪৭)। ২৮০ India; etc. by R. Rickards 2 vols 1829 vol II পৃ: ৩৮৪-৮৫। 'At the meeting of the Remonstrant Synod of Ulster, held at Larne on Thursday last, the following resolution was proposed by the Rev. Mr. Montgomery and carried unanimously:—"That a respectful letter be written in the name of this Synod, to that illustrious stranger, the Raja Rammohun Roy, of Bengal, congratulating him on his arrival in Britain, expressing our admiration of his splendid talents and attainments, our high satisfaction in his accession to the cause of Christianity, our deep sense of his invaluable exertions for the diffusion of the Gospel, and assuring him that we should rejoice to see him in this country, and to receive him with all the respect and cordiality so justly due to his distinguished name, his philanthropic labours and his unsullied reputation...Sept. 19, 1831." '। (পৃ: ২৫৮ বিনয় ঘোষ, পৃ: ১২৬)। ২৮১ Pickings form old Indian books পৃ: ১১৮-২১। দ্রষ্টব্য: Asiatic Journal, Vol XIV, 1884। ২৮২ পৃ: ২৭, পৃ: ৪৮৮। ২৮৩ পৃ: ২৮২। ২৮৪ পৃ: ২৭, পৃ: ৩:৩। (ক) 'I should suppose, up to this date, that upwards of 200 persons, at least, of distinctions, have called upon him. The venerable Jeremy Bentham called at the Hotel the second after Rammohun Roy was gone to bed, but would not allow him to be disturbed; he left however a characteristic note, addressed "Jeremy Bentham to Rammohun Roy"......Rammohun Roy passed the next evening with this excellent and wonderful old man, who had not, I believe, for 15 years before called on any one.'। (পৃ: ২৫৮ বিনয় ঘোষ, পৃ: ৪০)। (খ) Rammohun has

been visited by all the first people here [Liverpool]......It is impossible to describe to you the sensation he has created here; new impressions of an engraved likeness formerly sent from India have been taken of him, and these are exhibited in every print shop in the place.'। (পূঃ ২৫৮ বিনয় ঘোষ, পৃঃ ৩৫)। (গ) 'We remained in Liverpool a week, during which Rammohun Roy was visited by every person of distinction in the place, and lionized in, I can't tell, how many parties, morning, noon and night.'। (পূঃ ২৫৮ বিনয় ঘোষ, পৃঃ ৩৯)। (ঘ) 'In some places we were obliged to walk, and then the scene that occured was most amusing; every idleman, woman, and boy in the city, to say nothing of many who left their employment, crowded round us, all staring and shouting, and many of the women would insist on shaking hands with the King of Injee and the "young prince," as they called them.' (পূঃ ২৫৮ বিনয় ঘোষ, পৃঃ ৩৯)। (ঙ) ভারতীয় ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা সম্বন্ধীয় প্রশ্নগুলির উত্তরে বিলাতে রামমোহন যে মন্তব্যগুলি করেন সেগুলি 'afforded high satisfaction to men of all parties.' (পূঃ ২৫৮ বিনয় ঘোষ, পৃঃ ১৪৫)। (চ) কোম্পানীর ভারতীয় কর্তৃপক্ষ বিলাতগামী রামমোহনকে মোগল বাদশার দূত হিসাবে স্বীকৃতি দিতে প্রত্যাখ্যান করলেও:- 'The title of Rajah which Rammohun Roy received from the King of Delhi before he left India, has been recognized by his Majesty's Ministers, and it was in the capacity of Envoy from the head of the House of Timour that he was presented to his Majesty, and took his seat on the occasion of the coronation in the box, appropriated to Ambassadors from foreign Courts.'। (পূঃ ২৫৮ বিনয় ঘোষ, পৃঃ ১৪৫)। এই বিষয়টি প্রসঙ্গে Auber সাহেব অবশ্য Bentinck-কে লেখেন; '......it is utterly absurd to expect for a moment that Rammohun Roy can be at all accredited in this country'। (পূঃ ২৫৪)। (ছ) 'Raja Rammohan Roy...taking part in the meetings of the Royal Asiatic Society in London'. (পূঃ ২৫৮ বিনয় ঘোষ, পৃঃ ২১২)।

২৮৫ পূঃ বিনয় ঘোষ ২৫৮, পৃঃ ১৪৬। ২৮৬ I point to India. Selected writings of Max Mueller, ed. by Nanda Mookerjee Bombay 1970. পৃঃ ৪২-৪৩।